চির বিদ্রোহী

আলি আহাদ

মুন্সি আবদুল মজিদ

চির বিদ্রোহী অলি আহাদ

সম্পাদনায়
মুন্সি আবদুল মজিদ

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা, চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

চির বিদ্রোহী অলি আহাদ

সম্পাদনায়

মুন্সি আবদুল মজিদ

প্রকাশক

মুনাওয়ার আহমদ

সভাপতি

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

গ্রন্থ স্বত্ত্বঃ সম্পাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর - ২০০২

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

ফোনঃ ৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ অলংকরণ

আরিফুর রহমান

মূল্য ঃ ১৫০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

৭২ জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

CHIRO BIDROHI OLI AHAD By: Munshi Abdul Mazid, Published by: Munawwar Ahmad (Chairman), Bangladesh Co-operative Book Society Ltd.

Price : Tk. 150.00, US$ 5.00 **ISBN.-984-493-0820-0**

www.pathagar.com

উৎসর্গ

জাতির আশা আকাঙ্খার
শেষ ভরসাস্থল
যুব সমাজকে॥

www.pathagar.com

"অসত্যের কাছে নত নাহি হবে শির
ভয়ে কাপে কাপুরুষ লড়ে যায় বীর"

বাংলাদেশের অন্যতম স্থপতি চির বিদ্রোহী অলি আহাদ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১৯৯৯ সালের ৬ জানুয়ারী তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে ৭ দলের পক্ষ থেকে ৪ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন প্রবীন জননেতা অলি আহাদ ও তৎকালীন বিরোধী দলীয় উপনেতা এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী।

www.pathagar.com

১২ মার্চ ১৯৯৯ সালে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে প্রবীন জননেতা অলি আহাদের সাথে সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, অধ্যক্ষা রাশিদা বেগম ও ফারহানা রুমিন।

১২ই মার্চ, ১৯৯৯ বিদ্রোহী জননেতা অলি আহাদকে জাতীয় সংবর্ধনা কমিটি কর্তৃক সংবর্ধনা দেয়া হয়। প্রেস ক্লাবের সম্বর্ধনা সভায় সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিপ্লবী জননেতাকে চাদর পরিয়ে দেন।

www.pathagar.com

২৬শে মে ২০০০ সালে ২৯ মিন্টু রোডস্থ জাতীয় সংসদের তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার সরকারী বাসভবনে ৭ দলীয় জোটের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বেগম খালেদা জিয়া, অলি আহাদ, আনোয়ার জাহিদ, শফিউল আলম প্রধান, শেখ শওকত হোসেন নিলু এবং এডভোকেট নূরুল হক মজুমদার।

৪ঠা জুন ২০০০ সালে হোটেল পূর্বানীতে দৈনিক ইনকিলাবের ১৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখছেন জননেতা অলি আহাদ। মঞ্চে উপবিস্ট সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার জাহিদ, জামায়াতে ইসলামীর প্রচার সম্পাদক আবদুল কাদের মোল্লা, পাঠক সংসদের আহবায়ক আবু নাছের মোঃ রহমত উল্লা, জাতীয় পার্টির মহাসচিব নাজিউর রহমান মঞ্জু, মুফতী ফজলুল হক আমিনী, মাওলানা এম এ মান্নান, শফিউল আলম প্রধান প্রমুখ।

www.pathagar.com

১৯৬৯ সালে করাচীতে তৎকালীন পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টোর সাথে সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ও জননেতা অলি আহাদ।

সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ আয়োজিত পহেলা বৈশাখের একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত জননেতা অলি আহাদ। অন্যান্যের মধ্যে মঞ্চে উপবিস্ট আছেন ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদ, আমেনা বেগমসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

www.pathagar.com

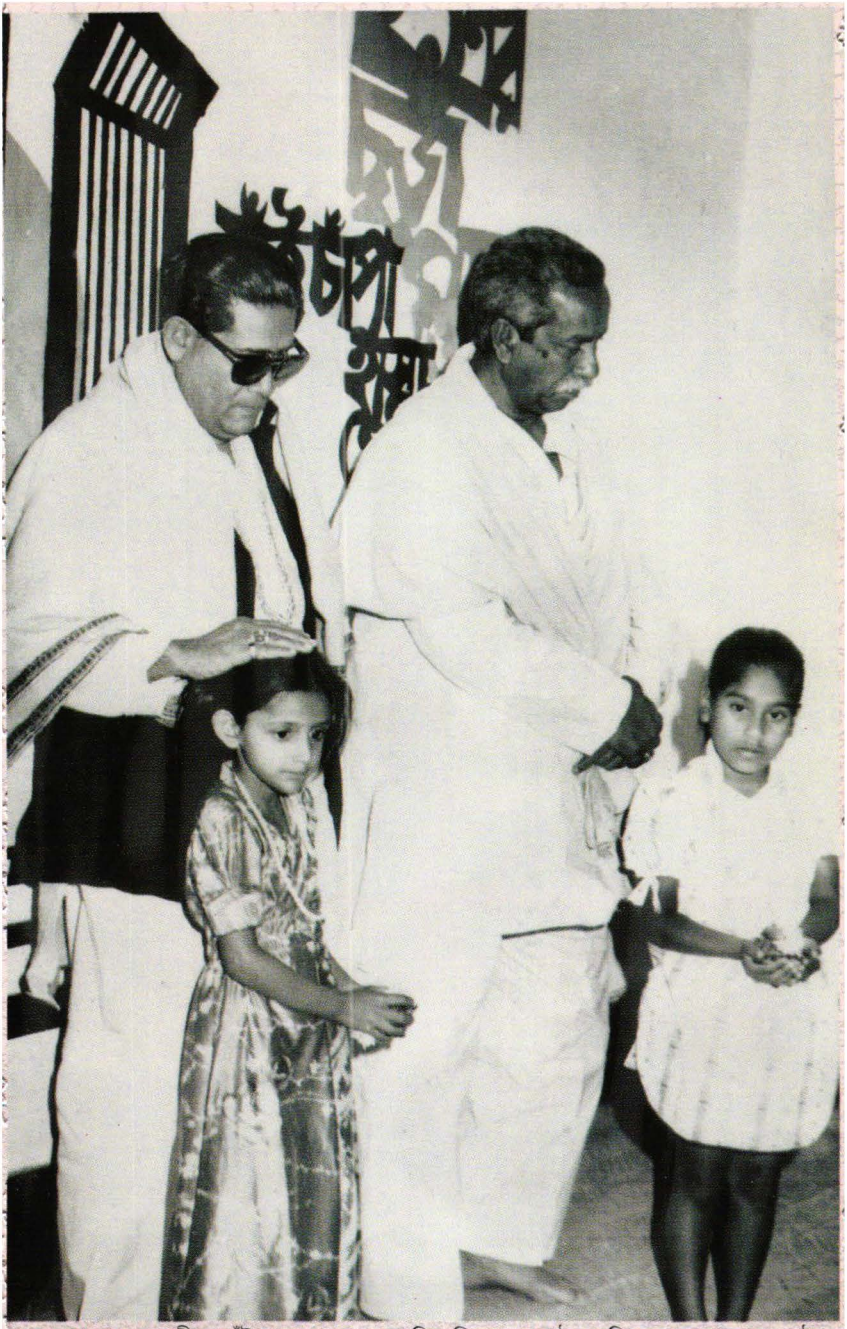

১৯৮০ সালে ফেব্রুয়ারীতে জুঁই চাপা হাসনা হেনা শিশু কিশোর সংগঠনের শিশুদের সাথে এক অনুষ্ঠানে ভাষা আন্দোলনের সিপাহসালার অলি আহাদ ও ভাষা সৈনিক গাজীউল হক।

www.pathagar.com

‘অলি আহাদের এক আওয়াজ
খতম কর সেনাপতিরাজ’

আপাদমস্তক দূর্নীতিবাজ
এরশাদ সরকারের
পদত্যাগের দাবীতে
২৮শে নভেম্বর, মঙ্গলবার
ছয়দলের আহ্বানে
সচিবালয়ের সামনে

অবস্থান ধর্মঘট

ডেমোক্রেটিক লীগ।

১৯৮৯ সালের একটি পোষ্টার

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

দার্শনিক জেমস ফ্রিমেন ক্লার্ক বলেছেন, একজন রাজনীতি চর্চাকারী পরবর্তী নির্বাচন সম্পর্কে চিন্তা করেন, আর রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি জাতির ভবিষ্যত কল্যাণ সম্পর্কে। ভাষা আন্দোলনের সিপাহসালার জনাব অলি আহাদের দীর্ঘ রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিলো দ্বিতীয়টি। তাই সুবিধাবাদী রাজনৈতিক চরিত্র তাঁর ব্যক্তিজীবনকে কলুষিত করতে পারেনি।

বর্তমানে আমরা সুবিধাবাদী রাজনীতির দৈন্যদশার মধ্যে বসবাস করছি। সাধারণ মানুষের লাভ-ক্ষতির ব্যাপার বিবেচনা করে বাংলাদেশের রাজনীতির চর্চা হচ্ছে না। আমাদের দেশের নেতা-নেত্রীদের জাতিকে আত্মনির্ভরশীল একটি সভ্যতার ঠিকানায় পৌছে দেয়ার কোন দর্শন বা দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য নেই। তাঁরা যা বলেন তা করেন না, যা করেন তা বলে না। আখের গোছানোর প্রতিযোগিতা চলছে আমাদের রাজনীতিকদের মধ্যে। পদ-পদবী ও রাতারাতি ধনী হবার প্রয়াসে রাজনীতিকে বেছে নেয়া হচ্ছে পেশা হিসাবে। ফলে আমাদের দেশে চলছে অসুস্থ রাজনীতির অসম প্রতিযোগিতা। এই অসুস্থ রাজনীতির কারণে অর্থনৈতিক মুক্তি এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা জাতির কপালে জোটেনি। উপরন্তু আমাদের সকল ক্ষেত্রে আজ লেজে গোবরে অবস্থা।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ এবং ভাষা আন্দোলনের সিপাহসালার জনাব অলি আহাদ বিভিন্ন জাতীয় সংকটে অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বীরত্বপূর্ণ সাহসী ভূমিকা রেখেছেন। বক্তৃতা-বিবৃতি এবং গ্রন্থ-প্রকাশ করে জাতিকে সঠিক নির্দেশনা, গঠনমূলক পরামর্শ এবং এই সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র উন্মোচন করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ হলো "জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫"। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক পথ-পরিক্রমার অভিজ্ঞতার আলোকে নিরপেক্ষভাবে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের রাজনীতিবিদের চরিত্র এবং উত্থান-পতনের কাহিনী চিত্রিত করেছেন সফলতার সাথে। দেশের ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ রাজনৈতিক অঙ্গনের মহীরূহ জনাব অলি আহাদের হৃদয় নিংড়ানো লেখা গবেষণাধর্মী এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। দেশের সর্বত্র পাঠক কর্তৃক বইটি সমাদৃত হয়েছে এবং আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইতিহাসে এই গ্রন্থটি একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে।

জনাব অলি আহাদ সুবিধাবাদী রাজনৈতিকদের ন্যায় যখন যেমন তখন তেমন হতে পারেননি বলে দীর্ঘ দিন রাজনৈতিক পরিমন্ডলে থেকেও ক্ষমতার রাজনীতি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। দেশের স্বার্থকে উপেক্ষা করে অসৎ রাজনৈতিকদের সাথে আপোষ করেননি। তাঁর বিশ্বাস ও আদর্শ থেকে একচুল বিচ্যুত হননি।

www.pathagar.com

এই নির্লোভ ও নির্মোহ রাজনীতিজ্ঞ সম্পর্কে দেশের প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদরা কি ভাবছেন, কিভাবে মূল্যায়ন করছেন তা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। জনাব অলি আহাদের একান্ত অনুরাগী ও স্নেহভাজন মুন্সি আবদুল মজিদ তা একত্র করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। তাঁর ইচ্ছে বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছি আমরা। এছাড়া বোদ্ধা পাঠক সমাজ ভাষা আন্দোলনের সিপাহসালার ও প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। পাঠকদের এই আগ্রহ মেটাতে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ প্রকাশ করছে মুন্সি আবদুল মজিদ সম্পাদিত সম্মাননাগ্রন্থ **'চির বিদ্রোহী অলি আহাদ'**। পাঠক মহলে এই গ্রন্থটি সাদরে গৃহীত হলে আমাদের আয়োজন ও শ্রম সার্থক হবে।

আল্লাহ আমাদের সবার সহায় হোন।

(মুনাওয়ার আহমদ)
সভাপতি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

ভূমিকা নয়---------
অলি আহাদকে, একজন কবির শ্রদ্ধা

উনিশশো সাতচল্লিশ সালের কিছু কিছু ঘটনার কথা এখনো আমার বিস্ময়কর ভাবে মনে আছে। আটচল্লিশ সালেরও। তখন আমি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। আটচল্লিশ সালে আমি নবম শ্রেণীতে পড়ি। এক বিস্ময় আর মুগ্ধতার জগতে তখন আমার বসবাস। যেমনটি পৃথিবীর সকল কিশোর আর বালকের জীবনে হয়ে থাকে। ঢাকা তখন অতি ক্ষুদ্র একটি মফঃস্বল শহর মাত্র। দেড় লক্ষ থেকে দু'লক্ষ লোক ঢাকা শহরের বাসিন্দা। দোলাইখাল তখন আমাদের কাছে একটি অন্তরঙ্গ ছোট্ট নদীর মতো রক্ত কণিকায় বহমান আর বুড়িগঙ্গা বিশাল আকাশের এক একান্ত প্রতিনিধি। বুড়িগঙ্গার ওপারে যে গ্রাম-সেই গ্রামের শ্যামল গাছপালা আর সবুজ অবারিত মাঠে মিশে আছে গগণের আশ্চর্য ললাটে। আমরা তখন স্বপ্নহীন ছিলাম না আশাহীন ছিলাম না এবং নিশ্চিত ভাবেই ভবিষ্যৎ বিহীনও ছিলাম না।

সেই সময়কার কিছু কিছু ঘটনা আমার, আগেই বলেছি, আশ্চর্যভাবে এখনো মনে আছে। তার একটির অকুস্থল ঢাকার রমনা রেসকোর্স। আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেব তখন ঢাকায় এসেছিলেন। সেই একবার, প্রথম বার এবং শেষবার। ১৯শে মার্চ তিনি ঢাকা এসেছিলেন। আর ঢাকা রেসকোর্সে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ২১ মার্চ। এই দিন ক্ষণের হিসেব আমার মনে থাকার কথা নয়। এগুলো আমার এখনকার সংগ্রহ। আমি ২১ মার্চের সেই ঐতিহাসিক সভায় উপস্থিত ছিলাম। জিন্নাহ সাহেবকে দেখতে সেই সময় সেই রেসকোর্সে প্রায় তিন লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটেছিলো। আমার জীবনে এতো বড় জনসমুদ্র সেই আমার প্রথম দেখা। সেই সময় কেমন ক'রে যেন আমি পুরানা ঢাকার দক্ষিণ মৈশন্ডি এলাকা থেকে হেটে হেটে রেসকোর্স পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম। এখন তা আমার মনে নেই। তবে আমি যে আমার কলেজে পড়া এক মামার সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম সব সময় সেটা বলতে পাড়ি। মামা ব'লেছিলেন এমন মিটিং দেখার সুযোগ আর হবে না কোনোদিন। আমার মামার কথার মধ্যে সম্ভবতঃ একটি অন্তর্গত সত্য নিহিত ছিলো- যা ইতিহাসের ক্রম পরিক্রমায় এখন প্রমাণিত হয়েছে।

ফিরে আসি আমার কৈশোরের সেই রেসকোর্সে।
আমি আমার মামা এবং আরো যেন কে কে- সর্বমোট চারজন ছিলাম আমরা।
কেমন করে যেন মামা আমাদেরকে মঞ্চের সামনা সামনি নিয়ে এসেছিলেন।
বলেছিলেন এখান থেকে জিন্নাহ্ সাহেবকে স্পষ্ট দেখা যাবে।
এবং কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্কে সেদিন মঞ্চের অপরাহ্নের আলোতে
আমরা সত্যি স্পষ্ট দেখেছিলাম। তার ভগ্নী মিস ফাতেমা জিন্নাহকেও।
সেদিন শুধু শুনেছিলাম, দেখেছিলাম এবং প্রত্যক্ষ করেছিলাম। বুঝিনি। জানিনি।
এখন বুঝি এবং জানিও।

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সেইদিন ঢাকার রেসকোর্স মাঠে তার সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতায় নিজেই বপন ক'রেছিলেন পাকিস্তানের ধ্বংসবীজ। জানিনা কার পরামর্শে কোন সে ব্রীফিং এর কারণে তার এমন ধারণা জন্মেছিলো যে উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিৎ। কী সে মহৎ স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন সেদিন যার কারণে তিনি প্রায় তিন লক্ষাধিক বাঙালীর সামনে মঞ্চ থেকে উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন, উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে অন্য কোনো ভাষাই হতে পারবে না, বলতে পেরেছিলেন, Urdu and Urdu alone shall be the state language of Pakistan –no other language can be কায়েদে আজম এমন একটি ঐতিহাসিক জনসভাকে কেন যে বাঙালীদের সামনে এই অসম্ভব একটি উচ্চারণ করার যথোপযুক্ত স্থান ভেবেছিলেন তা আজো আমার বোধের অগম্য রয়ে গেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র সাত মাসের মাথায় কেন যে তিনি তার ধ্বংসবীজের প্রথম শস্যকণাটি নিজেই রোপন ক'রে গিয়েছিলেন বাংলার মাটিতে তা এখনো আমার কাছে এক পরম বিস্ময়।

www.pathagar.com

মঞ্চের সামনে বেশ অনেকটা জায়গা শূন্য ছিলো। সম্ভবতঃ সিকিউরিটির কারণে। যেমনটি এ ধরনের সভায় হয়ে থাকে। তারপরই ছিলো জনমানুষের স্থান।

আমরা সেখানেই ছিলাম। বসেছিলাম প্রায় সামনের সারিতে।

তখনকার ঢাকা শহরের যত বাসিন্দা তার প্রায় দ্বিগুণ বাঙালীর এক অচিন্তনীয় মহাসমুদ্র সেদিন প্রায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে মুগ্ধতার এক বর্ণাঢ্য আবীর মেখে চোখে শুনছিলো জিন্নাহ্ সাহেবের ইংরেজী ভাষার বক্তৃতা। এতো যে মানুষ ছুটে এসেছে এই বাংলার অসংখ্য প্রান্তদেশ থেকে তাদের আসল পরিচয় কী জানতেন জিন্নাহ সাহেব? তারা তো শুধু মুসলমান ছিলোনা বাঙালীও ছিলো এবং পাকিস্তান নামক একটি নতুন রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার জন্যে তারা তো কোথাও এমন কোনো অঙ্গীকার করেনি যে তারা তাদের বাঙালী পরিচয়কে পরিত্যাগ করবে চিরদিনের জন্যে- তাদের মুখের ভাষাকে বিসর্জন দেবে সকল আগামীকালের সমাজ সংস্কৃতি ধর্ম প্রাত্যহিক জীবন কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল কর্মকান্ড থেকে। তাহলে জিন্নাহ সাহেব কেন এমন উচ্চারণ করলেন বাঙালীদের সামনে এদেশে তার প্রথম জনসভায়।

আমার মামা সত্যি বলেছিলেন এমন জনসভা সারাজীবনে আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না।

জিন্নাহ সাহেবের সেই দিনের সেই উচ্চারণ সেদিন শুনেছিলো বাঙালীরা।

স্তম্ভিত হয়েছিলো কিন্তু স্তব্ধ হয়নি।

সেই বিশাল জনসমুদ্রের এক প্রান্ত থেকে কারা যেন প্রথম পাল্টা উচ্চারণ ক'রে উঠলো শেম শেম শেম শেম। অসংখ্য অগ্নিকণার মতো সেই শেম শেম ধ্বনি নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো সারা রেসকোর্স জুড়ে। মিনিট দুই এর কম সময় নয় সেই লজ্জা লজ্জা শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল রমনার বিশাল বটগাছে পাতার মর্মরে ঘাসের শুকনো শরীরে। মনে হল সারা পূর্ব বাংলা যেন সমবেত এক ধিক্কারে উচ্চারণ করছে হায় একি লজ্জা এই নতুন স্বাধীনতারঃ আমার মায়ের কণ্ঠে শানিত অস্ত্র চালাবার একি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এই নতুন আজাদীর?

একটু আগে আব্বাসউদ্দিনের কণ্ঠে কবি গোলাম মোস্তফার গানে মুখরিত ছিলো এই রমনার মাঠ- এই রেসকোর্সের ময়দান।

হঠাৎ একি হল! এ কোন পতনধ্বনি নামলো পূবের বাংলা জুড়ে!

এই যে সেদিনের কথাগুলো লিখলাম এতোদিন পরে। সে সময় কিন্তু ঠিক এমনি ক'রে আমি মোটেই ভাবতে পারিনি। তবে আমার মধ্যে একটি ভীষণ খারাপ লাগা যে কাজ করছিলো তখন সেটা বলতে পারি। হলফ ক'রে বলতে পারি। এবং আমার মতো সবারই খারাপ লাগছিলো। সেই মাঠের সবার।

জিন্নাহ সাহেবকে মাইকের সামনে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম।

জনসমুদ্রের এই আকস্মিক বিস্ফোরণের জন্যে জিন্নাহ সাহেব নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কেমন যেন হয়ে গেলেন হঠাৎ। তার স্বতঃস্ফূর্ত ইংরেজী বক্তৃতায় হঠাৎ ক'রেই যতি নামলো। সামান্য বিরতি! তারপর পুনরায় কম্পোজড হলেন তিনি। তিনি পরিস্কার উর্দুতে বললেন, অদ্ভুত এক কমান্ডিং কণ্ঠে- খামোশ রহো অওর আপ্না আপ্না জাগাপে বয়ঠো। তিনি আবার ফিরে গেলেন ইংরেজীতে। এবং অল্প ক্ষণের মধ্যেই সভা সমাপ্ত হল।

আমার মামা শুধু বললেন, কাজটা ভালো হল না। মাতৃভাষার উপর আক্রমণ কেউ মেনে নেবে না। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাধবেই। আজকের মাঠই তো তার প্রমাণ। আজকের এই বিস্ফোরণের যে-ই শুরু করুক না কেন একটা সাহসের সূচনা করেছে সে। একটি নতুন জিজ্ঞাসার নতুন অনুধাবনের।

বহুদিন পরে আমরা জেনেছি, অন্তত আমি জেনেছি সেই বিস্ফোরণের অন্যতম নেতৃত্বে ছিলেন অলি আহাদ। যাকে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের দুইবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন "অলি আহাদ আমাদের রাজনীতিতে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। নীতির প্রশ্নে তিনি কখনো আপোষ করেন নি। প্রলোভন কখনও তাকে বশীভূত করেনি। বলা যায় তিনি আজ জাতির বিবেকে পরিণত হয়েছেন।"

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় আমি ঢাকার জগন্নাথ কলেজে পড়ি। তখন আমি রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলাম না, এবং এখনো নেই, তবু ভাষা আন্দোলন আমাকে কেমন ক'রে যেন জড়িয়ে ধরেছিলো। এবং সেই সময় আমি প্রথম অলি আহাদের নাম শুনি। ক্রমে জানতে পারি অলি আহাদ সেই ব্যক্তি যিনি ভাষা আন্দোলনের নেপথ্যের প্রধান চালিকা শক্তির সবচেয়ে বড় প্রেরনা ছিলেন।

অলি আহাদ সাহেবের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ আরও অনেক অনেক পরে। তবে তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা কখনো হয়নি। আসলে রাজনৈতিক বিশাল ব্যক্তিত্ব যারা তাদের কারো সঙ্গেই আমার

www.pathagar.com

ঘনিষ্ঠতার কোনো সুযোগই তখন ছিলো না- আর এ সম্পর্কে আমি তেমন উৎসাহীও ছিলাম না। যদিও আমার জীবনের একটা বড় অংশই আমি কাটিয়েছি সাংবাদিকতার পেশায়। এসব সত্ত্বেও বায়ান্ন সালের পর থেকেই আমি অলি আহাদ-এই নামের যে মানুষটি তার জন্যে একটা গোপন শ্রদ্ধা সব সময়েই পোষণ ক'রে আসছি। তাঁর সম্পর্কে অনেক গল্পও শুনেছি-সপক্ষে এবং বিপক্ষে। বেশীর ভাগই সপক্ষে। সব কিছুকে ছাপিয়ে একটি ঘটনাতে তার সম্পর্কে সবাই একমত হতেন এখনো হন অলি আহাদ আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের আধুনিক কালের সেইসব বিরল মানুষদের একজন যাকে সত্যনিষ্ঠ ব'লে আখ্যায়িত করা যায়। বাংলাদেশের এখনকার যিনি প্রধানমন্ত্রী সেই খালেদা জিয়া যখন বলেছেন, তিনি আজ জাতির বিবেকে পরিণত হয়েছেন- তখন তিনি নিঃসন্দেহে কোনো অতিশয়োক্তি করেন নি।

জনাব অলি আহাদ তার রচিত 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫' গ্রন্থটিতে অনেক দুর্লভ এবং অমূল্য তথ্য আমাদের জন্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত পত্রও প্রকাশ করেছেন। আমি এখানে একটি কি দুটি পত্র থেকে অংশ বিশেষ উল্লেখ করতে চাই। করাচীর ৭ নম্বর সমারসেট হাউস থেকে ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৫৬ সালে লেখা একটি পত্রে শেখ মুজিবুর রহমান অলি আহাদকে একটি ব্যক্তিগত অনুরোধ করেছিলেন, "তোমাকে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে একটু অনুরোধ করিতে চাই। আমার ছেলে কামালউদ্দীনকে সেন্ট জেভিয়ার্স কনভেন্ট স্কুলে এবং মেয়েকে (হাসিনা) কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল অথবা বাংলা বাজার স্কুলে ভর্তি করাইবার জন্য দয়া করিয়া চেষ্টা করিবা। তাহাদের জন্যে একজন ভালো শিক্ষক যোগাড় করিবার চেষ্টা করিবা। সব সময়েই তোমার ভাবীর সহিত যোগাযোগ রাখিবার চেষ্টা করিবা। সে-ও খুব নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছে। আমি ভাল। আমার কাছে চিঠি দিও। *-তোমারই মুজিব ভাই।*"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চিঠির এ সামান্য উদ্ধৃত অংশ থেকেই বোঝা যায় অলি আহাদকে ব্যক্তিগতভাবে তিনি কতটুকু ভালোবাসতেন, বিশ্বাস করতেন। আর একটি চিঠিতে মুজিব লিখেছেন, "শরীরের প্রতি যত্ন নিও। কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে তোমার হতভাগা ভাইকে লেখতে ভুলিও না।"

আমার কাছে অলি আহাদ আমাদের ভাষা আন্দোলনের প্রধান নেতা। খালেদা জিয়াও এমন কথা বলেছেন। "ইতিহাস বিকৃতির শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ সত্যটি আজ ১২ কোটি মানুষের কাছে স্পষ্ট যে অলি আহাদ মহান ভাষা আন্দোলনের প্রধান নেতা"- এ উক্তি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার।

১৯৪৮ সালে রমনার রেসকোর্সের ময়দানে যে প্রতিবাদী কণ্ঠের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আমি প্রায় বালক বয়সে শূনেছিলাম দেখেছিলাম, সেই ধ্বনি তরঙ্গের অন্যতম নির্মাতা ছিলেন অলি আহাদ। সেই ভাষা আন্দোলনই ১৯৫২ সালে এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও ডাইমেনশান পেয়েছিলো। পাকিস্তান জেনেছিলো, সারা দুনিয়া প্রত্যক্ষ করেছিলো পূর্ব বাংলার মানুষ যুগপৎ বাঙালী এবং মুসলমান। জেনেছিলো, বাঙালী মুসলমানরা একটি পৃথক জাতি হিসাবে বাঁচতে চায়। এবং পরবর্তীকালে এই মানসিক অস্তিত্ব থেকেই বাঙালীরা একদিন স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলো। ঊনসত্তরের গণ আন্দোলনে দিয়েছিলো আত্মাহুতি। ১৯৪৮ সালের সেই শেম, শেম প্রতিবাদ থেকে ১৯৭১ সালে বাংলার মানুষ একটি মুক্তিযুদ্ধের পতাকাকে উত্তোলন করেছিলো। এনেছিলো স্বাধীনতা।

আমি কী এখন বলবো যে, অলি আহাদ নামের একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ আমাদের স্বাধীনতার প্রথম ধ্বনিটি উচ্চারণ করেছিলেন। সূত্রপাত করেছিলেন একটি নতুন সংগ্রামের।

আমি একজন সামান্য কবি মাত্র। রাজনীতির সর্পিল পথ আমার জন্যে নয়। আর এ ব্যাপারে আমি কোনো শেষ কথাও বলতে চাই না। শুধু বলতে চাই আমাদের রাজনীতিতে এই যে একজন সত্যিকার সত্যনিষ্ঠ সেনানী তাঁকে যেন আমরা চিরকাল শ্রদ্ধা করি, মনে রাখি। কেননা সত্যকে নির্বাসিত করা মানেই জীবনের উল্টো দিকে যাত্রা করা।

জনাব অলি আহাদ আমার শ্রদ্ধাভাজন। তাঁকে নিয়ে নির্মিত বর্তমান সম্মাননা গ্রন্থটিতে এদেশের বহু গুণী মানী শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা লিখেছেন। এমন একটি গ্রন্থের ভূমিকা রচনার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই। সুতরাং আমার এ ক্ষুদ্র লেখাটিকে কোনো ভূমিকা মনে না করে জনাব অলি আহাদের প্রসঙ্গে একজন কবির শ্রদ্ধার্ঘ মনে করলেই যথার্থ হবে। এ কাজের জন্যে আমাকে অনুরোধ করায় স্নেহভাজন মুন্সি আবদুল মজিদ-কে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার বিশ্বাস বর্তমান বাংলাদেশকে একমাত্র আমাদের সততাই বাঁচাতে পার।

নিভৃতি। ১১/১ মধ্য বাসাবো
ঢাকা ১২১৪ । ১১.১২.২০০২

ফজল শাহাবুদ্দীন

www.pathagar.com

সম্পাদকের কথা

কিশোর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমাদের মুক্তিযুদ্ধটা ছিলো সাধারণ মানুষের যুদ্ধ। যাকে বলে জনযুদ্ধ। এ দেশের গুটি কয়েক পাকিস্তানী দালাল ছাড়া দলমত নির্বিশেষে সব শ্রেণীর লোক, যে যেভাবে পেরেছে এই মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। উপ-মহাদেশের একটি সুসংগঠিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনায় অনভিজ্ঞ এদেশের যুবকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বল্পকালীন ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশকে স্বাধীন করেছে। স্বাধীন দেশে আমাদের সকলের প্রত্যাশা ছিলো দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ ভাবে দেশকে গড়ে তোলার প্রয়াস পাবো। কিন্তু দুর্ভাগ্য এদেশের, দুর্ভাগ্য এই জাতির। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই শুরু হয়ে যায় সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। যে উদ্দেশ্য ও চেতনা নিয়ে দেশকে হানাদারমুক্ত করে স্বাধীন করেছিলাম তা দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাসহ সাধারণ জনগণকে আশাহত করে। তৎকালীন দেশের এমন নাজুক ও অসহনীয় পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েছিলাম ঢাকায় পাড়ি দিতে। আশ্রয় নিয়েছিলাম প্রখ্যাত রাজনীতিক জনাব অলি আহাদের কাছে। এরপর আমি 'সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ' পত্রিকায় বেশ কিছুকাল সক্রিয় কাজ করি। সেইসঙ্গে অলি আহাদ সাহেবের রাজনৈতিক দলের একজন কর্মী হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে।

অত্যন্ত কাছ থেকে জনাব অলি আহাদকে যেভাবে দেখেছি, পর্যবেক্ষণ করেছি, জেনেছি এবং উপলব্ধি করেছি তা এদেশের জনগণের কাছে প্রকাশ করার লালিত ইচ্ছে আমার দীর্ঘদিনের। কিন্তু অব্যক্ত কথাগুলো শব্দের মালা গেঁথে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার যোগ্যতা আমার নেই। তাই এ দেশের প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, লেখক-সাহিত্যিকসহ জাতীয় পর্যায়ের সম্মানিত ব্যক্তিরা এই নির্মোহ উদার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতা জনাব অলি আহাদ সম্পর্কে কি ভাবছেন, কি ভাবে মূল্যায়ন করছেন তা নিয়ে 'চির বিদ্রোহী অলি আহাদ' গ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছি।

আশির দশক পর্যন্ত 'সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ' ছিলো একটি বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় পত্রিকা। জনপ্রিয়তা থাকা সত্বেও অর্থাভাবে পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি। পত্রিকা জগতে একটি প্রবচন আছে "পত্রিকা চালানো; আর হাতির খোরাক যোগানো" দুরূহ কাজ। কথাটি মিথ্যে নয়। অলি আহাদ অনেক কিছু করেছেন ইত্তেহাদ পত্রিকার জন্য। কিন্তু টিকিয়ে রাখতে পারেননি। রাজরোষে পড়ে ইত্তেহাদ দু-দুবার বন্ধও হয়েছিলো। ইত্তেহাদ পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে সত্য কিন্তু ইত্তেহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউই বলতে পারবেন না যে, অলি আহাদের কাছে এক পয়সা পাওনা আছে। ঘাম শুকাবার আগেই পারিশ্রমিক দেয়ার সতর্ক মানসিকতা পোষণ করতেন অলি আহাদ।

অলি আহাদকে অনেকে মনে করেন ভারত বিদ্বেষী ও সাম্প্রদায়িক। কারণ, তিনি তাঁর পত্রিকা ইত্তেহাদে স্বাধীনতার পর পর ভারতের যে সব উদ্যোগ বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থি ছিল, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানাতেন। তিনি তার বক্তব্যে বার বার বলতেন যে 'পিন্ডির দাসত্ব-শৃংখল থেকে মুক্ত হয়েছি দিল্লির দাসত্ব-শৃংঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার জন্য নয়।' দেশপ্রেমকে বিদ্বেষ বলে চিন্তা করা সঠিক নয়। নৈতিক বিচারে যা অন্যায়, যেকোন কায়েমী স্বার্থবাদী আহত হলেও তিনি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকাই পালন করেছেন। এটাই হচ্ছে তাঁর সারা জনমের অভ্যাস। আর যারা তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলে মনে করেন তাদের প্রতি নিবেদন, আপনারা যদি পাঁচ

www.pathagar.com

দশকের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফিরান তাহলে এই অভিযোগের অসারতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে। নিজের জীবন বিপন্ন করে এই অলি আহাদই ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে দাঙ্গা প্রতিরোধের পাকা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। দাঙ্গা প্রতিরোধে সেদিন অলি আহাদ ও তাঁর যুবলীগ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁতী বাজারের মুখে তো মুসলিম লীগের গুন্ডারা তাঁর খতনা নিয়েই প্রশ্ন তুলে ছিলো। বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার কথা বলতে গিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলা কখনও সাম্প্রদায়িকতা নয়। তথ্য বিকৃত করে সত্য উপলব্ধিতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা মহা অপরাধ।

অলি আহাদ এর ব্যক্তিগত জীবন এবং পারিবারিক জীবন খুবই সাদাসিধে। তাঁর স্ত্রী ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। সাদাসিধে জীবনই তিনি পছন্দ করেন। প্রত্যেক মানুষেরই একটি দাম আছে। সেই দামের কড়িটির প্রলোভন দেখালে তাকে কেনা যায়। অলি আহাদের কখনও সেই কড়িটির প্রতি প্রলোভন ছিলো না। হয়তো বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে এটাই তাঁর জীবন ট্র্যাজেডির মূল কারণ। অবশ্য এই গুণের কারণেই তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে সততার প্রতীক, অনন্য অসাধারণ দৃষ্টান্তধর্মী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন।

গত অর্ধ শতাব্দীর রাজনীতির অঙ্গনে যারা বিচরণ করেছেন, রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আপোস ও ক্ষমতা লাভের চোরা গলিতে নিজের বিশ্বাসকে বলি না দিয়ে, আজও যারা বেঁচে আছেন তাদের মধ্যে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক অলি আহাদ। তিনি আমাদের সমকালীন রাজনীতির বিবেকী ধারার স্বার্থক প্রতিনিধি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুখোড় মেধাবী ছাত্র অলি আহাদ আগাগোড়া একজন রাজনীতিবিদ। জন্ম ১৯২৮ সালে সাবেক কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ইসলামপুর গ্রামে। পিতা মরহুম আবদুল ওহাব ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার। ১৯৪৪ সালে হোমনা হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অলি আহাদ ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৬ সালে আইএসসি পরীক্ষা দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কারণ তিনি তখন পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে প্রথম বিভাগে আই এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি কম ক্লাসে ভর্তি হন। আই এস সিতে ভাল রেজাল্ট করার জন্য তিনি হাজী মুহাম্মদ মহসিন ট্রাস্টের মাসিক ২০ টাকা হারে বৃত্তি লাভের জন্য নির্বাচিত হন। অবশ্য গরীব ছাত্রদের হক মনে করে, এই টাকা তিনি গ্রহণ করেন নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র অলি আহাদ তখনকার অনেকের স্মৃতিচারণায় এক অত্যুজ্জ্বল সম্ভাবনাময় বিপ্লবী তরুণ। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চের ভাষা আন্দোলনে প্রথম কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। সেই যে কারাগারে ঢুকলেন তারপর দফায় দফায় বিভিন্ন সরকারের আমলে তিনি প্রায় একযুগ কারাবরণ করেছেন- আত্মগোপন করে থেকেছেন আরো কয়েক বছর।

'৪৯ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানের শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত মূলনীতি রিপোর্টে পূর্ববাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের অঙ্গীকার উপেক্ষিত হলে এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সৃষ্টি হয় অলি আহাদ তাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। উল্লেখ্য, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্ত্বেও এ সংগঠনকে অসাম্প্রদায়িক না করার প্রতিবাদে তিনি সে সংগঠন থেকে পদত্যাগ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবেতনভূক্ত কর্মচারীদের অন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক অলি আহাদ। '৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ। এই যুবলীগই এদেশে অলি আহাদের নিরলস প্রচেষ্টা ও নেতৃত্বে প্রগতিশীল আন্দোলনের সূচনা করে এবং '৫২ এর ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত ইতিহাসে সবচাইতে বেশী অবদান এ সংগঠনের। '৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি কম পরীক্ষায় প্রথম হওয়া সত্ত্বেও অলি আহাদকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

www.pathagar.com

এম,কম ক্লাসে ভর্তি করা হয়নি। আমাদের জানা মতে, রাজনৈতিক কারণে বহিষ্কৃত এমন কোন ব্যক্তি নেই। দেশের মানচিত্র বদলালো, এত পরিবর্তন হলো, রাজার ইচ্ছায় কেবল ঘটনা বিকৃতই হল। আমাদের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজও জনাব অলি আহাদের বহিষ্কারাদেশ বাতিল করেনি। এটা শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয় সমগ্র জাতির জন্য এক অমোছনীয় কলঙ্ক।

'৫২ সালের রক্তস্নাত মহান একুশে ফেব্রুয়ারীর রক্তাক্ত অধ্যায়ের প্রধানতম নায়ক অলি আহাদ। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা বিশেষতঃ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে তাঁর তেজোদৃপ্ত বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের মধ্যদিয়ে এদেশের ছাত্র তথা যুব সমাজের বিপ্লবী মনোভঙ্গি প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। একুশে ফেব্রুয়ারীকে কেন্দ্র করে সূচিত সংগ্রামসহ ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারী ঢাকা নগরীর উত্তাল গণআন্দোলনের মধ্যদিয়ে শহীদ মিনার নির্মাণ ইত্যকার ঘটনার প্রধান নায়ক জনাব অলি আহাদ।

এরই ধারাবাহিকতায় ৫৩ সালে কারাগার থেকে মুক্তির পর ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় অন্তরীণ হন। অন্তরীণ আদেশ প্রত্যাহৃত হলে তিনি মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক (৫৩) এবং ৫৫-৫৬ সালে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। স্মৃতিচারণে অনেকে এ অভিমত প্রকাশ করেছেন মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে শেখ মুজিব- অলি আহাদ এ জুটি এদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় এবং তাদের প্রচেষ্টায় সে সময়ে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ গণভিত্তি লাভ করেছিল। আস্‌ল ১৯৫৭ সাল- আওয়ামী লীগের সম্মেলন, যা ইতিহাসে কাগমারী সম্মেলন হিসেবে খ্যাত। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। সে সম্মেলনে অলি আহাদ পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, বাগদাদ চুক্তি ও সিয়াটো নামক সামরিক চুক্তি প্রত্যাহারের বলিষ্ঠ দাবী জানান। কম্যুনিস্ট পার্টি এদেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শ্লোগান নিয়ে জন্ম নিয়েছে- এটা তাদের আদর্শিক ভিত্তি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রকাশ্য বক্তব্য রাখেন মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী ও অকমিউনিস্ট অলি আহাদ। সেদিন তাঁকে নেহরুর দালাল আখ্যা দিয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ চক্র। মাশুল শুধু তাঁকেই দিতে হয়নি- মজলুম জননেতা ভাসানীকেও দিতে হয়েছিল।

অলি আহাদ দল থেকে সাসপেন্ড হলেন, এর প্রতিবাদে ৮ জন আইন পরিষদ সদস্য পদত্যাগ করলেন, মওলানা ভাসানী বেরিয়ে এলেন। প্রতিষ্ঠিত হল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। অলি আহাদ হলেন এ সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক। তারপর তো আইয়ুবের সামরিক শাসন, '৫৮ সালে আবার কারাগার-'৬৩ সালের শেষের দিকে বেরিয়ে এলেন। '৬৯ সালে আতাউর রহমান খানকে সভাপতি করে জাতীয় লীগ গঠন করা হয়। অলি আহাদ তার সাধারণ সম্পাদক। এ সময়ে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন প্রায় তুঙ্গে, পেশ করলেন ৭ দফা, আবার কারাগার। আস্‌ল এদেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধ। লিখিত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় অলি আহাদ মুক্তিযুদ্ধের এবং এর প্রেক্ষাপট রচনার শীর্ষস্থানীয় সংগঠক। তাঁর বক্তব্য ছিল দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে গণযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলন করা, যা দিল্লীর পছন্দ হয়নি।

স্বাধীন বাংলাদেশে তিনিই সর্বপ্রথম ২৫ সালা দাসত্ব চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিলেন; আজাদ বাংলার ডাক দিয়েছিলেন। এ জন্য পরম নিকটজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কারাগারে ১৪ মাস তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। বেরিয়ে এসেছিলেন '৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর। ১৯৭৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ডেমোক্রেটিক লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে অলি আহাদ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৮০ সালের ২৩শে মে বায়তুল মোকাররম এর জনসভায় সাপ চালান ও গ্রেনেড হামলায় ৯ জন নিহত হওয়ার পর ডি এল সভাপতি সাবেক প্রেসিডেন্ট খন্দকার মুশতাক আহমদের সাথে মত পার্থক্য হওয়ার কারণে দুই নেতার এক মঞ্চে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠে। '৮২ সালের ২৪ মার্চ

www.pathagar.com

সেনাবাহিনী প্রধান হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার পর অলি আহাদ আবার গর্জে উঠেন। জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের অন্যতম নেতা অলি আহাদের বলিষ্ট নেতৃত্বে সামরিক শাসন অস্থিতিশীল হয়ে উঠে। অলি আহাদ একমাত্র রাজনীতিবিদ এরশাদ শাসনামলে যার রাজনৈতিক কারণে সামরিক আদালতে ট্রায়াল হয়।

এ সময়ে অলি আহাদ এর নেতৃত্বে ৬ দল, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দল, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ দল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। '৯০ এ স্বৈরাচারী এরশাদের পতন হলে, বিএনপি সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের গঠনমূলক কঠিন সমালোচনা করেন। '৯৬র নির্বাচনে শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় এলে'৯৮ সালে ১২ নভেম্বর বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দল গঠন করা হয়। জনাব অলি আহাদ ৭ দলের অন্যতম নেতা হিসাবে বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন। উল্লেখ্য বর্তমানে যে জোট সরকার ক্ষমতাসীন, সে জোটের অন্যতম রূপকার অলি আহাদ।

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক সক্রিয় কর্মী, ক্ষুদে নেতা থেকে শুরু করে মহান ভাষা আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন অলি আহাদ। বিরতিহীনভাবে যিনি পথ চলেছেন তাঁর আর পেছনে তাকানোর সুযোগ হয়নি। ব্যক্তি জীবনের প্রতি উদাসীন অলি আহাদ কাজ করেছেন দেশ বরেণ্য নেতা শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ প্রায় সব নেতাদের সাথেই। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে ছিল তাঁর অত্যন্ত হৃদ্যতা। তাঁর জীবনে সফলতা যেমন আছে ব্যর্থতাও তেমনি আছে। মানুষ মাত্রেরই কিছু মানবীয় দুর্বলতা থাকে। অতি নিকটে অবস্থান করে আমি অলি আহাদ সাহেবের দু'টি দুর্বলতম দিক প্রত্যক্ষ করেছি। এর একটি হচ্ছে সম্মানবোধ, অপরটি সরলতা। প্রখর আত্মসম্মান বোধ-এর কারণে তাঁকে অনেক অর্জন বিসর্জন দিতে হয়েছে কিংবা দিয়েছেন। বাস্তবতার প্রয়োজনে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সব মানুষই কখনও কখনও কোন ক্ষেত্রে সুবিধালাভের কারণে কম্প্রমাইজ করেন কিন্তু অলি আহাদ সম্মানবোধের কাতরতায় কখনই কোন সমঝোতাকে প্রশ্রয় দেন নি। এতে লাভ ক্ষতিকে তিনি কখনই কেয়ার করেন নি। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে সরলতা। তীক্ষ্ণ আত্মোপলব্ধি সম্পন্ন এই মানুষটির মাঝে আমি শিশুর মত অনেক সরলতা প্রত্যক্ষ করেছি। এর মধ্যে নিজে যেমন সহজ সরল, অপরকে বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও তাঁর মধ্যে এই সারল্য প্রত্যক্ষ করেছি। ফলে রাজনীতির মাঠে শঠতা ও কূটচালের কাছে তাঁকে বহুবার মনোকষ্ট বরণ করতে হয়েছে। সরল অংকের দৃষ্টিতে তিনি সবাইকে দেখার চেষ্টা করলেও অনেকেই তাঁর প্রতি ধূর্ত ও শঠতাপূর্ণ আচরণ প্রকাশ করেছেন। বড় বড় রাজনৈতিক নেতা থেকে রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তি বিশেষ পর্যন্ত এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

বিভাগপূর্ব ভারত এবং পাকিস্তান আমলের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে এসে তাঁর মধ্যে এক ধরনের আদর্শ ও ঐতিহ্য লালনের মানসিকতা কাজ করে। কিন্তু চলমান সময়ে অধিকাংশ নেতা কর্মীর মাঝে সহজ প্রাপ্তির প্রত্যাশা এবং ধূর্ততার আশ্রয় গ্রহণের মানসিকতা তাঁকে ব্যথিত করে এবং এরই ফলশ্রুতিতে হয়তো তাঁকে কখনও কখনও অস্থিরতা এবং উত্তেজনাবোধে অসহিষ্ণু হতে দেখেছি। আসলে তিনি যেভাবে ভাবেন এবং কিছু করতে চান, তেমন মানসিকতার একটা সহকর্মী দল তাঁর জন্য বড় বেশী প্রয়োজন ছিল। তাতে হয়তো তাঁর চলার পথটা সহজ ও গতিময় হয়ে উঠতো। দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ অলি আহাদ, নিজেকে নিয়ে কখনোই ভাবেন নি। পাওয়া না পাওয়ার বেদনা কখনোই তাঁকে ক্লান্ত করেনি, বিষন্ন করেনি। বিরামহীন ভাবে তিনি চলেছেন। এই সত্তরোর্ধ্ব বয়সেও তাঁর বিরাম নেই।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে, '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে '৬২, '৬৯, '৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে, কারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, কার কি ভূমিকা

www.pathagar.com

ছিল, এই সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জি নিয়ে নিখাঁদ সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ কোন ইতিহাস অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি। যেসব পুস্তক বা গ্রন্থ রচনা হয়েছে তা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট বলেই, দেশের মানুষ বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট। এটি যেমন একটি দিক অন্যদিকে গত ৩০ বছর ধরে যারা ক্ষমতার রাজনীতি চর্চা করেছেন, তারা তাদের সময়ের যুব সমাজকে আদর্শবাদ, ন্যায়নীতি, ত্যাগ-তিতিক্ষার দীক্ষা এবং শিক্ষা না দিয়ে, একান্তই গোষ্ঠিগত ও ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থে করে তুলেছেন আদর্শবিমুখ, চরিত্রহীন-উচ্চাভিলাষী। বিভিন্ন শাসনের সময়ের তরুণেরা বিকৃত, মতলবী ইতিহাস পাঠে জেনে এবং শুনে বিভ্রান্ত। ৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে বাংলার একচ্ছত্র নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও '৭১ সালে তাঁর নামের উপরেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। একই ভাবে অলি আহাদও এক জীবন্ত কিংবদন্তি। বিশেষ করে ৪০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে এমন কোন জাতীয় পর্যায়ের ঘটনা নেই যেখানে অলি আহাদ অনুপস্থিত। জাতীয় জীবনের ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে অলি আহাদ সাহেবের উপস্থিতি উজ্জ্বলতর। যদিও বর্তমান যুবসমাজ, ন্যায়নীতি, ত্যাগ-তিতিক্ষা কাকে বলে জানে না, মানে না। তবু আমার এই বই সম্পাদনার উদ্দেশ্য তারাই। নতুন প্রজন্মকে ক্ষমতাশ্রয়ী কেনা-বেচার চরিত্রহীন আদর্শহীন রাজনীতি থেকে ফিরিয়ে আনতে হলে, তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে তাদেরই পূর্ব-পুরুষদের বাস্তব জীবনের দৃষ্টান্ত, যাঁরা তাদের, শ্রম, ঘাম, মেধা-মনন ও জীবন দিয়ে নির্মান করেছেন আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্র, একটি স্বপ্নের আবাসভূমি।

এখানে উল্লেখ্য যে,বাংলাদেশের অন্যতম স্থপতি অলি আহাদ আজকের দিন পর্যন্ত একজন অশান্ত বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করে চলেছেন। নূরুল আমীন, নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান, আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, শেখ মুজিবুর রহমান, জেনারেল জিয়া, জেনারেল এরশাদ পর্যন্ত প্রতিটি সরকারের আমলে তিনি কারারুদ্ধ হয়েছেন- কখনও কখনও আত্মগোপন করতে হয়েছে তাঁকে। শুধু এরশাদ শাসনামলেই তিনি ছয়বার কারারুদ্ধ হন। তিনি আজ পর্যন্ত ১৭ বার কারারুদ্ধ হন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি সরকারই তাঁকে মন্ত্রীত্বের লোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছে কিন্তু তিনি মন্ত্রিত্বের টোপ গিলেন নি। রাজনীতিতে তিনি বেছে নিয়েছেন বিবেক নির্দেশিত কন্টকাকীর্ণ পথ। মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর স্নেহধন্য অমিত সাহসের অধিকারী এ বয়োবৃদ্ধ নেতা কোন অন্যায়ের সাথে, দেশের স্বার্থ বিরোধী কোন পদক্ষেপের সাথে, গণতন্ত্রের কিংবা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কোন বিচ্যুতির সাথে আপস করেন নি। তিনি যে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে যাচ্ছেন, তাকে ঈর্ষা না করে একে অনুসরণ করলে আমাদের রাজনীতি অনেক পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হবে।

আমার অন্তরের তাগিদ ও সদিচ্ছার শক্তি আমাকে আলোচ্য সম্মাননা গ্রন্থটি সম্পন্ন করে পাঠকদের কাছে তুলে দিতে পারার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। এই বই প্রকাশে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি এগিয়ে আসায় আমি সোসাইটির চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মুনাওয়ার আহমদ, ভাইস চেয়ারম্যান বেনাউল ইসলাম,বন্ধুবর তোফাজ্জল হোসেন, সু-লেখক সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বইটি প্রকাশের পথে যাঁদের সহযোগিতা, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা পেয়েছি তাঁরা হলেন সর্বজনাব বখতিয়ার উদ্দীন চৌধুরী, এহসানুল হক সেলিম, মীরাজ আব্বাসী, মোহাম্মদ বাসিরুল হক সিন্‌হা, রফিক বিন নিজাম, শেখ মোঃ আবু তাহের, গোলাম মোস্তফা ভূঁইয়া, মিজানুর রহমান মিজান, এহসানুল কবীর দুলাল ও নাসিম আহমেদ।

অলি আহাদ সম্পর্কে পুরোপুরি মূল্যায়ন এত ক্ষুদ্র কলেবরে সম্ভব নয়। তবু আলোচ্য গ্রন্থে যেটুকু বিষয় উদ্ধৃত হয়েছে, আশা করি পাঠকদের ভাল লাগবে এবং তারা অনুপ্রাণিত হবেন।

তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০০২

মুন্সি আবদুল মজিদ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

অলি আহাদ মহান ভাষা আন্দোলনের প্রধান নেতা ১
-খালেদা জিয়া
অলি আহাদ আদর্শবান ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেদীপ্যমান থাকবেন ৩
-কাজী জাফর আহমদ
ঐক্যবদ্ধ সর্বদলীয় ফ্রন্ট গঠন করতে হবে এটাই সময়ের দাবী ৯
-অলি আহাদ
অগ্রজতুল্য অলি আহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি ৩
-এমাজ উদ্দীন আহমদ
অলি আহাদ ও বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ১৫
-আনিসুজ্জামান
অলি আহাদ সাহেবের কথা ২৩
-বদরুদ্দীন উমর
অলি আহাদঃ আপোষহীন সংগ্রামী ২৯
-আখ্‌তার-উল্-আলম
উজান স্রোতের আপোষহীন দুঃসাহসী মাঝি ৪২
-আবদুল গফুর
জাতীয় রাজনীতির বিবেক পুরুষ অলি আহাদ ৪৫
- ডঃ মাহবুব উল্লাহ
কালের পাতায় কালাধার ৪৮
-আল মুজাহিদী
চির উন্নত শির অলি আহাদ ৫২
-বাহাউদ্দীন চৌধুরী
চির বিদ্রোহী অলি আহাদ ৫৩
-নূরুন্নবী
অলি আহাদ ঃ দেশপ্রেমিকতা যাঁর রাজনীতির একমাত্র ধর্ম ৫৫
-অধ্যাপক মোমেনুল হক
একজন স্পষ্টবাদী অলি আহাদ ৫৮
-ডঃ তারেক শামসুর রেহমান
অর্ধ-শতাব্দীর চলমান ইতিহাসঃ অলি আহাদ ৬১
-আসাদ চৌধুরী
অলি আহাদের অপর নাম আপোষহীন সংগ্রাম ৬৪
-শামসুজ্জামান মিলন
অলি আহাদ আপোষহীন যোদ্ধা ৬৬
-ইসমাইল হোসেন বেঙ্গল
অলি আহাদ॥ এক সাচ্চা দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদীর প্রতিকৃতি ৭৫
-এহ্‌সানুল হক সেলিম
ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃতকরণ ও তার নায়কেরা ৮৪
-বদরুদ্দীন উমর
ভাষা সৈনিক সুলতানের মতো অলি আহাদের মৃত্যু যেন ঢাকা মেডিকেলের বারান্দায় না হয় ৮৮
-বখ্‌তিয়ার উদ্দীন চৌধুরী
তৃতীয় মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে অলি আহাদ ৯২
সামরিক আদালতে অলি আহাদের জবানবন্দি
চির বিদ্রোহী অলি আহাদের মুখোমুখি ৯৫

www.pathagar.com

একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিহাস॥ সত্যাগ্রহীর সাক্ষ্য ১০১
-আমীর আলী
খালেদা জিয়া আমার কথা শুনলে অনেক আগেই হাসিনা পড়ে যেতো ১৩৫
- অলি আহাদ
দৈনিক ইনকিলাবের গোল টেবিল বৈঠকে অলি আহাদ ১৪৩
একুশ ফেব্রুয়ারি থেকে ছাব্বিশ মার্চ ইতিহাসকে ইতিহাসের মতো করে লেখা যায় না কি ১৬৭
-নির্মল সেন
অলি আহাদের রাজনীতি॥ ভিন্ন মতাবলম্বীর দৃষ্টিতে ১৭১
-শফিকুল আজিজ মুকুল
একুশের ঘটনাপঞ্জী ১৭৫
-খোন্দকার গোলাম মুস্তফা
পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি
হিসেবে জনাব অলি আহাদের অভিভাষণ॥ ১৮২

www.pathagar.com

অলি আহাদ মহান ভাষা আন্দোলনের প্রধান নেতা

-খালেদা জিয়া

[১২ই মার্চ, ১৯৯৯ শুক্রবার বিকেল ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে 'জননেতা অলি আহাদের জাতীয় সংবর্ধনা কমিটির' সভায় প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রদত্ত ভাষণ]

মাননীয় সভাপতি, বিদ্রোহী জননেতা অলি আহাদ ও সুধীমন্ডলী-
আসসালামু আলাইকুম।

আজ আমরা যে জনপদ এবং যে রাষ্ট্রের গর্বিত নাগরিক বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ দশক থেকে পরবর্তী প্রতিটি দশকের বিশাল সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন আমাদের বর্তমান সত্তা এবং মননকে নির্মাণ করেছে। আর এই প্রতিটি দশকেরই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট আছে।

প্রত্যেক জাতির জন্য ইতিহাস-বোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস-বোধ একটি জাতির আত্মোপলব্ধিকে স্বচ্ছ করে, চেতনাকে শানিত করে এবং জাতীয় প্রত্যয়কে নতুন নতুন বিজয়ে অনুপ্রাণিত করে।

ইতিহাসই যুগে যুগে এক-একজন মহান ব্যক্তিত্বের মানুষকে সৃষ্টি করে। আবার বিরল প্রতিভা এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এই মহানায়কেরা নতুন ইতিহাস রচনা করে, সমাজকে বিকাশের নতুন সোপানে অধিষ্ঠিত করেন, জাতিকে সঙ্কট উত্তরণের দিক-নির্দেশনা দেন এবং মানুষকে মহৎ মর্যাদা দেন।

আমাদের সমকালে অলি আহাদ এমন একজন মানুষ।

৪০-এর দশক ছিল বৃটিশ উপনিবেশবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সব চাইতে ঘটনাবহুল এবং চূড়ান্ত বিজয়ের দশক। আমাদের জাতিসত্তার উন্মেষ এবং নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দশক। অলি আহাদের রাজনৈতিক জীবনের শুরু এই দশকে। এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক নিপীড়ন বিরোধী লড়াই আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে তিনি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। চূড়ান্ত বিচারে এ লড়াই-ই হচ্ছে সর্বোত্তম গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত স্বদেশ, নিপীড়ন ও বঞ্চনামুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ এবং সমৃদ্ধ সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন সেদিন তাঁকে গৃহের নিরাপদ অবস্থান থেকে রাজনীতির বন্ধুর পথে টেনে এনেছিল।

৫০-এর দশক ছিল এই স্বপ্ন ভঙ্গের দশক। নিপীড়ন ও বঞ্চনামুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ এলো না। আমাদের জাতিসত্তার উপর আঘাত এলো। '৫২'র ভাষা আন্দোলন ছিল তারই বিরুদ্ধে গর্জে উঠা। ইতিহাস বিকৃতির শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ সত্যটি আজ ১২ কোটি মানুষের কাছে স্পষ্ট যে, অলি আহাদ মহান ভাষা আন্দোলনের প্রধান নেতা। এই দশকেই তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসন এবং সকল মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে উঠে। এ সংগ্রামেও মওলানা ভাসানীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী নেতা অলি

www.pathagar.com

আহাদ। এই দশকেই অন্যান্য গণতন্ত্রকামী নেতা ও কর্মীদের সাথে অলি আহাদের জেল জীবনের শুরু।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনকালে ৬০-এর দশকের পুরোটাই ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কাল। এখানেও এনডিএফ গঠন থেকে সকল পর্যায়ে অলি আহাদের অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

৭০-এর দশকের প্রথম পাঁচ বছর ছিল মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী কালের ভারতের পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং ফ্যাসিষ্ট একদলীয় শাসনের কবল থেকে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার অসম সাহসী লড়াই এর বছর। রাজনৈতিক নেতা অলি আহাদ এই দুই লড়াই এ সামনের সারিতে ছিলেন। তাঁর পত্রিকা সাপ্তাহিক 'ইত্তেহাদ' তখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাজনীতিবিদ অলি আহাদ এবং সম্পাদক অলি আহাদকে কারাগারে যেতে হয়েছিল। 'ইত্তেহাদ' নিষিদ্ধ হয়েছিল।

৮০-র দশকে গণতন্ত্র এবং সংবিধানের উপর আবার যখন আঘাত এলো অলি আহাদ রাজপথে নেমেছিলেন।

আমাদের জাতি এবং ইতিহাসের একটি দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা গণতন্ত্রের পথে প্রগতির পথে পা বাড়িয়েছি তখনই দেশী ও বিদেশী প্রতিকুল শক্তি আঘাত হেনেছে, সব কিছু তছনছ করে দিয়েছে। এই দশকের প্রথম ৫ বছরে আমরা দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলাম। সংবিধানকে তার মহৎ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলাম। অর্থনীতিকে জনকল্যাণ মুখী বিকাশের পথে এনেছিলাম। রাষ্ট্রীয় মর্যাদাকে বিশ্ব দরবারে সমুন্নত করেছিলাম। ৯৬-এর সাজানো নির্বাচনের পর জাতীয় বিশ্বাসঘাতক গণতন্ত্র হত্যাকারীরা ক্ষমতা দখলের পর সব কিছু আবার তছনছ হয়ে গেছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং অখন্ডতা, সংবিধান, গণতন্ত্র, অর্থনীতি, জাতীয় সংস্কৃতি এবং আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ সবকিছুই আজ আবার বিপন্ন। আজকের লড়াই তাই সর্বাত্মক।

৪০-এর দশকের তরুণ অলি আহাদ আজকের বর্ষীয়ান জননেতা অলি আহাদ আবারো সংগ্রামের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছেন।

অলি আহাদ আমাদের রাজনীতিতে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। নীতির প্রশ্নে তিনি কখনও আপোষ করেননি। প্রলোভন কখনও তাকে বশীভূত করেনি। বলা যায় তিনি আজ "জাতির বিবেকে" পরিণত হয়েছেন।

আজ আমরা এখানে জনাব অলি আহাদকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য সমবেত হয়েছি। তাঁকে সর্বোত্তম সম্মান আমরা কি দিতে পারি? আমি বিশ্বাস করি, বর্তমান গণবিরোধী, সংবিধান লঙ্ঘনকারী, রাষ্ট্রীয় অখন্ডত্ব এবং অস্তিত্ব বিরোধী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে জাতীয় ঐক্য আমরা গড়ে তুলেছি তাকে আরো দৃঢ় করা এবং যে সংগ্রাম আমরা চালিয়ে যাচ্ছি তাকে সফল করাই হবে জননেতা অলি আহাদের প্রতি জাতির দেয়া সবচাইতে বড় সম্মান। স্বাধীন স্বদেশ, গণতান্ত্রিক সমাজ এবং সমৃদ্ধ সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন নিয়ে অলি আহাদ তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন, আসুন আমরা সেই স্বপ্নকে বাংলাদেশে মূর্ত এবং অক্ষয় রূপ দিই।

আমি জনাব অলি আহাদের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবনের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে দো'আ করছি।

www.pathagar.com

অলি আহাদ আদর্শবান ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেদীপ্যমান থাকবেন

কাজী জাফর আহমদ

[১২ই মার্চ শুক্রবার ১৯৯৯ জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে 'অলি আহাদ জাতীয় সংবর্ধনা কমিটি' আয়োজিত সভায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী জননেতা কাজী জাফর আহমদ এর ভাষণ]

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আজকের এই ব্যতিক্রমধর্মী ঐতিহাসিক সংবর্ধনা সভার প্রিয় সভাপতি প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার চাষী নজরুল ইসলাম! আজকের সভার প্রধান অতিথি বিরোধী দলের সম্মানীয় নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং যাকে কেন্দ্র করে সংবর্ধনা জানাবার জন্য আজ আমরা এখানে সবাই সমবেত হয়েছি, সেই অকুতোভয় আপোষহীন রাজনীতিবিদ, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনের সিপাহসালার, জাতীয় নেতা জনাব অলি আহাদ এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ!

আজকে বক্তব্যের শুরুতেই আমি কিছু স্মৃতিচারণ করতে চাই। সুমহান ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল। এরপর সুদীর্ঘ ৪৭ বছরের এই রাজনৈতিক পথপরিক্রমায় যে কয়েকজন রাজনীতিবিদ সব সময় আমার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তার মধ্যে জনাব অলি আহাদ তালিকার শীর্ষেই ছিলেন। আমি অলি আহাদকে শ্রদ্ধা করি। কারণ তিনি তাঁর নীতি ও বিশ্বাসে অটল, আপোষ শব্দটি তার অভিধানে নেই। তিনি যা বিশ্বাস করেন, তা প্রকাশ করতে তিনি নির্ভয়, দুর্জয়, সাহসী। তিনি নির্লোভ, ক্ষমতার মোহ থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ, মেধাবী ছাত্র হিসেবে রাজনৈতিক জীবনে তাঁর পদচারণা শুরু। আন্দোলন সংগ্রামের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনগুলোতেও তিনি বি. কম. পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে সেদিন এক অনন্য অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। আজও যে কয়েকজন হাতে গোণা রাজনীতিবিদ লেখাপড়া করে রাজনীতি করেন, তিনি তাদের শীর্ষ স্থানে আছেন। শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয় ব্যক্তিগত ও সাংসারিক জীবনেও তিনি নীতিবান, সৎ ও আন্তরিক। চারিত্রিক সততা ও দৃঢ়তায় তিনি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অবশ্যই আদর্শবান ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেদীপ্যমান থাকবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। তবে শুধু এ কারণেই জনাব অলি আহাদকে আমি শ্রদ্ধা করি তা নয়, তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করার পেছনে ঐতিহাসিক কারণও আছ। এখন আমি সে ইতিহাস তুলে ধরতে চাই।

প্রথমেই আসে ভাষা আন্দোলনের কথা। আজকে একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ভাষা আন্দোলন না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হত না। আর অলি আহাদের জন্ম না হলে ভাষা আন্দোলন সফল হত না, বাংলাদেশও স্বাধীন হত না। আমি ইতিহাসের পাতা থেকে এ সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতি দিতে চাই। আমরা সবাই জানি ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী যেদিন ঐতিহাসিক আমতলা সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হয়েছিল, তার আগের দিন রাতে অর্থাৎ ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয়

www.pathagar.com

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেছেন সাবেক অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের প্রাজ্ঞ সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম। সেদিন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির অধিকাংশ সদস্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেও তৎকালীন যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক আবদুল মতিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে খুব জোরালো ভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করেছিলেন। আমি বদরুদ্দীন উমর লিখিত 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' বইটির ১৭৬ পৃষ্ঠা থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরছি। ১৪৪ ধারা প্রসঙ্গে তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক বলেছিলেন, প্রথমত আওয়ামী মুসলিম লীগ নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করে, দ্বিতীয়ত গোলযোগের সুযোগগ্রহণ করে সরকার প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচন অনিশ্চয়তার গর্ভে নিক্ষেপ করবে এবং তৃতীয়ত রাষ্ট্রবিরোধী ও ধ্বংসাত্মক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। একথা বলে তিনি সেদিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষে নিজের মত প্রকাশ করেছিলেন। ইতিহাসে একথা লেখা আছে জনাব আবুল হাশিম নিজেও এবং আওয়ামী লীগ নেতা কমরুদ্দীন আহমদ, খয়রাত হোসেন প্রমূখ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে একই ধরনের বক্তব্য দান করেছিলেন। কিন্তু সেদিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে জনাব অলি আহাদ বলেছিলেন, আমি বদরুদ্দীন উমরের বই থেকে আবার উদ্ধৃত করছি, (পৃষ্ঠা ১৭৬) ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষ নিয়ে অলি আহাদ বলেন "১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের উপ নির্বাচনে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে জনাব শামসুল হককে সদস্য হিসেবে কর্তব্য পালনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তার সদস্য পদ চক্রান্ত করিয়া খারিজ করা হইয়াছে। এমনকি টাঙ্গাইল উপ নির্বাচনে পরাজিত হইবার পর মুসলিম লীগ সরকার অদ্যাবধি আর কোন উপ নির্বাচন দেন নাই। শুধু তাই নয়, বিনা অজুহাতে আমাদের পুনঃ পুনঃ ঘোষিত শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে বানচাল করিবার অসৎ উদ্দেশ্যে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করিয়াছে। অতএব ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া সরকারকে সমুচিত জবাব দিব"। জনাব অলি আহাদ আরো বলেন "যাহা হয় হইবে ইহাতে দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবকাশ নাই। এবার যদি সরকারের হঠকারী মনোভাব রুখিতে না পারি তবে ভবিষ্যতে সামান্যতম প্রতিবাদও করিতে পারিব না। গত বছর অর্থাৎ ১৯৫১ সালের মার্চ মাসেও সরকার ১৪৪ ধারা জারি করিয়া ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরী হলে যুব সম্মেলনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছিলেন। এই মুহূর্তে সম্মিলিত গণশক্তি যদি সরকারের অন্যায় অবিচার প্রতিরোধ করিতে ব্যর্থ হয় তবে আর কখনো প্রতিরোধ করিতে পারিব না। সুতরাং নাউ অর নেভার।"

জনাব অলি আহাদের এই বক্তব্যকে সেদিন সমর্থন করেছিলেন জনাব আবদুল মতিন। সেদিন জনাব তোয়াহা কোন জোরালো ভূমিকা পালন করতে পারেননি। কারণ কমিউনিষ্ট পার্টি ছিল তার মূল সংগঠন। যার শৃঙ্খলা তাঁকে মেনে চলতে হত। এ প্রশ্নে পরদিন ২০ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে দীর্ঘ বিতর্ক চলে এবং পরবর্তীকালে ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জন সদস্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে মত প্রকাশ করে। মাত্র ৪ জন সদস্য যার শীর্ষস্থানে ছিলেন জনাব অলি আহাদ ও জনাব আবদুল মতিন। তাঁরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে দৃঢ় মতপ্রকাশ করেন। এ ভোটাভুটির পর আমি আবারও উদ্ধৃত করছি "বদরুদ্দিন উমরের পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি।" (পৃষ্ঠা ১৭৯) থেকে, এই ভোটাভুটির পর অলি আহাদ বৈঠকস্থলে সভাপতিকে শুনিয়ে বলতে থাকেন যে "সর্বদলীয় কমিটির সিদ্ধান্ত যাই হোক আগামী কাল সকালে বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ

www.pathagar.com

করা হবে।" তার এই ধরনের উক্তির পর সভার সভাপতি জনাব আবুল হাশিম বলেন যে, সে অবস্থায় সর্বদলীয় কমিটির আর কোন প্রয়োজন হবে না। কাজেই ১৪৪ ধারা এভাবে ভঙ্গ হলে সেই সঙ্গে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। এ কথার পর আবুল হাশিমের বক্তব্যটিও প্রস্তাব আকারে গৃহীত হয়। সুতরাং ইতিহাসের এই অধ্যায়টি যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে একথা স্বীকার করতেই হবে, ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী রাতে সেদিন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে অলি আহাদ এবং তার সাথীদের ভূমিকাই পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছাত্রসভা এবং সমাবেশ হয়েছিল, সেই ছাত্রসভা এবং সমাবেশে আবার আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সেদিন আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে নানা যুক্তি দিতে থাকেন। কিন্তু জনাব শামসুল হক এবং তাঁর মতানুসারী অন্যান্যদের এই ধরনের বক্তব্য সত্ত্বেও সেদিন জনাব গাজীউল হকের সভাপতিত্বে যে ঐতিহাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বলাবাহুল্য, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে অলি আহাদের ভূমিকা ছিল অসামান্য এবং আরেকজনের ভূমিকাও এখানে স্মরণীয়। তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহবায়ক জনাব আবদুল মতিন। তাহলে আমরা একথা স্পষ্টতই বলতে পারি, সেদিন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক আমতলায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে যদি সিদ্ধান্ত গৃহীত না হত তাহলে ভাষা আন্দোলন কোনদিন সাফল্যমন্ডিত হতে পারত না। এবং ভাষা আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনও বিকশিত হতে পারত না। সে জন্যই এই ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্য দেরিতে হলেও আজকে যারা জনাব অলি আহাদকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, আমি তাদেরকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। সাথে সাথে একথা বলি আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাসকেও বিকৃত করার অপপ্রয়াস চলছে। একটি বিশেষ দল তাদের নেতার পক্ষে কথা বলতে যেয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করে চলেছে। কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমি জানি, ইতিহাস নীরবে নিভৃতে সত্যের জয়গান গেয়ে যায়। প্রতি ৫০ বছর পর সত্যিকারভাবে ইতিহাস লিখিত হয়। সুতরাং আজকে যারা স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত করছেন, একদিন ইতিহাস তাদের আসল চরিত্রকে উদঘাটিত করে দেবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এ প্রসঙ্গে আমি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। ১৯৫৬ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কাগমারী সম্মেলন হিসেবেই ইতিহাসে এটা খ্যাতি অর্জন করেছে। সেই কাগমারী সম্মেলনে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সেদিন অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে তাঁর একটি ঐতিহাসিক উক্তি উচ্চারণ করেছিলেন। তা হচ্ছে যে, "পূর্ব বাংলাকে যেভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের এককেন্দ্রিক বিজাতীয় শাসকগোষ্ঠী শোষণ করে চলেছে, যেভাবে পূর্ব বাংলার জনগণ অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকারে পরিণত হচ্ছে, তাতে এমন দিন আসতে পারে যেদিন পূর্ব বাংলার মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলতে বাধ্য হবে"। ইতিহাসে একথা লিপিবদ্ধ আছে, মওলানা ভাসানীর এই বক্তব্যের স্বপক্ষে যিনি সেদিন অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন জনাব অলি আহাদ। ইতিহাসে একথা লেখা আছে, মওলানা ভাসানীর এই উক্তির পর জনাব সোহরাওয়ার্দী, জনাব

www.pathagar.com

শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব সেদিন তাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগের মাধ্যমে মওলানা ভাসানীর ফাঁসি দাবী করেছিলেন। আমার আজও স্মরণ আছে, সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের তৎকালীন সহ-সভাপতি আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এটিএম শামসুল হক। সেই সভাতেই মওলানা ভাসানীর ফাঁসি দাবী করা হয়েছিল এবং ফাঁসির দাবীতে গণস্বাক্ষর অভিযান শুরু করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে জনাব অলি আহাদের প্রাসঙ্গিক কথাটাই আমি বলতে চাই। ঠিক সেই একই কাগমারী সম্মেলনে জনাব অলি আহাদকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল। এর কারণ ছিল জনাব অলি আহাদ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মওলানা ভাসানীর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী, সামরিক চুক্তি বিরোধী তাঁর যে ভূমিকা, তাঁর সে ভুমিকার প্রতি বলিষ্ঠ সমর্থন দিয়েছিলেন। আর সাথে সাথে তিনি সেদিন একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। এ পুস্তিকাটির নাম ছিল 'পূর্ব বাংলা শ্মশান কেন'? আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব অলি আহাদ ছিলেন শেখ মুজিবুরের প্রতিদ্বন্দ্বী। শেখ মুজিবের পরিবর্তে জনাব অলি আহাদ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হবেন, একথা সবাই মনে করতেন। কারণ জনাব শেখ মুজিবুর রহমান সে সময় একই সাথে প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। কিন্তু জনাব অলি আহাদ 'পূর্ব বাংলা শ্মশান কেন'? এই বইটি ছাপানোর অভিযোগে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং অলি আহাদকে বহিষ্কার করার প্রস্তাব উথাপন করেন। শেষ পর্যন্ত জনাব অলি আহাদকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে ৮জন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদত্যাগ করেছিলেন। জনাব অলি আহাদকে বহিষ্কার করা হয়। এই বহিষ্কার করার মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগে ভাঙ্গনের সূচনা এবং এরই ক্রমধারায় মওলানা ভাসানী সেদিন পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান উভয় প্রদেশের যারা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধিকারে বিশ্বাসী, তাদেরকে নিয়ে একটি গণতান্ত্রিক কনভেনশন আহবান করেছিলেন। আমার মনে আছে, এই গণতান্ত্রিক কনভেনশন উপলক্ষে পল্টন ময়দানে সে ঐতিহাসিক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এই জনসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সীমান্ত গান্ধী বলে পরিচিত খান আবদুল গাফফার খান, পাঞ্জাব শার্দুল মিয়া ইফতেখার উদ্দিন, জিয়ে সিন্ধ আন্দোলনের নেতা জি এম সৈয়দ, আবদুল মজিদ সিন্ধী, বেলুচিস্তানের আবদুল সামাদ খান, খায়ের বখশ মারী, গাউস বখ্স বেজেনজো, মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরী, মাহমুদুল হক ওসমানী প্রমুখ নেতা। পল্টন ময়দানে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেদিন সে জনসভায় আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদী কায়দায় হামলা চালিয়েছিল। ইতিহাসের রেকর্ডকে নির্ভূল করে রাখার জন্য আমাকে একথা বলতেই হবে। সেই হামলার নেপথ্য হোতা ছিলেন জনাব শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং। সেদিন সে গণতান্ত্রিক কনভেনশনের উদ্যোগে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই জনসভায় যখন দেড়শ থেকে দুইশ লাঠিধারী এবং মারাত্মক অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছিল তখন সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত হয়েছিলেন জনাব অলি আহাদ। মিয়া ইফতেখার উদ্দিনও সেদিন আহত হয়েছিলেন। কিন্তু অলি আহাদকে আমি দেখেছি যে, তার পিঠের ওপর দিয়ে একের পর এক লাঠির আঘাত চলছে কিন্তু অলি আহাদ নির্ভিকভাবে তখনও ছিড়ে যাওয়া মাইকের তার সংযোগ দিচ্ছিলেন এবং জনসভাকে চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই নির্ভীক অলি আহাদ সেদিন বাংলাদেশের স্বাধিকার অর্জনে আঞ্চলিক

www.pathagar.com

স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের সূচনা করেন যা পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল- সে প্রশ্নেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন।

দ্বিতীয় যে ভূমিকাটির জন্য অলি আহাদ ইতিহাসে তার স্থান করে নিয়েছেন, সেটি হচ্ছে ১৯৭১ সালের সেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনগুলোতে তিনি মওলানা ভাসানীর সাথে মিলে সেদিন 'আজাদ পূর্ব পাকিস্তানের' দাবী উত্থাপন করেছিলেন। জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের কোন প্রকার সুস্পষ্ট ঘোষণার পূর্বেই ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানী এবং অলি আহাদ সম্মিলিতভাবে স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করেছিলেন। জনাব অলি আহাদ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেদিন তাঁকে হুলিয়ার বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। তবু সে অবস্থায় থেকেও তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। এরপর বাংলাদেশ স্বাধীন হল। স্বাধীন হওয়ার পর এখানে আমি জনাব অলি আহাদের ঐতিহাসিক দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে চাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা প্রত্যক্ষ করলাম যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের অস্ত্রশস্ত্র, গোলা বারুদসহ বিভিন্ন সম্পদ লুণ্ঠন করে চলছে। আমরা আরো লক্ষ্য করলাম, বাংলাদেশকে ভারতের অর্থনৈতিক কলোনি করার জন্য একটা সুস্পষ্ট অপপ্রয়াস চলছে। শুধু তাই নয়, তৎকালীন আওয়ামী তাঁবেদার সরকার ভারতের সাথে তথাকথিত ২৫ বছরের গোলামী চুক্তি এবং ৭ দফা গোপন চুক্তি করেছিল। ফ্যাসিবাদ তার বিষাক্ত থাবা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেদিন রক্ষী বাহিনী, নীল বাহিনী, লাল বাহিনী এবং অন্যান্য সন্ত্রাসী বাহিনী নির্বিচারে দেশপ্রেমিক এবং প্রগতিশীল লোকদের হত্যা করেছিল। আনুমানিক প্রায় ৩০ হাজার দেশপ্রেমিক বীর সন্তানকে সেদিন আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী সরকার তাদের প্রত্যক্ষ মদদপুষ্ট বিভিন্ন বাহিনী দ্বারা হত্যা করেছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে গর্জে উঠেছিলেন জনাব অলি আহাদ। সেই সময় তিনি তার পত্রিকা 'ইত্তেহাদ' প্রকাশ করেছিলেন। সেদিন তিনি আওয়াজ তুলেছিলেন 'আজাদ বাংলা'র। সেদিন যে কথা তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন তা হচ্ছে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের শাসন এবং শোষণমুক্ত স্বদেশীকায় উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথা। সেদিন তিনি নির্বিচার ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠকে সোচ্চার করেছিলেন। নির্ভয়ে তিনি তার পত্রিকায় বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন এবং সাথে সাথে তিনি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধেও সেদিন বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। জনাব অলি আহাদের সাথে অনেকের মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোতে তাঁর যে ভূমিকা তা ইতিহাসে দেদীপ্যমান থাকবে। সেদিনও তিনি মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহযাত্রী হিসেবে সেই ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের নেতৃত্বে সমাসীন ছিলেন এবং এ কারণে জনাব অলি আহাদের সাথে শেখ মুজিবের একদিন যে অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল তার পরও শেখ মুজিব তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। ইতিহাসে একথা লিপিবদ্ধ আছে, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট যেদিন ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন হল, যেদিন বাকশালী একনায়কত্বের অবসান ঘটলো। দুঃশাসনের তিমিরাবরণ ভেদ করে সেদিন নবীন সূর্যের উদয় ঘটলো, সেদিন কারাগার থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন জনতার নেতা অলি আহাদ। আমি আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করতে চাই। জনাব অলি আহাদ তার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আজকের দিনে তার স্বভাব সুলভ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। যখন বাংলাদেশের এক দশমাংশ অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আর খনিজ

www.pathagar.com

সম্পদে ভরপুর পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের হাতছাড়া হতে চলছে, যখন শান্তিচুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের হাতে বর্তমান শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামকে তুলে দিতে চলেছে, যখন বাংলাদেশকে ভারতীয় পণ্যের বাজারে পরিণত করা হয়েছে, যখন বাংলাদেশের শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যখন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক মহাসংকটের সম্মুখীন, যখন ফ্যাসিবাদ আবার তার বিষাক্ত নখর নিয়ে, বিষাক্ত থাবা নিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ শুরু করেছে, যখন বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বিরোধী দলের ওপর সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করার নতুন নীলনক্শা আঁকা হয়েছে, যখন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি যশোরে উদীচীর সাংস্কৃতিক সম্মেলনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার সাথে সাথে বলেছিলেন, এ ধরণের বিস্ফোরক দ্রব্য শুধু মাত্র সেনাবাহিনীর হাতেই থাকতে পারে। আমরা মনে করি, আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী কখনোই এ ধরণের বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে না। তাহলে একটি পার্শ্ববর্তী দেশের সামরিক বাহিনীর সহায়তায় বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এই ধরণের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্ম দিয়েছে। যার মাধ্যমে চলমান আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা যায় এবং তারা বিরোধী দলের ওপর আক্রমণ শুরু করতে পারে। মৌলবাদী বলে এখন যেসব ইসলামপন্থী দল আছে তাদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়েছে। কিন্তু আসল নীলনক্শা হচ্ছে সামগ্রিকভাবে বিরোধী দলীয় আন্দোলনকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দেয়ার। জাতীয় জীবনের এই তমসাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতেও জনাব অলি আহাদ জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে চলেছেন। ৭ দল তথা আজকে যে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার পেছনে তার অবদানকে আমরা সবাই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে যে ঐতিহাসিক লংমার্চ হয়েছে, এ লংমার্চ শুরু করার পেছনে তাঁর যে ভূমিকা তা আমাদের সব সময় স্বীকার করতে হবে। বস্তুত আজকে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা, নির্বাচনী ঐক্য এবং একটি দেশপ্রেমিক জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা সকল জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামী শক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পেছনে তিনি আন্দোলনের মস্তিস্কের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। তিনি সব সময় তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞান দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করছেন এবং তিনি যথার্থই একজন প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিকের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। আমি তার দীর্ঘ জীবন কামনা করছি এবং পরম করুণাময় আল্লাহতা আ'লার কাছে প্রার্থনা করছি, আল্লাহ আমার পরমায়ু নিয়ে হলেও যেন জনাব অলি আহাদকে দীর্ঘজীবন দান করেন এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের বর্তমান আন্দোলনকে মঞ্জিলে মকসুদে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ইতিহাস নির্ধারিত ভূমিকা পালন করেন। এ প্রসঙ্গে আমি একটি কথা বলতে চাই। যারা অলি আহাদের এই সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছেন, তারা অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। আমাদের জাতিও একটি বিস্মৃতিপ্রবণ জাতি হিসেবে পৃথিবীর কাছে পরিচিত। আমরা সাধারণত আমাদের দেশের যারা বীর সন্তান তাদেরকে তাদের জীবিত অবস্থায় সম্মান করতে জানি না কিন্তু জনাব অলি আহাদ তার জীবদ্দশাতেই আজকে যে সম্মান পেয়েছেন সেজন্য জনাব অলি আহাদ জাতীয় সংবর্ধনা কমিটিকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, আজকের এই সভায় বিরোধী দলের সম্মানীয় নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ সমাবেশের প্রধান অতিথি হয়ে তিনি শুধু জনাব অলি আহাদের প্রতি সংবর্ধনা জানাননি, তাকেই শুধু সম্মানিত করেননি তিনি সমস্ত রাজনীতিবিদদেরও সম্মানিত করেছেন। সে জন্য আমি তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

খোদা হাফেজ॥ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

www.pathagar.com

ঐক্যবদ্ধ সর্বদলীয় ফ্রন্ট গঠন করতে হবে এটাই সময়ের দাবী

-অলি আহাদ

[১২ মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত জাতীয় নেতৃবৃন্দের সংবর্ধনা সভায় জনাব অলি আহাদের ভাষণ]

মাননীয় সভাপতি, জননন্দিত দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সমবেত সুধীবৃন্দ ও উদ্যোক্তাবৃন্দ-

আস্‌সালামু আলাইকুম।

আজ আপনারা আমার প্রতি যে ভালবাসা ও সম্মান দেখিয়েছেন, তার প্রতিদান দেয়ার সাধ্য আমার নেই। আবেগ আপ্লুত আমি আজ। আপনাদের এই প্রীতির প্রতিদান আমার হৃদয়ের মনিকোঠায় অক্ষয় হয়ে থাকবে চিরকাল। আমার প্রতি আপনাদের এই প্রাণঢালা ভালবাসা প্রমাণ করে, এ জাতির হৃদয়ের ঐশ্বর্য আজও নিঃশেষিত হয়ে যায়নি।

আজ এখানে দাঁড়িয়ে যতবারই পেছনে ফিরে তাকাই, ততই বিগত দিনের অজস্র স্মৃতি আমার মানসপটে ভেসে উঠছে। কিশোর বয়সে, পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ স্বজাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার পিপাসা বুকে নিয়ে '৪০ দশকে যখন রাজনীতির দুর্গম পথের অভিযাত্রায় নিজেকে সমর্পণ করেছিলাম, তখন সমগ্র বিশ্ব ছিল যুদ্ধ ক্লান্ত। এ উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সূর্য অস্তায়মান।

দল ও মতের পার্থক্য সত্ত্বেও আজ আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রূপকার শহীদ তিতুমীর, ফকির মজনু শাহ, হাজী শরীয়তুল্লাহ, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন ফরওয়ার্ড ব্লক, নিখিল ভারত কমিউনিষ্ট পার্টি, অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনের আত্মত্যাগকারী নির্যাতন বরণকারী অগনিত নেতাকর্মী, কথা ও কবিতায় স্বাধীনতার প্রথম উচ্চারণকারী বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, রাজনৈতিক মঞ্চে ভারতের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক মওলানা হাসরত মোহানীকে। তাঁরাই আমাদের পথপ্রদর্শক। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমাদের ভাষা সংগ্রাম, স্বাধীকার, স্বাধীনতা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে নির্যাতন বরণকারী শহীদান, নেতা ও কর্মীদের। আপনারা আমার অনুভূতি জানতে চেয়েছেন। প্রায় অর্ধশতাব্দীর আমার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অবিমিশ্র নয়। কখনও আনন্দ, কখনও বিষাদ, কখনো বা ক্ষোভের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে সময়। স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে পদে পদে। দেখেছি ব্যক্তিস্বার্থের হীন যুপকাষ্ঠে জাতীয় স্বার্থ বর্জনের নোংরা খেলা। কপটতা ও ওয়াদা ভঙ্গের এই হীনমন্যতার মধ্যেও আবার দেখেছি অদম্য অনির্বাণ জীবনের দিকে অকুতোভয়ে এগিয়ে গেছে দেশপ্রেমিক জনতা। তারা কিছুতেই পরাভব মানেনি

www.pathagar.com

কোথাও। '৪০ দশকে পশ্চাদপদ মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র আবাস ভূমি পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু। সেদিন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সবদিক দিয়েই মুসলমানরা ছিল পশ্চাদপদ। তাই আমরা সবাই পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতারা ওয়াদা করেছিলেন পাকিস্তানে খোলাফায়ে রাশেদীনের রাষ্ট্রীয় ও সমাজব্যবস্থা কায়েম হবে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিপন্ন বিস্ময়ে দেখতে পেলাম দূর্নীতি ও ঢাকা ক্লাব কেন্দ্রিক কালচার। সে আশাভঙ্গের বেদনা বোঝাতে পারব না।

অনেক মহান পুরুষের একান্ত সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বাংলার স্বাধীনতার অকুতোভয় সেনাপতি, সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও জুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চারকণ্ঠ মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও রেনেসার মর্মবাণীতে অবগাহিত দার্শনিক রাজনীতিবিদ '৪০ এর দশকে নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমের নাম শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি। এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য আমার কিশোর মনে অগ্রসর ও সংগ্রামী চিন্তা চেতনার বীজ বপন করে।

১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলাম। নেতাজী সুভাষ বসুর অগ্রজ শরৎ বসু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিম ছিলেন এ আন্দোলনের রূপকার। দুর্ভাগ্য গান্ধী-নেহেরু নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের পক্ষে অর্থাৎ স্বাধীন সার্বভৌম, অখন্ড বঙ্গীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। হিন্দু মহাসভা সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ১৯৪৭ সালের ৫ই এপ্রিল তারকেশ্বর হিন্দু মহাসভা সম্মেলনে বঙ্গভঙ্গ করে হিন্দুবঙ্গ -মুসলিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠার দাবী তোলেন। গান্ধী ও নেহরু অখন্ড বঙ্গদেশকে খন্ড করার দাবী সমর্থন করে ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করলেন। পক্ষান্তরে, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে আশীর্বাদ জানান। পরিকল্পনা ছিল স্বাধীন বঙ্গদেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন মুসলমান। ১৯৪৭ আগষ্টে ভারত বিভক্ত হল প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব মোতাবেক একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্থলে একটি রাষ্ট্র (পাকিস্তান) প্রতিষ্ঠার কারণে আমরা বাঙ্গালীরা ক্ষুব্ধ হই। ১৯৪৭ সালে ভাষা আন্দোলনের গোড়াপত্তনের উদ্যোক্তা অধ্যাপক আবুল কাসেম ও অন্যান্যদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে আবুল হাশিম-সোহরাওয়ার্দী নেতৃত্বাধীন বিপুল সংখ্যক যুব ছাত্র মুসলিম লীগ নেতাকর্মী ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'৪৭ থেকে '৫৪ পর্যন্ত একটানা আন্দোলন করলাম। ক্ষমতাসীন হলো যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার। ওয়াদা ভঙ্গের মহড়া, দূর্নীতিরাহুগ্রস্থ নেতৃত্ব ও সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যবাদের পদলেহন ছিল এ সরকারগুলোর বৈশিষ্ট্য। করাচী-পিন্ডি কেন্দ্রিক সমরনেতা সিপাহী-হায়েনাদের বিরুদ্ধে সংকটময় মুহূর্তে মেজর জিয়া স্বাধীনতার ডাক দেন- মুক্তিযুদ্ধ হল স্বাধীন সার্বভৌম সকল প্রকার আধিপত্যবাদ মুক্ত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য। মুক্তিযুদ্ধের পর গণতান্ত্রিক সংবিধানও রচিত হল। বিমল আনন্দে বুক ভরে গেল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এ কথা পরিস্কার হয়ে গেল যে, ভারত মিত্রের ছদ্মবেশে আমাদের ভেতরে ঢুকে পড়েছে বটে, তার আসল অভিলাষ হলো পিন্ডির স্থানে নিজেকে অধিষ্ঠিত করা। সেজন্য তার চাই একটি বিকলাঙ্গ, নতজানু, তাঁবেদার বাংলাদেশ। এ লক্ষ্যেই শুরু হল হিন্দুস্তানী ফৌজীদের দেদার লুট ও ভারতে সম্পদ পাচার। দেশের অভ্যন্তরীন অর্থনীতিতে ধস নামল।

www.pathagar.com

সেই সঙ্গে স্বাক্ষরিত হল দিল্লীর সাথে ২৫ সালা দাসত্ব চুক্তি, সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি ও গঙ্গার পানি ভারতের কাছে তুলে দেয়ার চুক্তি। ১৯৭৩ সালে সেই দুর্যোগময় মুহূর্তে আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদকে প্রতিহত করার জন্য "আজাদ বাংলা" কায়েম কর, দিল্লীর দাসত্ব মানি না মানবো না, শপথ নিয়ে আন্দোলনের ডাক দিলাম। প্রতিবাদ জানালাম। ফল হল কারাবরণ। ১৯৭৫ সালে জেলে বসেই শুনলাম মুক্তিযুদ্ধের মর্মবাণী সংবিধানের প্রধানতম স্তম্ভ 'গণতন্ত্র' মুচড়ে ফেলে একদলীয় শাসন কায়েম হয়েছে। শ্লোগান উঠেছে, 'এক নেতা একদেশ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ'। অর্থাৎ এক ব্যক্তির শাসন। জেলে বসে ক্ষোভে বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আবার জেলে বসেই শুনলাম ১৫ই আগষ্টের পটপরিবর্তন। আশা ভঙ্গের বেদনা ভুলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু না, আবারও সামরিক শাসন। রাজনীতির অর্থ আজ কালো টাকার বশ্যতা। হুন্ডা-গুন্ডা-ডান্ডা আর কালো টাকার দৌরাত্মেই চলে নির্বাচনের মহড়া বা প্রহসন। এ রকম প্রহসনের মধ্য দিয়ে ৯৬ নির্বাচনে দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে দিল্লীর সেবাদাসরা। এই সেবাদাসদের একমাত্র কাজ হলো, সামগ্রিক ভাবে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে, বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রহিত একটি শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করা। সকল অগ্রগতি ও উন্নয়নের চাকাকে স্তব্ধ করে জাতিকে পরামুখাপেক্ষী হতে বাধ্য করা। মহান মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক লক্ষ্যগুলোকে ভুলুণ্ঠিত করে, ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে জাতির উদয়াচলকে মলিন করা। আমাদের স্বতন্ত্র ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে বিনাশ করে দেশকে আরেকটি সিকিমে পরিণত করা। এ জন্যই আমরা যারা দেশকে ভালোবাসি, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা রক্ষার জন্য, তাদের একমাত্র কাজ হলো বিভেদ ও বিভ্রান্তিকে পাত্তা না দিয়ে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা। মনে রাখতে হবে, দিল্লীর দাসত্ব-নিগড় থেকে মুক্ত করার সংকল্পে সংগ্রামী ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। যুগপৎ আন্দোলনের নামে দ্বীপে দ্বীপে আন্দোলন করার বিচ্ছিন্ন মনোভাবকে পরিহার করে সমগ্র বিরোধী দলগুলিকে আন্দোলনের সাফল্যের স্বার্থে এক মঞ্চে আসতে হবে। মঞ্চের নাম হতে পারে 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট'। নিম্নলিখিত কর্মসূচী হতে পারে ঐক্যের ভিত্তি-

(১) পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাতিল (২) ৩০ সালা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাতিল করে ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে গঙ্গা পানি বন্টন অর্থাৎ ঢাকা-দিল্লী-কাঠমন্ডু পানি চুক্তি (৩) ভু-পৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবহার কল্পে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বাঁধ নির্মান (৪) নদীর তলদেশ খনন (৫) তেল, গ্যাস, কয়লা সহ খনিজ সম্পদ আহরণে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ গ্রহণ (৬) দেশকে বৈধ ও অবৈধ পন্থায় ভারতীয় পণ্য বাজারে পরিণত করার হীন প্রচেষ্টা রোধ (৭) জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে সর্বশক্তি নিয়োগ (৮) সার্ককে জোরদার করার এবং ভারতের সাতটি রাজ্যসহ উপ-আঞ্চলিক জোট তৈরির প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করা (৯) দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ (১০) আইন শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাস দমন, কঠোরভাবে নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ এবং (১১) কোন সরকারী কর্মচারী পদচ্যুত, পদত্যাগ বা স্বাভাবিক ভাবে অবসর গ্রহণের পর থেকে পরবর্তী দশ বৎসর পর্যন্ত কোন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

ইতিহাসের যুগ সন্ধিক্ষণে আজ দাঁড়িয়ে আছি আমরা। জাতীয় অর্থনীতি উন্নত দেশগুলির তুলনায় কয়েক শতাব্দী পেছনে। মুক্তবাজার অর্থনীতির বদৌলতে ঢালাও ভাবে অবাধে বিদেশী পণ্য আমদানীর কারণে দেশীয় কলকারখানা ধ্বংসোন্মুখ, দেশীয় পুঁজি বিনিয়োগ দ্বিধান্বিত। উপর তলার গুটি কয়েক পুঁজিপতি কোটারী দুর্নীতিবাজ আমলাদের যোগসাজসে জাতীয়

www.pathagar.com

অর্থনীতির বিকাশ রোধে সংকল্পবদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ রাষ্ট্র পর্যায়ে ১৯৭২-৯৮ (২৭ বৎসরে) ভারত- বাংলাদেশ মেয়াদ বৈদেশিক বাণিজ্য ভারত বাংলাদেশী মুদ্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকার অধিক রপ্তানি করেছে আর সীমান্ত পাচারেও সমপরিমাণে বেশী রপ্তানি করেছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ ভারতীয় পণ্যের একচেটিয়া সংরক্ষিত বাজার। সেবাদাসীর সরকার ক্ষমতায়। এমনি ঐতিহাসিক সংকট কালে শ্রদ্ধেয়া দেশনেত্রী আপনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের মধ্যমনি। এখন একমাত্র ভরসা খালেদা জিয়া। আমি দেখি আপনিই একমাত্র ভরসা। এব্যাপারে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। আপনাকেই উদ্যোগ নিয়ে ১২ই জুন, ১৯৯৬ নির্বাচনের ৬৩% ভোটারের আকাঙ্খা পূরণ করতে আগত সংগ্রামের লক্ষ্যে এক মঞ্চে সবাইকে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ সর্বদলীয় ঐক্য ফ্রন্ট গঠন করতে হবে, এটাই সময়ের দাবী।

আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না। আমার জীবন সূর্য আজ পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। কিন্তু আমি জানি জীবন কখনও থেমে থাকে না এবং সম্ভাবনারও কোন শেষ নেই। ৮০ বছর বয়সে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মহাপ্রলয়ের পর মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের এক নবীন সূর্যোদয় হবে।' আমার জীবনে সে সূর্যোদয় আমি দেখে যেতে পারব কিনা জানিনা। কিন্তু এদেশের তরুণ সমাজের কাছে আমি আবেদন জানাব সত্য প্রতিষ্ঠায় আপনারা ব্রতী হউন। হীরন্ময় আশাবাদ নিয়ে আপনারা সত্য ও সুন্দরের অভিযাত্রায় অকুতোভয়ে এগিয়ে চলুন। দেশের আজাদীর ঝান্ডাকে উড্ডীন রাখুন। কেবল মন্ত্রীত্বের জন্য রাজনীতি করবেন না, নব ইতিহাস সৃষ্টির দুনির্বার প্রেরণায় এগিয়ে চলুন। পবিত্র হোক আপনাদের অভিযাত্রা। সুন্দর ও দীপ্ত হোক আপনাদের আত্মপ্রকাশ।

আজকের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করবো না। আমার কাছে হয়ত আপনাদের প্রত্যাশা অনেক কিন্তু সাধ্য আমার সীমিত। তবুও দৃঢ়তার সাথে বলব, আমার যা দেবার তা দিতে আমি দ্বিধা করব না। কোন দিন দ্বিধা করিনি। জীবনে কি পেয়েছি কি পাইনি এ হিসাব আমি কোন দিন করিনি। যা কিছু সত্য, সুন্দর ও ন্যায় বলে জেনেছি, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারই জন্য করেছি সর্বস্বপণ। সেজন্য আজ যখন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে তাকাই তখন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারি। না, মালিন্য কোথাও নেই। গ্লানিকর কিছু কোথাও নেই। সেজন্য আশা হয়, যখন পরম সত্তার মাঝে বিলীন হয়ে যাবে আমার অস্তিত্ব, তখন নিশ্চয়ই এই প্রসন্নতার ছটাটুকু লেগে থাকবে আমার অবয়বে। যদি তা থাকে তাতেই আমি ধন্য।

পরিশেষে বলি, বাংলাদেশ চিরকালের সংগ্রামের দেশ। বাংলাদেশকে জন্ম দিতে হয়েছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। বাঁচতেও হবে সংগ্রাম করে। সেই সংগ্রামের তরবারীতে যেন কখনও মরিচা না ধরে। আর কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিলেন-

"সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের
দেশের তরে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের"

আপনাদের ধন্যবাদ
খোদা হাফেজ।

www.pathagar.com

অগ্রজতুল্য অলি আহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

এমাজ উদ্দীন আহমদ

দেশের অন্যতম বরেণ্য জননেতা অলি আহাদকে আমি চিনি আমার ছাত্রাবস্থা থেকেই। আজও মনে আছে, ১৯৫২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই এবং ঐ দিনই ফজলুল হক মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে হলে আসি। ফজলুল হক মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হই দুটি কারণে। এক, হলটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের খুব কাছাকাছি। কাছাকাছি বলছি এজন্যে যে, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন ছিল আজকের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালের পূর্বাংশ। দুই, ফজলুল হক মুসলিম হল তখন ছিল প্রগতিবাদী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। এমনিতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর চিহ্নিত হয়েছে জনস্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ছাত্র আন্দোলনের সূতিকাগার এবং ফজলুল হক মুসলিম হল ছিল তারই হৃদয়স্বরূপ। বলতে কোনো দ্বিধা নেই, ফজলুল হক মুসলিম হলের সাবেক ছাত্র হিসেবে আজও আমি গর্ব অনুভব করি।

হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে জানার সুযোগ হয়েছিল এই হলের সাবেক ছাত্র নেতাদের সম্পর্কে। জেনেছিলাম তখন ফজলুল হক মুসলিম হলের নেতৃস্থানীয় ছাত্র অলি আহাদ সম্পর্কে। তখন তাঁকে যে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছি আজও তা অব্যাহত রয়েছে। আজও তিনি আমার অগ্রজতুল্য, শ্রদ্ধেয়, পরম আকর্ষনীয় এক জাতীয় নেতা। তাঁর লেখা 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫ 'গ্রন্থটি রিভিউ করেছিলাম ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি। বাংলাদেশে রাজনীতি সম্পর্কে, এর গতি প্রকৃতি, রাজনীতির প্রধান লবকুশলীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, হাজারো ঘটনাক্রমের বিন্যাস সম্পর্কে, বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনীতির মর্মবাণী সম্পর্কে তাঁর যে অর্ন্তদৃষ্টি তা আমাকে অভিভূত করে। বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর এই গ্রন্থটিই সর্বাধিক প্রামাণ্য, সর্বাধিক বস্তুনিষ্ঠ। হাজারো টানাপোড়েনে ক্লিষ্ট বাংলাদেশে রাজনীতি ক্ষেত্রে এমন সব বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং সত্যের পথ এমনভাবে কন্টকিত হয়েছে যে, সঠিক পটভূমিকা ব্যতীত তার যথার্থ অনুধাবন সম্ভব নয়। রাজনীতিক অলি আহাদ এই পটভূমিকা উপস্থাপন করে বাংলাদেশ রাজনীতির বিশ্লেষক ও গবেষকদের জন্যে তৈরি করেছেন উর্বরতম ক্ষেত্র।

রাজনীতি ক্ষেত্রে যে পথটি অত্যন্ত সহজ এবং পরিচিত অর্থাৎ অর্থ বিত্তের আকর্ষণে পথ চলা, ক্ষমতার করিডোরে পা রেখে দায়িত্বহীনভাবে ছুটে চলা, পদ ও পদবির আকর্ষণে চার দিককে টালমাটাল করা, সে পথ তাঁর ছিল না। ছিল না মন্ত্রীত্ব লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। আমার মনে হয়েছে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠে এসেছিল তাতে তিনি ভাগ না বসিয়ে স্বেচ্ছায় গলধকরণ করেছেন গরলকেই এবং সেই গরল পান করেই তিনি হয়েছেন নীলকণ্ঠ। হয়ে রয়েছেন কালের সাক্ষী। তাঁর এই ভূমিকাই তাঁকে রাজনৈতিক মহলে করেছে সর্বজন শ্রদ্ধেয়, করেছে কালজয়ী ত্যাগী প্রাজ্ঞ রাজনীতিক।

www.pathagar.com

তিনি প্রতিনিয়ত অনুধাবন করেছেন, রাজনৈতিক ক্ষমতা হলো কল্যাণমুখী কর্তৃত্ব, প্রভাব বা বৈভব অর্জনের নয়, ক্ষমতার বলয় বৃদ্ধির মাধ্যমও নয়। ছাত্রাবস্থায় তিনি অনুভব করেছিলেন, অনগ্রসর এই জনপদের জনসমষ্টির জীবনমান উন্নয়নই মুখ্য বিষয় এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যেই তিনি ছাত্র রাজনীতিকে বেছে নিয়েছিলেন। বলতে কোনো দ্বিধা নেই, চল্লিশের দশকের সমাপ্তি পর্বে এবং পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে এদেশে ছাত্র রাজনীতির যে গৌরবজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি হয় তার মূল ছিল অলি আহাদের মতো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, প্রাজ্ঞ, একনিষ্ঠ, সৃজনশীল ছাত্রনেতার অবদান। বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির গৌরবময় ঐতিহ্যের সৃষ্টিকর্তাদের অন্যতম হলেন অলি আহাদ। বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ এবং ভাষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা চিরস্মরণীয়। তাঁকে শুধু ভাষা সৈনিক বলা ঠিক নয়, এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল সেনাপতির।

বাংলাদেশের রাজনীতি এক খরস্রোতা স্রোতস্বিনীর মতো। হাজারো দিকে বাঁক নেয়া, অসংখ্য স্রোতধারায় সমৃদ্ধ এবং জাতীয় স্বার্থের নিরিখে সূচিত আষাঢ়-শ্রাবনে দুকূল ছাপিয়ে ওঠা বৈশিষ্ট্যময় গতিময়তায় এদেশের অনেক সুসন্তান এই প্রবাহে অবদান রেখেছেন। তাদের কেউ হয়েছেন কালোত্তীর্ণ, কালজয়ী। কেউ কেউ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন। অলি আহাদ কিন্তু আজো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। স্বল্প-উচ্চতা সম্পন্ন এই জনারণ্যে বিরাট মহীরুহের মতো। কেউ কেউ তর্জনী নির্দেশ করে তার অবমূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু জনস্বার্থের সার্থক অভিভাবক রূপে, জাতীয় স্বার্থের ধারক রূপে, কল্যাণকর রাজনৈতিক লক্ষ্যের প্রবক্তা রূপে, বিশেষে করে সুরুচিসম্পন্ন, পরিশীলিত এবং সৃজনশীল কর্মপ্রবাহের সনাতন সমর্থক রূপে আজো তিনি রয়েছেন এই জনারণ্যে প্রবল প্রকান্ড অশ্বত্থের মতো মাথা উঁচু করে। তাঁর তুলনা শুধু তিনি নিজেই। জাতীয় সংকটকালে এসব ব্যক্তিত্বের বাণী সাবধান বাণীর মতোই, অনেকটা বিবেকের বাণী তুল্য।

বাংলাদেশের রাজনীতি এখন গ্রহণের মুখে, সংশয়ে ও দ্বিধায় আচ্ছন্ন। যুক্তির জোর এখন জোরের যুক্তির নিকট অবনতমস্তক। কল্যানমূলক প্রত্যয় এখন ক্ষমতার রাজনীতির হাতে বন্দী। গণতন্ত্রের কথা সবাই জোরে শোরে উচ্চারণ করলেও সমাজ জীবনের সর্বস্তরে অগণতান্ত্রিকতা প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করছে। অধিকার সমুন্নত রাখার অঙ্গীকারে ক্ষমতাসীন হয়েও কোনো সরকার নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে সাফল্য লাভ করেনি। অধিকার দায়িত্ববোধের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়নি। সুশাসনের পাঠ এখনো আমাদের প্রশাসকদের সমাপ্ত হয়নি। স্বশাসনের দাবি এখনো আদর্শিক। এমনি দুঃসময়ে কোন দিকে তাকাবে সমাজ ? এহেন অন্ধকারে আলোর দিশা কে দেবেন ? আমার তো মনে হয় অলি আহাদের মতো ব্যক্তিরা এখনো এ সমাজে রয়েছেন। তাদের ন্যায়নিষ্ঠতা এখনো পথ দেখাতে সক্ষম। সুশাসন ও স্বশাসনের দাবি নিভৃতে ক্রন্দনরত হলেও অলি আহাদের মতো প্রাজ্ঞ রাজনীতিকদের আদর্শ এই দুঃসময়ে হতে পারে পথের ঠিকানা। তারাই হতে পারেন এই ঘন অন্ধকারে আলোর দিশারী। আজকে তাই তাঁকেই স্মরণ করছি। স্মরণ করছি গভীর শ্রদ্ধা ভরে।

[প্রফেসর এমাজ উদ্দীন আহমদঃ সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

www.pathagar.com

অলি আহাদ ও বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন

আনিসুজ্জামান

ঢাকার প্রিয়নাথ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে আমরা তিন বন্ধু-সৈয়দ আহমদ হোসেন, নেয়ামাল বাসির, আর আমি ১৯৫১ সালে জগন্নাথ কলেজে প্রথম বর্ষ আই এ ক্লাসে ভর্তি হই। আমাদের মধ্যে আহমদ ছিল সবচেয়ে রাজনীতিমনস্ক। নেয়ামাল ও আমার রাজনীতি করার কোনো বাসনা ছিল না, কিন্তু দেশের ভালোমন্দ নিয়ে ভাবনা ছিল মনে। আমাদের অগ্রজপ্রতিম বন্ধু খোন্দকার আনোয়ার হোসেন ছিলেন গোপন কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী। তিনি আমাদের ঠেললেন পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের দিকে।

এরই মধ্যেই শান্তিনগরের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি নিজস্ব ঠিকানা ঠাটারিবাজারে ৮৭ বামাচরণ চক্রবর্তী রোডে। অদূরে যোগীনগর লেন, তার ৪৩/১ নম্বর বাড়িতে যুবলীগের অফিস। এই দোতলা বাড়ির ওপর তলায় সহ-সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াহা সপরিবারে বাস করতেন। নিচের তলায় ছিল যুবলীগের অফিস। সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদও ওই বাড়িতেই থাকতেন-খুব সম্ভব তোয়াহা সাহেবের পরিবারভুক্ত হয়ে।

অলি আহাদের সম্পর্কে প্রথমে শুনেছিলাম আমার মামাতো ভাই সৈয়দ কামরুজ্জামানের কাছে। সেই ১৯৫১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এসসি পড়তেন সংখ্যাবিজ্ঞানে। তাঁর কাছে ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে অলি আহাদের সাহসী ভূমিকার কথা শুনি। অলি আহাদ যে জিন্নাহকে মুখের ওপর বলেছিলেন যে, আপনি পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হলেও আমাদের আবেদনক্রমে ইংল্যান্ডের রাজা ওই পদ থেকে আপনাকে সরিয়ে দিতে পারেন, তা শুনে রীতিমতো বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। আরো জানতে পারি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি কম (পাস) পরীক্ষা দিয়ে অলি আহাদ প্রথম স্থান অধিকার করেন, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক সংশ্রবের কারণে পূর্ববঙ্গ সরকারের ইঙ্গিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে এম কম ক্লাসে ভর্তি হতে দেন নি। ভালো ছাত্রের প্রতি সবারই শ্রদ্ধাবোধ থাকে; তার ওপরে, তাঁর প্রতি এই অবিচারের কথা জেনে মানুষটিকে আমি প্রথমাবধি খুব সম্মানের চোখে দেখতে শুরু করি।

আমরা তিন বন্ধুই যুবলীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলাম শিথিলভাবে। অফিসটা আমার বাড়ির কাছে হওয়ায় আমি সেখানে বেশি যেতে এবং বেশিক্ষণ থাকতে পারতাম। আমার পূর্ব পরিচিতদের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র কে জি মুস্তাফা ছিলেন যুবলীগে। দেওয়ান মাহবুব আলী ছিলেন আনোয়ার হোসেনদের আত্মীয়, পরে আনোয়ারের বোনকে বিয়ে করেছিলেন, তাদের বাড়িতেই তাঁকে দেখেছিলাম। যুবলীগে এসেই এক এক করে পরিচয় হয় মোহাম্মদ ইমাদুল্লাহ, মোহাম্মদ সুলতান, তাজউদ্দীন আহমদ, এম এ ওয়াদুদ, কামরুদ্দিন আহমদ, প্রাণেশ সমাদ্দার, ডাক্তার এম এ করিম, মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী, মীর্জা গোলাম হাফিজ, উর্দূভাষী সৈয়দ ইউসুফ হাসান, ঢাকা শহরের নেতৃস্থানীয় আদি বাসিন্দা আবদুল হালিম, নারায়ণগঞ্জের শামসুজ্জোহা ও শফি হোসেন খান, বরিশালের আলী আশরাফ, ফেনীর

www.pathagar.com

খাজা আহমদ ও আবদুল জব্বার খদ্দর, ময়মনসিংহের আবদুর রহমান সিদ্দিকী ও রফিকুল হোসেন, কুমিল্লার মফিজুল ইসলাম, সিলেটের নূরুর রহমান, পীর হাবিবুর রহমান ও তারা মিয়া, চট্টগ্রামের চৌধুরী হারুনুর রশীদ, বগুড়ার গোলাম মহিউদ্দীন, ঢাকা রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সৈয়দ আবদুর রহিম মোক্তার ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুল মতিন, এস এ বারী এটি, আবদুস সামাদ (পরে আবদুস সামাদ আজাদ), বাহাউদ্দিন চৌধুরী, আনোয়ারুল হক খান এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মনজুর হোসেনের মতো অনেক নেতা ও কর্মীকে। যুবলীগ অফিসের পাশে একটি বাড়িতে আবুল হাসনাত ও আবুল বরকত দুই ভাই থাকতেন- তাঁদের মধ্যে বরকতই যুবলীগে বেশি আসা-যাওয়া করতেন।

যুবলীগে আমি যোগ দেওয়ার পরে ডিসেম্বরের শেষে ঢাকায় সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন শুরু হয়। চিঠিপত্র দিয়ে পূর্ববঙ্গের প্রতিটি জেলার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে অলি আহাদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। আমি তাঁকে সাহায্য করতে শুরু করি এবং অল্পকালের মধ্যে তিনি আমাকে যুবলীগের অফিস সেক্রেটারি বানিয়ে দেন। যুবলীগের কাজকর্ম ইংরেজিতেই হতো ভাষা আন্দোলনের সময়েও। প্রায়-ভাঙ্গা একটা টাইপ রাইটার ছিল অফিসে-তাতে আমি দু আঙ্গুলে টাইপ করতাম, সাধারণ সম্পাদকের হয়ে স্বাক্ষর দিতাম, খামে ঠিকানা লিখে ডাকে দিয়ে আসতাম।

ডিসেম্বরের শেষ দুই দিনে ঢাকা বারের মিলনায়তনে যুবলীগের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সভাপতি মাহমুদ আলী এলেন সিলেট থেকে। তিনি ও অলি আহাদ স্ব স্ব পদে পুনর্নির্বাচিত হলেন। ইমাদুল্লাহ্ ও সুলতান যুগ্ন সম্পাদক হলেন। সম্মেলনে সারা দেশ থেকে প্রতিনিধি এসেছিলেন। ঢাকায় যাঁরা খুব সক্রিয় ছিলেন না যেমন, মাহমুদ নূরুল হুদা তাঁরাও যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনের বিরতির সময়ে দুই সাংবাদিক-এস এম আলী ও এ বি এম মুসা আমাকে ডেকে জানতে চেয়েছিলেন, যুবলীগে আমি কেন সম্পৃক্ত হয়েছি। কী জবাব দিয়েছিলাম, তা মনে নেই, কিন্তু মনে হয় তাঁরা তা শুনে অখুশি হন নি। সম্মেলন খুব সফল হয়েছিল। তার জন্যে প্রধান কৃতিত্ব ছিল অলি আহাদের সাংগঠনিক ক্ষমতার।

সম্মেলনের রেশ শেষ হতে না হতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলেন এবং ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারিতে পল্টন ময়দানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে ঘোষণা করলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এর প্রতিক্রিয়া ঘটলো সঙ্গে সঙ্গে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ৩০ জানুয়ারিতে ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট ও সভা হলো। সেদিন সন্ধ্যায় বার লাইব্রেরিতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় একটি সভা হয়। হল ভরে গিয়েছিল লোকে, আমিও এক কোণে দাঁড়িয়েছিলাম। সেখানে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এই সভাতেই ঢাকায় ৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট, ১১ ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস এবং ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশন শুরুর দিনে প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ও সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ছিল একটি শিথিলবদ্ধ সংগঠন। এর শরিকরা যার যার মতো আন্দোলনে সংগঠিত হচ্ছিলেন। রাজনৈতিক দলের মধ্যে এতে ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ ও খেলাফতে রব্বানী পার্টি তবে শেষটির তেমন শক্তি ছিল না, এর সমর্থকরা

www.pathagar.com

যুক্ত ছিলেন প্রধানত তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে। আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের জোরালো সংগঠন ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলিতে, মেডিক্যাল কলেজে, জগন্নাথ কলেজে আলাদা করে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে উঠেছিল এবং সকল জেলা শহরে ও অনেক মহকুমা শহরেও সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদকে সক্রিয় রাখতে অলি আহাদ অনেক সময় ও শ্রম দিয়েছিলেন। তাছাড়া, যুবলীগের সকল ইউনিটকে আন্দোলনের কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে আন্দোলনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে একটি পুস্তিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তা লেখার ভার দেওয়া হয় মোহাম্মদ তোয়াহাকে। তিনি যখন লিখতে সময় পাচ্ছিলেন না, তখন অলি আহাদ স্থির করেন, যুবলীগের পক্ষ থেকেই অমন একটি পুস্তিকা প্রচারিত হবে। সেটা লেখার ভার তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। আমি লিখে দিলে তিনিই তা সংশোধন করে ছেপে বের করেন। পুস্তিকার নাম ছিল 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন' সাব-টাইটেল ছিল 'কি ও কেন?' লেখক হিসেবে এতে কারো নাম ছিল না, শুধু যুবলীগের প্রকাশনা হিসেবেই এটা উপস্থাপিত হয়েছিল। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সম্পর্কে এটাই ছিল ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত প্রথম পুস্তিকা। পরে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের পুস্তিকাটা বের হয়। সেটি লিখেছিলেন বদরুদ্দীন উমর ঃ আমার লেখাটার চেয়ে সেটি আরেকটু বড়ো ও ভালো হয়েছিল।

৪ তারিখে আমরা ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট করলাম। আমি গিয়েছিলাম পোগোজ ও সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলে ধর্মঘট করাতে। প্রথমটা নির্বিঘ্নে ঘটলো, কিন্তু সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলের সামনে দাঁড়াবার কিছুক্ষণ পরে পুলিশ এসে যাওয়ায় পিঠটান দিতে হলো। কলেজে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগেই গঠন করা হয়েছিল, তার উদ্‌যোগে সভা করা হলো। ১১ তারিখে ট্রেনে ঢাকা- নারায়ণগঞ্জে কয়েকবার আসা-যাওয়া করে আন্দোলনের জন্যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করলাম। স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের প্রাদেশিক প্রধান অফিস ছিল আমাদের কলেজের সামনে। অলি আহাদের নির্দেশে সেখানে বার দুই গিয়েছিলাম কর্মচারী সমিতির এক নেতার সঙ্গে ২১ তারিখের ধর্মঘট সম্পর্কে আলাপ করতে। উত্তেজনার মধ্যেই দিন কাটছে, কেননা এমন অভিজ্ঞতা আমার পক্ষে নতুন। ২০ ফেব্রুয়ারী বিকেলের পরে কলেজ থেকে বাসায় ফিরছি, হঠাৎ মাইক্রোফোন যোগে পরদিন ১৪৪ ধারা জারি করার ঘোষণা শুনে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে আহমদ, নেয়ামাল ও আরো দু-একজন ছিল। সকলে ফিরে এলাম কলেজে, সেখানে কিছু কথাবার্তা বলে আমার বাসায় এলাম। যুবলীগ অফিসে খোঁজ নিয়ে জানলাম সন্ধ্যায় নবাব পুর রোডে আওয়ামী লীগ অফিসে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। আমরা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য নই, তবে অনেক বলে কয়ে জগন্নাথ কলেজ সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে আহমদ হোসেন ও আমাকে পর্যবেক্ষক হিসেবে সভায় উপস্থিত থাকতে দেওয়া হলো। আমাদের আর কজন বন্ধুকে নিয়ে নেয়ামাল সভাস্থলের সামনে রাস্তার ওপরে অপেক্ষা করতে লাগলো সিদ্ধান্ত জানার আশায়।

সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগলো। মওলানা ভাসানী ঢাকায় ছিলেন না, তাই সভাপতিত্ব করলেন আবুল হাশিম। বেশির ভাগই ১৪৪ ধারা ভাঙার বিপক্ষে। তাঁদের মূল বক্তব্য ছিল যে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে সরকার দমননীতির আশ্রয় নেবে, তাতে গণতান্ত্রিক শক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পরের বছরে পূর্ববঙ্গে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা, সরকার সেটা বন্ধ করার

www.pathagar.com

সুযোগ পাবে। অলি আহাদ আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন, ১৪৪ ধারা জারি হলেও আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। বৈঠকে তিনি খুব জোর দিয়ে এই অন্যায় আদেশ অগ্রাহ্য করে সরকারের আন্দোলন দমন করার প্রয়াস ব্যর্থ করে দেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁকে সমর্থন করে বক্তৃতা দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক আবদুল মতিন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি গোলাম মওলা এবং ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি সামসুল আলম। আমরা ভেবেছিলাম, মোহাম্মদ তোয়াহাও অলি আহাদের প্রস্তাব সমর্থন করবেন। তিনি কয়েকবার ঘরের বাইরে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত অধিকাংশের পক্ষেই মত দিলেন। পরে শুনেছিলাম, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার বিষয়ে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিলেন, কিন্তু তেমন কোনো সিদ্ধান্তের সংবাদ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সংঘাত এড়াবার পক্ষে মত দেন। যুবলীগের দুই নেতা যাঁরা এক সঙ্গে থাকতেন তাঁদের এই মতপার্থক্য দেখে আমরা অবাক হয়েছিলাম। সভায় সংখ্যাধিক্যের ভোটে সিদ্ধান্ত হলো যে, ১৪৪ ধারা জারির পরিপ্রেক্ষিতে ২১ তারিখের কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হলো, তবে সংগ্রাম পরিষদের কোনো সদস্য যদি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু করে কিংবা ২১ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠেয় সভায় যদি এই সিদ্ধান্ত উপেক্ষিত হয়, তাহলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ আপনা থেকেই ভেঙে যাবে।

সভা ভাঙতে অনেক রাত হলো। অলি আহাদ আমাদের বললেন, পরদিন যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকতে। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি মুজিবুল হকের সঙ্গে আমি খানিক দূর হেঁটে এসেছিলাম। বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত সবাই মানবে কিনা, তাঁর কাছে একথা জানতে চাইলে তিনি চিন্তিতভাবে বললেন দেখা যাক। এর মধ্যে আহমদ হোসেনের খোঁজে তার এক প্রতিনিধি হারিকেন হাতে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

নবাবপুর ও ঠাটারিবাজারের সংযোগস্থলে তিনি তাকে পেলেন। নেয়ামাল চলে গেল আলুবাজারে তার মেসে। আমি বাড়ির পথ ধরলাম। তবে স্থির হলো, পরদিন সকালে বন্ধুরা আগে আমার বাড়িতে জড়ো হবে, তারপর সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া যাবে।

যতোদূর মনে পড়ে, নেয়ামাল বাসির, তোফাজ্জল হোসেন, আবদুর রহিম, আনোয়ার হোসেন, আনোয়ারুল ইসলাম ও শফিকুর রহমান সবাই জগন্নাথ কলেজের আগে-পরের ছাত্র- আমাদের বাসায় জমায়েত হয়। আমার মা ও বোন সকলকে পরটা-ডিম খাইয়ে দিলেন যাত্রার আগে। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পুলিশ যদি আমাদের ধরে নিয়ে যায়, তাহলে ছাড়িয়ে আনার জন্য কোথায় কার কাছে তদবির করতে হবে। এতে বোঝা যায়, সেদিন যে একটা সংঘাতময় ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, অন্তঃপুর বাসিনীরাও তা অনুমান করতে পড়েছিলেন।

১৪৪ ধারা বাঁচিয়ে আমরা কলা ভবন প্রাঙ্গণে পৌঁছে বিপুল জনসমাগম দেখি। ছাত্র ও সাধারণজনের উপস্থিতি বাড়তে থাকে। পরিস্থিতি বেশ উত্তেজনাকর হয়ে ওঠে। পরে জানতে পারি, ফজলুল হক মুসলিম হল, সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের কিছুসংখ্যক নেতৃস্থানীয় ছাত্র আগের রাতেই অনানুষ্ঠানিক সভা করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কলাভবন প্রাঙ্গণে গাজীউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সেই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক আগের রাতে গৃহীত সর্বদলীয়

www.pathagar.com

রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত ও তার যৌক্তিকতা সকলকে জানান, তবে সভা তা মানতে রাজি হয়নি। অধিকাংশ বক্তাই ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে মত দেন। অলি আহাদ সে-সময়ে মধুর দোকানে বসে ছিলেন- তিনি বক্তৃতা দেন নি। তবে যাঁরাই তাঁকে বক্তৃতা দিতে বলছিল বা তাঁর মতামত জানতে চাইছিল, তাদের সবাইকেই তিনি বলেছিলেন যে, আগের রাতে তিনি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে কথা বলেছিলেন, সেটা না করলে আন্দোলনের বড়োরকম ক্ষতি হবে, তবে বক্তৃতা দিয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ভাঙ্গার দায়িত্ব তিনি নিতে চান না।

১৪৪ ধারা ভাঙ্গার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হলো, প্রথম দশজনের দলটি বেরিয়ে গেল। অলি আহাদ আমাকে মধুর দোকানের সামনে ডেকে নিয়ে যুবলীগ অফিসের চাবি দিয়ে বললেন যে, যে কোনো মুহূর্তে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারেন। অফিসের দায়িত্ব আমার থাকবে। ইমাদুল্লাহ যাতে গ্রেফতার না হন, সেই চেষ্টা করা হবে- তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আমি যেন কাজ করি। অবস্থা বুঝে অফিসের কাগজপত্র নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিতে হবে এবং সকল ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে। এই দায়িত্ব আমার ওপরে রইলো বলে আমি যেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে না যাই। আমি তাঁর কথা অনুযায়ী কাজ করেছিলাম। তবে আমার সহপাঠিদের মধ্যে নেয়ামাল বাসির ও আমীর আলী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কারাবরণ করেছিল।

আইনভঙ্গকারীদের সামাল না দিতে পেরে পুলিশ কলাভবনের গেটে মৃদু লাঠিচার্জ করে। তাতে কাজ না হওয়ায় কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। আমাদের দিক থেকে ইট পাটকেল ছোড়া হয় পুলিশকে লক্ষ করে- নেতারা নিষেধ করলেও সে কথা কেউ শোনেনি। আমি গা থেকে গেঞ্জি খুলে পুকুরে তা ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম চোখে পানি দেবো বলে। তখন কলাভবনের দোতলার বারান্দায় ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেনকে দেখতে পাই। অন্য ছাত্রদের পিছু পিছু আমিও তাঁর দিকে গিয়েছিলাম। ছাত্রদের দাবিতে ভাইস-চ্যান্সেলর কথা দেন, তিনি পুলিশের আচরণের প্রতিবাদ করবেন।

নিচে নেমে দেখি, মধুর দোকানের কাছে কলাভবন আর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মধ্যে লোহার যে রেলিং ছিল, সকলে মিলে সেটা ভেঙ্গে ফেলেছে এবং ওই পথ দিয়ে প্রথমে হাসপাতালের প্রাঙ্গণে এবং পরে আরেকটু পশ্চিমে মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলের সামনে জড়ো হয়েছে। হোস্টেলটা ব্যবস্থাপক পরিষদের খুবই কাছে। হোস্টেলের গেট দিয়ে বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় বের হবার চেষ্টা করলে পুলিশ আবার লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এক সময়ে আলাউদ্দিন আল আজাদ আমাকে সতর্ক করে দেন যে, গুলি চলতে পারে। তার কিছুক্ষণ পরই গুলিবর্ষণ হয়।

গুলি চলার পরপরই আমরা শুনতে পাই, আবুল বরকত, সালাম ও রফিকউদ্দীন নামে তিনজন ছাত্র নিহত হয়েছে। এই সালামকে আমরা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র এবং আন্দোলনের কর্মী বলে ধরে নিয়েছিলাম। তিনি মারা যাননি, পরে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের একটি ঘরে মাইক্রোফোন বসানো হয় গুলিবর্ষণের পরে। যিনি পারছিলেন, তিনিই বক্তৃতা করছিলেন। তোয়াহা সাহেব ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে যতো পারদর্শী ছিলেন, বাংলায় তেমন বলতে পারতেন না। তিনি আমাকে বক্তৃতা লিখে দিতে

www.pathagar.com

বললেন। আমি লিখে এক এক পাতা তাঁর হাতে দিই, তিনি তা দেখে বক্তৃতা করেন। কিন্তু বলার গতি সব সময়ে লেখার গতির চেয়ে দ্রুত হয়- তাল সামলাতে পারছিলাম না। শেষে তাঁর ইঙ্গিতে আমিও একটা বক্তৃতা দিই পুলিশের উদ্দেশো। খানিক পরে ব্যবস্থাপক পরিষদ থেকে বেরিয়ে এসে মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ সেখান থেকেই বক্তৃতা করেন।

কলাভবনের পেছন দিকে রেল লাইন ধরে সন্ধ্যার দিকে আমি বাসায় ফিরি। জানতে পারি, সান্ধ্য আইন জারি হয়েছে।

অলি আহাদ তখন থেকে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলেই ঘাঁটি গাড়লেন। প্রকৃতপক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারী রাত থেকে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলই হয়ে ওঠে আন্দোলনের সদর দপ্তর। ২২ তারিখ সকালে ওই হোস্টেলের প্রাঙ্গণে গায়েবি জানাজা এবং ইমাদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় অলি আহাদ বক্তৃতা করেন এবং বহুসংখ্যক প্রতিবাদমুখর মানুষের বিশাল মিছিলের নেতৃত্ব দেন। আমি তখন নেয়ামালের জামিনের জন্যে আমার ভাই সৈয়দ কামরুজ্জামানের সঙ্গে সৈয়দ আবদুর রহিম মোক্তারের বাড়ি এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বৃথাই ঘুরে ফিরছিলাম। আদালত থেকে ফেরার পথে নওয়াবপুর রোডে যেখানে সেদিন গুলি চলেছিল, সে জায়গাটা দেখি এবং দূর থেকে 'সংবাদ' অফিসে লাগানো আগুন ও আগুন লাগানো 'মর্নিং নিউজ' অফিসের ধোঁয়া দেখতে পাই। তবে অলি আহাদের সঙ্গে সেদিন আমার দেখা হয়নি। তারপরে আমি অনেকবার মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে গিয়ে আবদুল মতিন, আহমদ রফিক ও সাদেক খান প্রমুখ নেতা ও কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎ পাইনি। ২৩ ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রদের প্রচেষ্টায় গুলিবর্ষণের জায়গায় রাতারাতি শহীদ মিনার তৈরি হয়। 'আজাদ'-সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন যিনি গুলিচালনার প্রতিবাদে ব্যবস্থাপক পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন, তিনি-তা উদ্‌বোধন করেন। মওলানা তর্কবাগীশ ছোটো একটি বক্তৃতা দিয়ে মোনাজাত করেছিলেন। অসংখ্য মানুষ শহীদ মিনারে টাকাপয়সা দান করেছিলেন। আমার মা সেখানে একটি সোনার চেন দিয়ে আসেন। চেনটি ছিল আমার ছোটো একটি মৃত বোনের -তার স্মারক হিসেবে মা সেটি রক্ষা করেছিলেন। পরে পুলিশ শহীদ মিনারটি ভেঙে দেয়, সে সময়ে আমরা অনেকে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ছিলাম। অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠে ইমাদুল্লাহ্‌ 'ক্যামেরা, ক্যামেরা' বলে চিৎকার করছিলেন, আর বলছিলো ওরা মিনার ভাঙছে, কেউ একটা ছবি তুলে রাখো।'

২২ বা ২৩ ফেব্রুয়ারিতে ইমাদুল্লাহ্‌ আর আমি যুবলীগ অফিস থেকে কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আর টাইপরাইটারটা আমাদের বাসায় নিয়ে আসি। পরে পুলিশ যুবলীগ অফিস সিল করে দেয়। কিন্তু ইউনিটগুলোর ঠিকানা আমাদের কাছে থাকায় ইমাদুল্লাহ্‌র স্বাক্ষরে সেখানে চিঠিপত্র পাঠাতে পারি।

এর মধ্যে আন্দোলনে ভাটা পড়তে শুরু হয়। সেই সুযোগে ২৮ তারিখে অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, কাজী গোলাম মাহবুব, আবদুল মতিন ও শামসুল হক প্রমুখ নেতার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি মারফত বেরিয়ে যায়। তাঁরা অনেকে এ ক'দিন প্রায় আত্মগোপনে আছেন, তবে কেউ কোনো চিরকুটে একটি বিশেষ শব্দ লিখে আনলে বুঝতে হবে যে, তিনিই তাকে পাঠিয়েছেন। আমি প্রথম চিরকুট পাই চিকিৎসক আবদুল করিমের হাতে। তিনি জানালেন, এরপর যিনি চিরকুট নিয়ে আসবেন, আমি যেন বিনা প্রশ্নে তাঁর সঙ্গে যাই। দ্বিতীয় চিরকুট নিয়ে এলো আমার পূর্বপরিচিত আশারাফুল ইসলাম-এখন মার্কিন

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপনা করেন। তাঁর সঙ্গে দক্ষিণ মৈশন্ডির ভূতের গলিতে এক বাসায় গিয়ে অলি আহাদকে পেলাম। তিনি জানতে চাইলেন, শান্তিনগরে ডাক্তার মোতালেবের বাড়ি আমি চিনি কিনা। ডাঃ মোতালেব ছিলেন আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু আবদুল মালেকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং তাঁর বাসা আমি ভালো করেই চিনতাম। অলি আহাদ বললেন সন্ধ্যার পরে সেখানে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা বসবে সেখানে তাঁকে পৌঁছে দিতে হবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করে রিকশায় চেপে আহাদ ভাই ও আমি শান্তিনগরে রওনা হলাম। নির্দিষ্ট জায়গায় তাঁকে পৌঁছে দিয়ে আমি হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরলাম। আমি যেহেতু সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলাম না, সেহেতু ওই বৈঠকে আমার উপস্থিত থাকার কথা ওঠেনি। এমনকী, আহাদ ভাইকে ফিরিয়ে আনার জন্যেও আমাকে থাকতে বলা হয়নি।

আমি অন্যত্র লিখেছিলাম এবং আরো কেউ কেউ লিখেছেন যে, সভাটা হয় ফেব্রুয়ারির শেষে। অলি আহাদ লিখেছেন, ৭ মার্চ, শুক্রবার, সন্ধ্যা সাতটায়। সেই রাতেই ডাঃ মোতালেবের বাড়ি ঘেরাও করে অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন, মীর্জা গোলাম হাফিজ, মুজিবুল হক ও হেদায়েত হোসেন চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে। কাজী গোলাম মাহবুব মাচার উপরে শুয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করেন। সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের বাইরে সভার খবর জানা ছিল মাত্র কয়েকজনের। নেতারা ধরা পড়ার পরে তার জন্যে একেকজন আমাদের একেকজনকে দায়ী করতে থাকলেন। কেউ দায়ী করলেন ডাঃ মোতালেবের ভাই আবদুল মালেককে- সে কথা তাঁর কানে যাওয়ায় রটনার উৎস বলে আমাকে গণ্য করে তিনি বেশ রুষ্ট হন। কেউ মনে করেন, সাদেক খান যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করায় সভার স্থান জানাজানি হয়ে যায়। সাদেক খান সন্দেহ করেন রহিম চৌধুরীকে তিনি ছিলেন হেদায়েত হোসেন চৌধুরীর বন্ধু এবং মুসলিম লীগের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। মোহাম্মদ তোয়াহা মনে করেন, মুজিবুল হক বা হেদায়েত হোসেন চৌধুরীর কাছ থেকে খবর বেরিয়ে যায়। কাজী গোলাম মাহবুব দায়ী করেন আমাকে।

কাজী গোলাম মাহবুব যদিও শান্তিনগরের বাড়িতে গ্রেপ্তার এড়াতে পারেন, তবে সরকারের দেওয়া সময়সীমার মধ্যে তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। জেলে গিয়ে তিনি তাঁর সন্দেহের কথা অলি আহাদকে জানান। তাঁর একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, গোয়েন্দা বিভাগে বশীর নামে আমার কোনো আত্মীয় কাজ করতেন (আমার এমন কোনো আত্মীয় ছিলেন না) এবং আমার কাছ থেকে সভার খবর তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। কাজী গোলাম মাহবুবের কথাটা তোয়াহা একেবারে উড়িয়ে দেন, কিন্তু অলি আহাদ তা বিশ্বাস করেন। পরে অবশ্য অলি আহাদের ভুল ভাঙ্গে, কাজী গোলাম মাহবুবও আমার কাছে স্বীকার করেন যে, তাঁর সন্দেহ ছিল অমূলক।

আগেই বলেছি, ফেব্রুয়ারির শেষে ভাষা-আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। মার্চে আর আন্দোলনের রেশ থাকেনি। সংগ্রাম পরিষদের নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় আন্দোলন নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে। সারা দেশেই রাজনৈতিক কর্মীদের ধরপাকড় চলছিল। নেতারা কেউ জেলে, কেউ আত্মগোপনে। এ অবস্থায় আতাউর রহমান খানকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠিত হয় এবং ঢাকা বারের মিলনায়তনে এপ্রিলের শেষদিকে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সারা প্রদেশ থেকে কিছু নেতা এবং অনেক কর্মীর সমাগম হয়। সেখানে ইমাদুল্লাহ্ ও আমি ছিলাম- তবে আমাদের কোনো ভূমিকা ছিল না।

www.pathagar.com

যুবলীগের প্রতিনিধিত্ব করেন সভাপতি মাহমুদ আলী। এই সভায় সদ্য কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানও বক্তৃতা করেন। তবে আন্দোলন আর নতুন করে অগ্রসর হতে পারেনি।

১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে অলি আহাদকে তাঁর গ্রামে অন্তরীণ করে রাখা হয়। সম্ভবত এই অন্তরীণ অবস্থায়ই তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। শুরু হয় তাঁর জীবনের আরেক অধ্যায়। তবে ভাষা-আন্দোলনে নেতৃত্বদান তাঁর জীবনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সে-সময়ে তিনি যে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেন, তা সত্যিই বিরল। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সারা প্রদেশে যুবলীগ কর্মীদের বড়ো ভূমিকা ছিল। সেই ভূমিকার পেছনে ছিল অলি আহাদের উদ্‌যোগ, সৎসাহস ও যথাযথ পরিকল্পনা।

[প্রফেসর আনিসুজ্জামান ঃ ভাষা সৈনিক, চেয়ারম্যান বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]

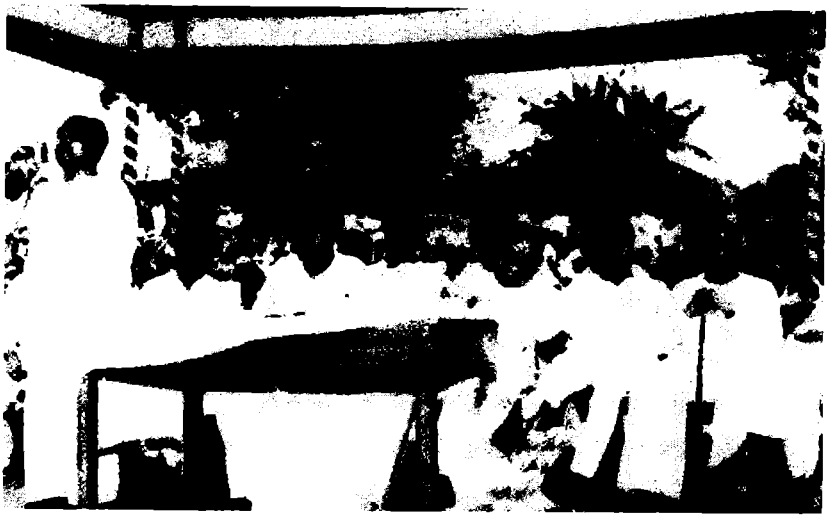

১৯৬৪ সালে লালদীঘি ময়দানে এনডিএফ কর্তৃক আয়োজিত জনসভায় জনাব মাহমুদ আলী বক্তৃতারত। মঞ্চে উপবিষ্ট সর্বজনাব নূরুল আমীন, ইউসুফ আলী চৌধুরী, এস, এম, সোলায়মান, আবদুস সামাদ আজাদ, অলি আহাদ, মাহমুদুন্নবী চৌধুরী ও মুহাম্মদ নূরউল্লাহ।

www.pathagar.com

অলি আহাদ সাহেবের কথা

বদরুদ্দীন উমর

অলি আহাদ সাহেবের সাথে আমার প্রথম দেখা ও পরিচয় হয় ঢাকায়। ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে। ঐ বছরই পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় ফেব্রুয়ারী মাসে। তখন ছিল আমার আই,এস,সি, পরীক্ষা। বর্ধমানে সে সময় পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমি ঢাকায় আসি ১২ই এপ্রিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে তখন কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা করে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গের পরীক্ষার্থীদের জন্য। সেই অনুযায়ী এপ্রিল-মে মাসে আমি ঢাকায় পরীক্ষা দিই।

আবদুল জলিল সাহেব কলকাতায় মুসলিম লীগের একজন কর্মী ছিলেন। তিনি কলকাতায় আমাদের বাড়ীতে অনেক দিন ছিলেন। বিয়ের পর ১৯৪৬ সালে অন্য বাড়ীতে উঠে যান। ঢাকায় এসে আমি জলিল সাহেবের বাসায় উঠি। তাঁর স্ত্রী জয়নাব আখতার ছিলেন একজন ভাল ছাত্রী এবং সরকারী ইডেন কলেজের অধ্যাপক। যতদূর মনে হয়, জলিল সাহেবের বাসাতেই অলি আহাদ সাহেবের সাথে আমার প্রথম দেখা হয়।

আমার আব্বা আবুল হাশিম সাহেব সপরিবারে ঢাকায় চলে আসেন ১৯৫০ সালের ২২শে এপ্রিল। জলিল সাহেব তাঁদের জন্য ২১ নং গোপীবাগ থার্ড লেনে একটি বাড়ী ভাড়া করে দেন। তাঁরা ঢাকায় এসে সেখানেই ওঠেন। কলকাতা থেকে ট্রেনে গোয়ালন্দে এসে স্টীমারে তাঁরা নারায়ণগঞ্জে আসেন। সেখান থেকে ঢাকায়। আমি পরীক্ষার জন্য নারায়ণগঞ্জ যেতে পারিনি। যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অলি আহাদ সাহেব ছিলেন।

ঢাকায় আসার আগে পূর্ব বঙ্গের মুসলিম লীগের অল্প বয়স্ক নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীদের মধ্যে আমাদের পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ছিল টাঙ্গাইলের শামসুল হক সাহেব এবং মুন্সীগঞ্জের শামসুদ্দীন আহমদ সাহেবের সাথে। এছাড়া বরিশালের নুরুদ্দীন আহমদ সাহেব দেশ বিভাগের আগে কলকাতায় ছিলেন মুসলিম ছাত্র লীগের তথাকথিত বাম অংশের প্রধান ও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নেতা। তাঁকেও ভালভাবে চিনতাম। শেখ মুজিবুর রহমান তখন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র এবং মুসলিম ছাত্রলীগের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন। তিনি আমাদের বাসায় আসতেন, কাজেই তাঁকেও চিনতাম। এঁরা সকলেই আমাদের বর্ধমান ও গ্রামের বাড়ীতেও গেছেন।

কমরুদ্দীন আহমদ সাহেব, তোয়াহা সাহেবের সাথে ঢাকায় আসার পর অনেক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হলেও তাঁদের সাথে কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না, যেমন ছিল না অলি আহাদ সাহেবের সাথে। প্রথম দুজনের লেখাতেই দেখেছি যে, তাঁরা আমাদের গ্রামের বাড়ীতেও গেছেন। কিন্তু তখন তাঁদের সাথে কোন পরিচয় হয়নি।

জলিল সাহেবের বাসায় যখন অলি আহাদ সাহেবের সাথে দেখা হয় তখন তিনি আর ছাত্র লীগ বা মুসলিম লীগ করতেন না, কিন্তু অন্য কোন সংগঠনের সাথেও জড়িত ছিলেন না,

www.pathagar.com

যদিও নানা প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা তাঁর ছিল। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটে নেতৃস্থানীয় ভূমিকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে বহিস্কার করে। যে সব ছাত্র সেই ধর্মঘটের সাথে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানও ছিলেন। তাঁর শুধু জরিমানা হয়েছিল সামান্য টাকা, অলি আহাদ সাহেবের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই ছিল সব থেকে কঠোর। এর থেকে বোঝা যায় সেই ধর্মঘট আন্দোলনে তাঁর ভূমিকাই ছিল অন্যদের থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে পরে আমি জেনেছি, কিন্তু তখন আমি ঢাকায় নতুন কাজেই সে সময় সবার সাথে পরিচয় ঠিক মত ছিল না।

১৯৫১ সালের দিকেই অলি আহাদ সাহেবের রাজনৈতিক কাজ কর্মের সাথে আমার কিছুটা পরিচয় হয়। তখন যে সব রাজনৈতিক সভা সমিতি হতো সেগুলিতে মাঝে মাঝে যেতাম এবং প্রায়ই তিনি সেগুলিতে উপস্থিত থাকতেন এবং বক্তৃতা করতেন। নিজের বক্তব্য তিনি অনেক সময়ে বেশ উত্তেজিতভাবেই বলতেন।

যতদুর মনে পড়ে সে সময়ে তাঁর একটি সাইকেল ছিল, যেমন অন্য অনেকেরও ছিল। সেই সাইকেলে চড়ে তিনি তখনকার ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরতেন। আগেকার সেই সাইকেল ঢাকা শহরে আর নেই। ১৯৬৮-৬৯ সালেও আমি তোয়াহা সাহেবকে সাইকেলে চড়তে দেখেছি। আহসাবউদ্দিন সাহেবকেও দেখেছি চট্টগ্রামে সাইকেলে চড়তে। কিন্তু আজকাল কোন রাজনৈতিক নেতা অথবা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক সাইকেল চড়ে ঘুরছেন এমন দৃশ্য চোখে পড়ে না। এমনকি ছাত্রেরাও ঢাকায় এখন আর সাইকেলে চড়ে না।

১৯৫১ সালের প্রথম দিকে যুবলীগ গঠিত হয় এবং অলি আহাদ সাহেব তার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। মনে হয় যুবলীগের সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকার সময়টাই অলি আহাদ সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময়। একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁর পরিচিতি সেই সময়েই গঠিত হয়।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাস থেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। পুর্ব পাকিস্তান যুব লীগই ছিল এ রকম একটি রাজনৈতিক সংগঠন। রাজনৈতিক দল না হলেও এই যুব সংগঠনটি ছিল খুব রাজনীতিকৃত এবং এর ওপর কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব যথেষ্ট ছিল। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও কমিউনিষ্ট পার্টির সহায়তা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৫১ সালের মার্চ মাসে যুবলীগ গঠিত হওয়ার পর অল্পদিনের মধ্যেই সংগঠনটির শাখা পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শহর এবং অঞ্চলে গঠিত হয়। প্রগতিশীল রাজনীতিক কর্মীদের মধ্যে যুব লীগ বেশ উৎসাহ সৃষ্টি করে, কারণ তখন তাঁরা মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির বাইরে এমন একটি সংগঠনের জন্য উৎসুক ছিলেন যার মাধ্যমে তাঁদের চিন্তা, চেতনা ও আকাঙ্খার অভিব্যক্তি ঘটাতে পারতো।

সংগঠনটির প্রথম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এ ক্ষেত্রে অলি আহাদ সাহেব খুব কৃতিত্বের সাথে নিজের দায়িত্ব পালন এবং সফলতা প্রমাণ করেন। বিভিন্ন এলাকার রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে শাখা সংগঠনগুলির মধ্যে যথেষ্ট সক্রিয়তা দেখা দেয় এবং নানা ধরনের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কর্মসূচী তাঁরা নিয়মিতভাবে পালন করতে থাকেন।

www.pathagar.com

১৯৫১ সালের ৩০ ও ৩১শে ডিসেম্বর ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অলি আহাদ সাহেব যে রিপোর্ট প্রদান করেন তাতে যুব লীগের নিজস্ব সাংগঠনিক কাজ কর্মের রিপোর্টিং এর সাথে দেশের তৎকালীন পরিস্থিতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কেও অনেক তথ্য উপস্থিত করা হয়।

এই রিপোর্টে তিনি যুব লীগ সম্পর্কে বলেন যে, এটি কোন রাজনৈতিক দলের শাখা বা প্ল্যাটফরম নয়। যুব লীগের এই বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রেখেই একে সমাজের একটি সত্যিকার গণপ্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সংগঠনের সদস্য ও কর্মীদের প্রতি তিনি আহবান জানান। মনে হয় সরকারী এবং বেসরকারী কোন কোন মহল থেকে যুব লীগের বিরুদ্ধে প্রচারণার কারণেই এ কথা বিশেষভাবে বলার প্রয়োজন হয়।

অলি আহাদ সাহেবের এই রিপোর্টে ভাষা আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বে দেশের অবস্থার একটা সামগ্রিক চিত্র সংক্ষেপে, কিন্তু বেশ স্পষ্টভাবে, উপস্থিত করা হয়। এ দিক দিয়েও রির্পোটটি ছিল গুরুত্বর্পূর্ণ। দুর্ভিক্ষ, লবণ সংকট, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, কলকারখানার শ্রমিকদের মজুরী, কৃষক সমাজের দূরবস্থা, যুবকদের বেকারত্ব, পাট চাষীদের অবস্থা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি ছিল রিপোর্টটির আলোচ্য বিষয়। এছাড়া ভাষার প্রশ্নে সরকারের নানা বক্তব্যের বিষয়ও ছিল রিপোর্টটির অন্তর্ভূক্ত।

ভাষার দাবী এবং আন্দোলন সম্পর্কে রিপোর্টটিতে অলি আহাদ সাহেব যা বলেন তার মধ্যে শুধু তাঁর নয়, ঐ সময়ে প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা যাঁরা করতেন তাঁদের সকলেরই চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটে। ভাষার দাবী যুব লীগ পুরোপুরি সমর্থন করে এবং ভাষা আন্দোলনে যুব লীগ কর্মীরা সর্বত্র সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, একথার পর তিনি বলেন, "এখানে ইহা জানাইতে চাই যে, আমাদের এই দাবী অন্য কোন ভাষার বিরুদ্ধে নয়। সমস্ত ভাষাই নিজ নিজ মর্যাদায় ও সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হোক ইহাই আমরা চাই। আমরা ইহাও চাই যে, পূর্ব বঙ্গে যে অবাঙ্গালী জনসাধারণ বাস করিতেছেন তাঁহাদের জন্য তাঁহাদের ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা হোক।"

পঞ্চাশ বছরেরও আগে ভাষা আন্দোলনের সময় এখানকার কর্মীদের যে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ছিল স্বাধীন বাঙলাদেশের উগ্র জাতীয়তাবাদী শাসক শ্রেণীর মধ্যে তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। এখন বাঙলাদেশে যে অবাঙালী উর্দুভাষীদের নিজেদের ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই শুধু তাই নয়, উর্দু প্রেসের কোনও অস্তিত্ব নেই, এমনকি তাদের সাধারণ নাগরিক অধিকার পর্যন্ত নানা প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের কবলে পড়ে অপহৃত।

রিপোর্টটির শেষ দিকে যুব লীগের সাংগঠনিক তৎপরতা, কাজের ঘাটতি এবং লক্ষ্য সম্পর্কে অলি আহাদ সাহেব যা বলেন সেটা উল্লেখযোগ্য। যুব লীগের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কথা বলা সত্ত্বেও তিনি বলেন, "পূর্ব বাংলায় গত ৯ মাসের যুব আন্দোলনের মধ্য দিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, বিভিন্ন প্রশ্নে যুব সমাজ নিজেদের অধিকার ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন আন্দোলন করিয়াছেন। যুব লীগ সাধ্যমত সেই সব আন্দোলনে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের কাজের গলদ অতীব স্পষ্ট। তাহা হইল যে, আমরা যুব লীগের কর্মীগণ যুব সমাজের দৈনন্দিন সমস্যা নিয়া, যেমন বেকার সমস্যা, গরীব যুবকদের মজুরী বাড়ানোর প্রশ্ন, ছাত্রদের শিক্ষা বা বাসস্থানের সমস্যা, মেয়েদের শিক্ষার সমস্যা বিষয়গুলি

www.pathagar.com

নিয়া আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে বিশেষ চেষ্টা করি নাই। যুব সমাজের শরীর গঠন, খেলাধূলা প্রভৃতির জন্য আন্দোলনও আমরা করি নাই। যে সমস্ত প্রশ্ন বা সমস্যা সাধারণভাবে সময়ে সময়ে সারা দেশ বা যুব সমাজকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে আমরা সেই বিষয় নিয়া আন্দোলন করার ভিতরই আমাদের কর্ম প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলাম। আমাদের কাজের ধারার এই গলদ আজ দূর করা দরকার।"

১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারী পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকায় এক বক্তৃতায় উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলার পরই নতুন পর্যায়ে আবার ব্যাপকভাবে ভাষা আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। এই আন্দোলনে যুবলীগ ও সেই সাথে তার সম্পাদক অলি আহাদ সাহেব খুব সক্রিয়ভাবেই অংশ গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, ভাষা আন্দোলনকে কিছুটা সংগঠিত রূপ দিতে যুব লীগের প্রচেষ্টাই সে সময় ছিল সব থেকে উল্লেখযোগ্য।

২০শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারীর পর সেটা ভঙ্গ করা হবে কিনা এ প্রশ্ন ঐ দিন সন্ধ্যায় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম কমিটির বৈঠকের প্রধান বা একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল। সে সময় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্যে অলি আহাদ সাহেব নিজের বক্তব্য উত্থাপিত করেন। এ প্রসঙ্গে ঐ বৈঠকে তিনি বলেন, "১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব বঙ্গ আইন পরিষদে জনাব শামসুল হককে সদস্য হিসাবে বক্তব্য রাখার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তাঁহার সদস্যপদ চক্রান্ত করিয়া খারিজ করা হইয়াছে। এমনকি টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর মুসলিম লীগ সরকার অদ্যাবধি আর কোন উপনির্বাচন দেয় নাই। শুধু তাই নয় বিনা অজুহাতে আমাদের পুনঃ পুনঃ ঘোষিত শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে বানচাল করিবার অসৎ উদ্দেশ্যেই সরকার ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছে। অতএব ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া সরকারকে সমুচিত জবার দিব।"

অলি আহাদ সাহেব এবং অন্য যাঁরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে ছিলেন তাঁদের কৃতিত্ব এই ছিল যে, তাঁরা সাধারণ ছাত্রদের মেজাজ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। কারও কারও ধারণা যে সে মেজাজ ২০ ও ২১ শে ফেব্রুয়ারী তাঁরা তৈরী করেছিলেন। এ ধারণা সঠিক নয়। অলি আহাদ সাহেব ও তাঁর মত নেতৃস্থানীয় কর্মীরা আসলে সাধারণ ছাত্রদের তৎকালীন মেজাজকে সঠিকভাবে নিজেদের চিন্তায় ধারণ করতে পেরেছিলেন এবং তাঁদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্তের মধ্যে তার অভিব্যক্তি ঘটেছিল।

২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্রেরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন। আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে তখন অলি আহাদ সাহেবকে অনেক রকম কাজ করতে হয়েছিল। বিভিন্ন রকম যোগাযোগ, কাজের সমন্বয় সাধন, তাৎক্ষনিকভাবে অনেক প্রকার করণীয় নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রধান ছিল। যুব লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত থাকায় তাঁর কতকগুলি সুবিধা ছিল যা অন্যদের ছিল না।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির এক প্রস্তাব অনুযায়ী ২১ শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ সম্পর্কিত গৃহীত সিদ্ধান্তের বিপরীতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হলে সর্বদলীয় কমিটি বিলুপ্ত হবে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পর যে অভাবিতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তাতে শুধু ছাত্রদের সংগ্রাম কমিটির পক্ষে তার মোকাবেলা করা

www.pathagar.com

সম্ভব ছিল না। এ কারণে অলি আহাদ সাহেবসহ অন্য অনেকেই তখন উপলব্ধি করেছিলেন যে ২০শে ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির আত্মবিলোপের প্রস্তাব সত্ত্বেও তাকে আবার পুনরুজীবিত করা দরকার।

মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ভেতরে খোলা জায়গায় (বর্তমান কেন্দ্রীয় শহীদ মীনারের জায়গায়) ২২শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব দিন নিহত ছাত্র এবং অন্যদের গায়েবী জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সে জানাযাতে যুব লীগের নেতা ইমাদুল্লাহ সভাপতিত্ব করেন এবং বক্তৃতা করেন অলি আহাদ। অন্য কাউকে সেখানে বক্তৃতা করতে দেয়া হয়নি। ফজলুল হক সাহেব, আবুল হাশিম সাহেব জানাযায় এসেছিলেন। ফজলুল হক সাহেব সম্পর্কে অলি আহাদ সাহেব নিজেই বলেন, "ফজলুল হক যোগদান করতে এসেছিলেন কিন্তু তাঁকে বলতে দেওয়া হয়নি। তিনি ৫০০ টাকা চাঁদাও দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি খুব রুঢ় ভাষায় তা প্রত্যাখ্যান করি। কারণ আমি মনে করেছিলাম যে তিনি পরোক্ষভাবে আন্দোলনকে ঘুষ দিয়ে নিজের স্বার্থে তাকে বিপ্লবী পথ থেকে অন্য দিকে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।"

অলি আহাদ সাহেবের এই ধরনের চিন্তা সঠিক ছিল বলে মনে হয় না। যে কারণে তাঁরা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সে কারণেই ফজলুল হক সাহেবের মত ব্যক্তির সমর্থন ও সহযোগিতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ছিল। ভাষা আন্দোলন কোন সংকীর্ণ বিপ্লবী আন্দোলন ছিল না। সেটা ছিল ব্যাপক জনগনের এক ধরণের অভ্যুত্থান।

২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় সাধারণভাবে জনগণ যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন এবং মিছিলে যে ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সরকার ও সরকার সমর্থক প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র ইত্যাদির বিরুদ্ধে মারমুখী হয়েছিলেন তার থেকে বলা চলে যে, ঐদিন ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোনের উচ্চতম পর্যায়। তার পরও আন্দোলন কয়েকদিন অব্যাহত থাকলেও তার গতি ছিল নিম্নমুখী।

আন্দোলনের নিম্নগতির বিষয়টি অলি আহাদ সাহেবও উপলব্ধি করেছিলেন। এ ব্যাপারে অলি আহাদ সাহেবের নিজের কথা হলো নিম্নরূপ, "২৩ তারিখে রাত্রে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল ব্যারাকের ৬/৫ নম্বর রুমে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ গতি সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিলো। এক পর্যায়ে আবুল হাশিম সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'Oli Ahad, how far do you want to go' তার জবাবে আমি বললাম, Honourable retreat। একথা বলার সময় আমি চিন্তা করেছিলাম যে আন্দোলনে ইতিমধ্যে ভাটা পড়েছে এবং আমাদের Resources খুব limitied ছিল। সে জন্য মুভমেন্টকে এমন পর্যায়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া wise হবে না যেখানে তার উপর আমরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবো।"

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সম্পর্কে কোন বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। অলি আহাদ সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং মহত্তম অধ্যায় সম্পর্কে বলতে গিয়েই এ সম্পর্কে সামান্য কিছু কথা বলার প্রয়োজন হলো।

ভাষা আন্দোলনে বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে অনেক আবোল তাবোল এবং মতলববাজী কথাবার্তা ১৯৭১ সালের পর থেকে শোনা যায়। প্রকৃত ইতিহাস রচনা এবং ঐতিহাসিক

www.pathagar.com

ঘটনার পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আবোল তাবোল অথবা মতলববাজীর স্থান নেই। কেউ সে চেষ্টা করলেও সেটা স্থায়ী হওয়ার নয়।

শেষ করার আগে এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। অলি আহাদ সাহেবের বর্তমান রাজনীতি তাঁর পূর্ববর্তী রাজনীতি থেকে ভিন্ন হওয়ার কারণে ভাষা আন্দোলনের আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকেই তাঁর কথা তেমন কেউ বলতে চায় না। উপরন্তু অন্য অনেকের প্রান্তিক ভূমিকাকেও গৌরবান্বিত করা হয় এক ধরনের রাজনীতির সাথে তাঁদের সম্পর্কের কারণে। এ ধরনের প্রচেষ্টা কোন যোগ্য ঐতিহাসিক, এমনকি কোন যোগ্য ব্যক্তিরও উপযুক্ত নয়।

কোন বিশেষ আন্দোলন বা ঘটনার ইতিহাস আলোচনা বা পর্যালোচনার সময় সেই আন্দোলন বা ঘটনার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ পরবর্তী কালে কি করেছেন বা কোন অবস্থানে আছেন, সেটা কার পছন্দ কার অপছন্দ, সেটা দিয়ে তাঁর বা তাঁদের পূর্ববর্তী ভূমিকার মূল্যায়ণ করতে যাওয়া একদিকে যেমন সেই ব্যক্তির প্রতি অবিচার, তেমনি সেই আন্দোলনের সঠিক চরিত্র উপলব্ধি ইতিহাস জ্ঞান সঠিকভাবে অর্জনের ক্ষেত্রে এক বিপদজ্জনক প্রতিবন্ধক।

ভাষা আন্দোলনে অলি আহাদ সাহেবের ভূমিকা যাঁরা অগ্রাহ্য করেন, উপেক্ষা করেন অথবা ছোট করে দেখাতে চান তাঁরা প্রকারান্তরে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃতকরণের প্রচেষ্টাতেই লিপ্ত থাকেন। তাঁদের এই অপকর্ম সমর্থনযোগ্য নয়। **১৮ জুন, ২০০২**

[বদরুদ্দীন উমর স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ]

www.pathagar.com

অলি আহাদঃ আপোষহীন সংগ্রামী

আখতার-উল্-আলম

[প্রীতিভাজন মুন্সী আবদুল মজিদ দীর্ঘদিন যাবৎ প্রবীণ রাজনীতিবিদ অলি আহাদের একনিষ্ঠ অনুসারী'একজন ত্যাগী রাজনৈতিক কর্মী। তিনি যখন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওই প্রবীণ রাজনীতিবিদের উপর কিছু লিখবার জন্য জেদ ধরে রইলেন, তখন তাঁকে বলেছিলাম, কিছু পয়েন্ট তো দেবেন যা দেখে শুনে কিছু লিখে দিতে পারি। সুতরাং রচিত এই নিবন্ধের পুরা কৃতিত্ব মুন্সি সাহেবের; আর যা কিছু দোষ ত্রুটি পুরোটাই আমার।]

অলি আহাদ সাহেবের কথা মনে হলেই মনে পড়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতার কয়েকটি লাইন ঃ

"যেথায় মিথ্যা ভন্ডামী ভাই
করবো সেথায় বিদ্রোহ,
ধামা ধরা জামা ধরা
মরণ ভীতু, চুপ রহ!"

অলি আহাদকে যারা চির বিদ্রোহী বলেন, তারা ভুল কিছু বলেন না। সেদিকের বিচারে অলি আহাদ যেন জাতীয় কবির 'বিদ্রোহী' কবিতারই মূর্ত প্রতীকঃ যাঁর-"শির নেহারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রীর!"

অলি আহাদ সাহেবের সাথে আমার বয়সের ব্যবধান দশ/এগারো বছর। তারপরেও তাঁর সাথে, তার ফ্যামিলির সাথে শুধু বন্ধুত্ব নয়, সহমর্মীতার এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক কেমন করে যে গড়ে উঠেছে-তার ইতিবৃত্ত অনেক দীর্ঘ। শুধু এইটুকু বলা চলে যে, তাঁর রচিত "জাতীয় রাজনীতি ৪৫ থেকে ৭৫" পুস্তকের জন্মদাতা তিনি বটে, কিন্তু তার ধাত্রীপনা করতে হয়েছিল আমাকেই। মাঝখানে বিদেশ থেকে ফিরে এসেও দেখেছি, পুস্তকটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ নিয়ে তিনি বিব্রত। খোশরোজ কিতাব মহলের অগ্রজতুল্য মুহীউদ্দীন আহমদকে বলতেই তিনি রাজী হয়ে গেলেন। বাজারে সেই সংস্করণও বোধ হয় এখন দুষ্প্রাপ্য। মাঝখানে কি এক খেয়ালের বসে তিনি আমাকে "দৈনিক ইত্তেহাদ" পত্রিকা প্রকাশের "নো-অবজেকশন পত্র" লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে সে পত্রিকা প্রকাশিত হতে পারে নাই। তবে, সে অন্য ইতিহাস। এখানে তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক।

ব্যাক্তিগত আলাপ আলোচনায় রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস এবং জাতীয় রাজনীতির হাল চাল সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভ ও ক্ষুদ্ধতা স্বতঃই প্রকাশ পায়। কিন্তু নীতির প্রশ্নে অটল থাকার ব্যাপারে তাঁর মত এদেশে আমি আর কাউকে খুঁজে পাই নাই। একদিক দিয়ে এই বিষয়টা তাঁকে যেমন অন্য অনেকের কাছ থেকে আলাদা করে রেখেছে, তেমনি দেশ ও জাতি পেয়েছে বিবেকের এমন এক কণ্ঠস্বর-যা এখনো যে কোন সংকট মুহূর্তে যে কারো বিরুদ্ধে সুতীব্র উচ্চারণে ফেটে পড়তে দ্বিধা করেনা। উদাহারণ স্বরূপ, উপস্থিত, ভাষা আন্দোলনের 'অজানা তথ্য' সম্পর্কে তাঁর কিছু বক্তব্য হুবহু এখানে তুলে ধরতে চাই। যেমন-

www.pathagar.com

ভাষা আন্দোলনের অজানা তথ্য

"মাওলানা মওদুদী, দেওবন্দী হোসেন আহমদ মাদানী, মাওলানা আজাদ গোষ্ঠীর মোল্লারা ও গান্ধী মহারাজের চেলারা আগাগোড়া হিন্দুস্থানে মুসলিম আবাস ভূমির বিরুদ্ধে ছিলেন। তেমনি তাঁরা ছিলেন ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারী ও ২১শে ফেব্রুয়ারী-উত্তর ঢাকা নারায়ণগঞ্জের রাজপথ কাঁপানো রক্তাক্ত সংগ্রামেরও বিরুদ্ধে। মূলতঃ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ছিল তাদের অবস্থান। কৌশলে বলতেন, 'আরবী হরফে বাংলা লিখতে চাই।' একই ভাবে বাংলার রক্তক্ষয়ী আজাদী সংগ্রামেও তাঁরা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী।"

"রক্তস্নাত ২১শে ফেব্রুয়ারীর পূর্বদিন ২০শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে নুরুল আমীন সরকার ১৪৪ ধারা জারী করে। জারীকৃত ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে ধনুর্ভঙ্গ পণ গ্রহণ করে কমরেড মনি সিংহের নেতৃত্বাধীন কমিউনিষ্ট পার্টি, আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতৃত্ব (মজলুম নেতা মওলানা ভাসানী তখন ঢাকার বাইরে নরসিংদীর গ্রামঞ্চলে জনসভায় ছিলেন) যথা আতাউর রহমান খান, জেনারেল সেক্রেটারী শামসুল হক, তদানীন্তন সাপ্তাহিক ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, সহ-সভাপতি খয়রাত হোসেন এম এল এ, মিসেস আনোয়ারা খাতুন এম এল এ, তমদ্দুন মজলিস নেতা অধ্যাপক আবুল কাসেমসহ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শামসুল হক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক খালেক নেওয়াজ খান, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর কাজী গোলাম মাহবুব ও পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের সহ সভাপতি মোঃ তোয়াহা প্রমুখ অনেকেই জনাব আবুল হাশিম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারীতে জারীকৃত ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করেন। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি কমিটি অব একশন কনভেনর আবদুল মতিন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন সহ-সভাপতি গোলাম মাওলা, ফজলুল হক হলের সহ-সভাপতি শামসুল আলম ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে ভোট দেন। অর্থাৎ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে ৪ ভোট এবং বিপক্ষে ১১ ভোট পড়ে। ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার পক্ষে তাদের যুক্তি ছিল, সামনে নির্বাচন। সিদ্ধান্ত হবে হটকারী। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের আন্দোলনে গেলে আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবো। নির্বাচনে অংশগ্রহণ কঠিন হয়ে যাবে।"

"একুশে ফেব্রুয়ারীর আমতলার সভায় টিয়ার গ্যাস শেলে জ্ঞান হারিয়ে ছিলেন জনাব গাজীউল হক। জ্ঞান ফিরে পাবার পরেপরেই তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন। এ ঘটনার পর তাঁকে আর ঢাকায় দেখা যায় নাই। ২২শে ফেব্রুয়ারী সকালে গাজীউল হক ময়মনসিংহে ডঃ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর শশুর, সাবেক এম এল এ জনাব আবদুল মজিদ সাহেবের বাড়ীতে স্যুট-কোট পরিহিত অবস্থায় হাজির হন বলে জানা যায়। তারপর বগুড়া শহরে ঘটে তার আবির্ভাব।"

"আরেকজন জনাব এম আর আখতার মুকুল ঐতিহাসিক ২১ ফেব্রুয়ারী আমতলার ছাত্র জনসভার পরপরই তিনি ঢাকা হতে উধাও হন এবং কোলকাতা নগরীতে নিরাপদ আশ্রয়ে কাল কাটান। জনাব শহীদুল্লাহ কায়সারও তার দল কমিউনিষ্ট পার্টির নির্দেশে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্ত হঠাৎ একদিন কমরেড শহিদুল্লা কাযসার কলিকাতা হতে প্রকাশিত কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'দৈনিক স্বাধীনতা' বিক্রি করতে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে আসেন। তাতে ঢাকার পুলিশের গুলির খবর ছিল। অলি আহাদ সাহেব তাঁকে

www.pathagar.com

পত্রিকাগুলিসহ মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল প্রাঙ্গণ হতে বিদায় করেছিলেন। উল্লেখ্য, ভারতীয় পত্রিকা 'স্বাধীনতা' এদেশে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানী ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে-মুসলিম লীগের তরফ থেকে এধরণের প্রচারণা ছিল তখন এন্তার। একমাত্র মেডিক্যাল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি গোলাম মাওলা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলেই অবস্থান করেন এবং আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। কমিউনিষ্ট পার্টির নির্দেশেই বোধহয় ঢাকার উত্তপ্ত রাজপথে ২১শে ফেব্রুয়ারীর রাত হতে জনাব মোঃ তোয়াহা ও আবদুল মতিনকে দেখা যায় নাই।৭ মার্চ "গ্রেফতার দিবস" সন্ধ্যারাতে জনাব তোয়াহা ও আবদুল মতিন আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন, এবং সেই সভাতেই সর্বজনাব সাদেক খান, হেদায়েত হোসেন চৌধুরী, মুজিবল হক ও মীর্জা গোলাম হাফিজের সাথে জনাব অলি আহাদ গ্রেফতার হন। জনাব কাজী গোলাম মাহবুব সভায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়।"

"যুবলীগ সহ-সভাপতি শামসুজ্জোহা, কার্যকরী কমিটির সদস্য শফি হোসেন খান, ডঃ মুজিবর রহমান ও আজগর হোসেনের নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জে ভাষা আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করে। নূরুল আমীন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জবাসীকে উজ্জীবিত করেন যুবলীগের এই অকুতভয় নেতা ও কর্মীরা। নারায়ণগঞ্জ মর্গান হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষায়ত্রী ছিলেন মমতাজ বেগম। মমতাজ বেগমকে ২৯শে ফেব্রুয়ারী গ্রেফতার করা হলে যুবলীগ নেতা শফি হোসেন-এর নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জ শহর অগ্নিস্ফূলিঙ্গে পরিণত হয়। নূরুল আমীন তাঁর গদী রক্ষার্থে ইপিআর বাহিনীর আর্মড কোর নারায়ণগঞ্জের দিকে প্রেরণ করেন। নারায়ণগঞ্জের মানুষ চাষাঢ়া হতে পাগলা পর্যন্ত দীর্ঘ ৬ মাইল রাস্তায় ১৬০টি বটগাছ কেটে ফেলে ইপিআর আর্মড কোরের বিরুদ্ধে অবরোধ সৃষ্টি করে।"

"এতদ্বসত্ত্বেও দানব শক্তির অত্যাচারে গোটা নারায়ণগঞ্জ তছনছ হয়ে যায়। নারায়ণগঞ্জের নির্বাচিত এম এল এ খান সাহেব ওসমান আলীর চাষাঢ়ার দ্বিতল বাড়ী লুণ্ঠিত হয় এবং দৈহিক অত্যাচার আর নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয় পরিবারের সকল সদস্য। এমনকি শ্রদ্ধেয় এম এল এ খান সাহেব ওসমান আলীর উপরেও শারিরীক নির্যাতন চালিয়ে তার কোমর ভেঙ্গে দেওয়া হয়।"

"শেখ মুজিবর রহমান ১৯৫২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী কারামুক্তি পেলেন। কিন্তু ঢাকা নারায়নগঞ্জের আন্দোলনের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে ঢাকায় এলেন না। নেতৃত্ব দিতে বিদ্রোহের অনলেও ঝাঁপ দিলেন না। এমন কি নুরুল আমীনের দানবীয় শাসনের বিরুদ্ধে ৫ই মার্চ দেশব্যাপী যে হরতালের ডাক দেওয়া হয়, শেখ মুজিব সেই হরতালে অংশগ্রহণ করার জন্য ঢাকায় পর্যন্ত আসেন নাই। মারমুখো জনতাকে নেতৃত্ব দান তো দূরের কথা। বরং বাস্তব সত্য এই যে, শেখ মুজিব সে সময়ে কোটালীপাড়ায় নিজ বাড়ীতে মাতা-পিতার স্নেহের আশ্রয়ে-স্বস্তিতে শান্তিতে কাল কাটিয়েছেন। তারপরও মুখপোড়া আওয়ামী লীগ ও ভারতীয় দালাল-চামচারা বলে যে, ১৯৫২ সালে শেখ মুজিব ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ধিক তাদের এই মিথ্যাচারে!"

"ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের রক্তস্নাত ২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র-হত্যার প্রতিবাদ ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীকে প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনে যারা জীবন বাজী রেখে সার্বক্ষণিক রাজপথ

www.pathagar.com

দখল করে রাখেন, এবং আন্দোলন-মুখর লাখো সংগ্রামী জনতাকে নেতৃত্ব দেন, তারা হলেন, মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র আজমল হোসেন, আবদুস সালাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মোঃ সুলতান, পূর্বপাকিস্তান যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক এডভোকেট ইমাদুল্লাহ, আনিসুজ্জামান, নেয়ামাল বাসির, সাহিত্যিক হাসান হাফিজুর রহমান, কাজী আজিজুর রহমান, ডাঃ মঞ্জুর হোসেন, আমীর আলী প্রমুখ যুবলীগের শত শত নেতা-কর্মী। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সে-দিনের ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের আন্দোলন উত্তাল দিনগুলিতে আন্দোলন পরিচালনা ও নেতৃত্ব দেয় মুলতঃ পুর্ব পাকিস্তান যুবলীগ।"

আপোষহীন সংগ্রামী

ঔপনিবেশিক আমল থেকে পাকিস্তান আন্দোলন এবং পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়- সে এক সুবিস্তৃত ইতিহাস। ইতিহাসের এই ধারায় রাজনীতির পথ পরিক্রমায় পরিচালিত হয়েছে বহু আন্দোলন, বহু সংগ্রাম। এই আন্দোলন ও সংগ্রামে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত থেকে অনেকেই নানা ভূমিকা পালন করে গেছেন। কিন্তু আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়, প্রতিটি সংগ্রামের বাঁকে বাঁকে আপোষহীন ভূমিকা পালন করেছেন, তেমন রাজনৈতিক নেতৃত্বের অস্তিত্ব গোটা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুবই বিরল। আজ এখানে তেমনি এক বিরল নেতৃত্ব সম্পর্কে কিছু আলোচনা করছি। তিনি একই সঙ্গে যেমন আপোষহীন তেমনি দৃঢ়চিত্ত। তিনি ছিলেন ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার। নাম তার অলি আহাদ। অলি আহাদ শুধু একটি নাম নয়, অলি আহাদ একটি সংগ্রামের নাম-সংগ্রামী ইতিহাসের একটি অনন্য অভিধা। অনেকেরই হয়ত আজ অজানা যে, মুসলিম লীগের স্বেচ্ছাচারী শাসনের প্রতিবাদে প্রথম আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং পরে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠার পিছনে তার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে পাক-মার্কিন সিয়াটো সেন্টো চুক্তির বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথেও সৃষ্টি হয় অলি আহাদের বিভেদ। অবশ্য মওলানা ভাসানীর অবস্থানকে সমর্থন জানাতে গিয়েই অলি আহাদ সেদিন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে বিরোধে জড়িয়ে যান। কিন্তু শেষপর্যন্ত মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগেই থেকে গেলেন; শেখ মুজিব মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়ে আবার সাধারণ সম্পাদক হলেন; আর অলি আহাদ নীতির প্রশ্নে আপোষহীন থাকার কারণে দল থেকে ছিটকে পড়লেন।

সেই থেকে শুরু হলো আপোষহীনতার পথে অলি আহাদের যাত্রা। রাজনীতি সংগ্রামের দুর্গম গিরি মরু কান্তার, পেরিয়ে তাঁর সেই যাত্রা আজো অব্যাহত। আজো যেখানেই স্বৈরাচারী একনায়ক, কিংবা যেখানেই গণতন্ত্রের নামাবলি গায়ে-দেয়া কোন ফ্যাসিষ্ট শাসক, সেখানেই তাদের গণবিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে অলি আহাদের কণ্ঠ বর্জনির্ঘোষ।

তাঁর সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ' সকল আগ্রাসন আধিপত্যবাদ আর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ছিল এক দ্রোহের বহ্নিশিখা। কিন্তু শাসকদের নগ্ন হস্ত ঐতিহ্যবাহী ইত্তেহাদের প্রকাশনা বন্ধ করে দিতে মোটেও দেরী করে নাই। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দল ও সরকারের পক্ষ থেকে কোন না কোন সময়ে অলি আহাদকে ক্ষমতার ভাগ দেওয়ার প্রলোভনও কম দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তিনি অবলীলায় তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। শেখ মুজিব তাঁর ক্ষমতারোহণের প্রথম পর্যায়েই অলি আহাদকে মন্ত্রিত্বের পদ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমতার হাতছানি কোন সময় অলি আহাদকে তাঁর বিদ্রোহী ভূমিকা থেকে টলাতে পারে নাই। ফলস্বরূপ এমন একটি সরকার ছিলনা, যে সরকার অলি আহাদকে কারাগারে আটক করে নাই।

www.pathagar.com

পরিতাপের বিষয়, বঞ্চনা ও নিষ্পেষণে জর্জরিত দেশের যে কোটি কোটি মানুষের জন্য অলি আহাদ সংগ্রাম করেছেন ও আজো সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, সে খবর রাখে কয়জনে? এ ব্যাপারে অবশ্যই মুল ভুমিকা পালন করার কথা ছিল সাংবাদিক, লেখক ও বুদ্ধিজীবিদের। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা উচ্চকণ্ঠ-তারা তো অনেকেই বিবেক বন্ধক রেখে মহাসুখে কালাতিপাত করছেন। তাদের কল্যাণেই আজ কত নাম না জানা, অখ্যাত, ভুঁইফোঁড় নেতার জীবন কথার নামে কল্পকাহিনী সাজিয়ে পত্র পত্রিকায় প্রতিনিয়ত প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে ও হচ্ছে। প্রতিনিয়ত সাময়িকী ম্যাগাজিনে এদেশের প্রচ্ছদ-কাহিনী ছাপা হচ্ছে কত পাতি নেতা, নর্তকী, গায়িকা ও নায়িকাকে নিয়ে। কিন্তু এ দেশের আন্দোলন সংগ্রামের এক জীবন্ত কিংবদন্তী, সৎ, নির্লোভ, আপোষহীন, প্রচারবিমুখ, দেশপ্রেমিক ও সত্যিকার একজন জাতীয়তাবাদী নেতার ভূমিকা-ভিত্তিক কোন প্রচ্ছদ কাহিনী দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার কথা এযাবত কেউ ভেবে দেখার প্রয়োজনটুকু পর্যন্ত বোধ করেন নাই। রাজনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে অলি আহাদ শুধু একজন রাজনৈতিক নেতাই নন; একজন সফল রাষ্ট্রনায়কের সকল গুণও তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। টগবগে যৌবন থেকে শুরু করে গত অর্ধশতাব্দীকাল রাজনৈতিক অঙ্গনে দৃপ্ত পদচারণায় নীতির প্রশ্নে অটল ও অবিচল থেকে তিনি প্রমাণ করেছেন, নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আরোহণ বড় কথা নয়। বড় কথা হল নীতির প্রশ্নে নিরাপোষ থাকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা; এবং আগামী বংশধরদের জন্য নিরাপদ ভবিষ্যৎ গঠনের স্বার্থে বর্তমানকে অবহেলায় বিসর্জন দেওয়া।

শৈশব, কৈশোর, যৌবন

বাংলাদেশ তথা এ উপমহাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে অলি আহাদের পুস্তক এক অনবদ্য জাতীয় ইতিহাস। "জাতীয় রাজনীতি ৪৫ থেকে ৭৫" নামক এই স্মৃতিকথা মুলক পুস্তকেও তিনি আত্মপ্রচার সযত্নে পরিহার করেছেন। সেই পুস্তক পাঠ করে কেউ তাঁর ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের ঘটনাবলী জ্ঞাত হতে পারবেন না। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় যেটুকু উদ্ধার করা যায়, তা হলো, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার সদর থানাধীন ইসলামপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯২৮ সালে জনাব অলি আহাদের জন্ম। তাঁর পিতা মোঃ আব্দুল ওহাব ছিলেন ডিষ্ট্রিক রেজিষ্ট্রার। ছয় ভাই ও চার বোনের মধ্যে তিনি পঞ্চম। হোমনা ও কুমিল্লা জেলা স্কুলে লেখাপড়া করেছেন। দাউদকান্দি হাইস্কুল থেকে ১৯৪৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হন ঢাকা কলেজে (তদানীন্তন ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজ) বিজ্ঞান বিভাগে। ঢাকা কলেজে ভর্তির পরপরই ঢাকা কলেজ মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এসময়ই তিনি পরিচিত হন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আল্লামা আবুল হাশিমের সাথে। মুসলিম লীগ কর্মী-শিবিরে আগত কর্মীদের উদ্দেশ্যে নিয়মিত ভাষণ দিতেন আবুল হাশিম। ইসলামের নীতি ও আদর্শের ব্যাপারে, বিশেষত পবিত্র কালেমার ব্যাখ্যায় রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনে ইসলামের মূল্যবোধের উপরে জনাব আবুল হাশিমের প্রদত্ত ভাষণ অলি আহাদকে দারুণভাবে আলোড়িত করে। সেই কর্মী সমাবেশেই তাঁর সাথে পরিচয় ঘটে সর্বজনাব শামসুল হক, শামসউদ্দিন আহমদ, কমরুদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, তাজউদ্দিন আহমদ, নঈমউদ্দিন আহমদ ও শওকত আলীর সাথে। এক পর্যায়ে তিনি মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের সাথে জড়িয়ে যান।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক জীবনে জনাব অলি আহাদ পাকিস্তানের জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভাবশিষ্য। এখনো কায়েদে আজমের প্রতি তাঁর অপার শ্রদ্ধা। রাজনীতির পরিমন্ডলে খুব কম রাজনীতিবিদকেই তিনি মনে করেন কায়েদে আজমের সমকক্ষ। জিন্নাহর সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ছাত্র জীবনেই ১৯৪৬ সালে আখাউড়া রেলষ্টেশনে। ৪৬-এর নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সময় কায়েদে আজম এসেছিলেন সেখানে। সেদিন রেলের সেলুন থেকে জানালা পথে আঙ্গুলের ইশারায় তাঁকে ডাকলেন কায়েদে আজম। বুকে তখন মুসলিম লীগের ব্যাজ। তিনি কাছে গেলে কায়েদে আজম তাঁর পরিচয় জেনে নিয়ে বললেন, "Young boy, remember character first. After election rejoin classes" অর্থাৎ "তরুণ বালক, স্মরণ রেখো চরিত্রই প্রথম। নির্বাচনের পর পড়াশুনায় মনোনিবেশ করবে।" কায়েদে আজমের সেই উপদেশ আজো তাঁকে প্রেরণা যোগায়।

অথচ এহেন শ্রদ্ধার পাত্র কায়েদে আজমের মুখের উপরেও অলি আহাদ কথা বলতে ছাড়েন নাই। স্পষ্টভাষায় তাঁর অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদ করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কায়েদে আজমের সাথে দ্বিতীয় বার অলি আহাদের দেখা হয় মিন্টু রোডে (সাবেক গণভবনে)। তখন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী নিয়ে ছাত্র নেতারা কায়েদে আজমের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। তাদের বক্তব্য শুনে কায়েদে আজম বলেছিলেন, "In the interest of the integrity of Pakistan, if necessary, you will have to change your mother tongue." কায়েদে আজমের এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করে অলি আহাদ বলেন, "Sir, Britain, U.S.A. Canada, Austalia & New Zeland speak the same language, preach the same religion, come of the same stock, could they form one state? Despite the same religion, Islam, same language Arabic, same semetic blood, and same land Arab, why are there so many states on Arab land?" এভাবে বিতর্কের এক পর্যায়ে তাঁর দিকে তর্জনী নির্দেশ করে কায়েদে আজম বলেছিলেন। "I know you also." অলি আহাদও সমানতালে জবাব দিয়েছিলেন, "I also know you are the Governor General whom the Queen of England can remove on our appeal."

জীবন্ত স্মৃতি মিনার

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৫২ সালে অলি আহাদের আপোষহীনতার মুখে ছাত্রনেতৃবর্গ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজ অনেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের কৃতিত্বের দাবীদার। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, এই কৃতিত্বের হকদার একমাত্র অলি আহাদ। ইতিহাস আরো সাক্ষ্য দেয়, সেদিন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পরিণামে ২১শে ফেব্রুয়ারী আজ হয়েছে শহীদ দিবস; সৃষ্টি হয়েছে জাতীয় শহীদ মিনার। এমন কি সেই ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আজকের স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। দুঃখের বিষয়, সেই অলি আহাদকে এ পর্যন্ত কোন সরকারই একুশে পদক কিংবা অনুরূপ কোন রাষ্ট্রীয় পদকে সম্মানে ভূষিত করার মত মানসিক উদারতা প্রদর্শন করতে পারে নাই। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের নিরপেক্ষ ভাবে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে একথাই বলতে হয় যে, সেদিনের বিদ্রোহের দাবানলে সালাম, বরকত, রফিকদের আত্মত্যাগের স্মৃতিস্মারক

www.pathagar.com

যদি হয়ে থাকে পাথরে নির্মিত জাতীয় শহীদ মিনার, তাহলে অলি আহাদ হলেন সেই ২১শে ফেব্রুয়ারীর জীবন্ত স্মৃতি মিনার।

উল্লেখ্য, ভাষা আন্দোলনে অলি আহাদের ভূমিকা ভিত্তিক একটি অনুষ্ঠানের ভিডিও চিত্র ধারণের পরও তা টিভিতে প্রচার করা হয় নাই। দুঃখজনক এই ঘটনাটি ঘটেছিল বেগম খালেদা জিয়া প্রথম প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে। অবশ্য পরে বিরোধী দলের নেত্রী হিসাবে বেগম খালেদা জিয়া অলি আহাদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে আসেন এবং তাকে 'জাতির বিবেক' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। খালেদা জিয়া আবারও দেশের প্রধান মন্ত্রীর আসন অলংকৃত করেছেন। জীবন সায়াহ্নে অলি আহাদের মত সংগ্রামী নেতাকে কোন না কোন ভাবে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করার মত উদারতা কি খালেদা জিয়ার জোট সরকার দেখাতে পারবে ?

অলি আহাদ ঃ রাজনৈতিক সংগঠক

সমকালীন রাজনৈতিক অঙ্গনে যে নৈতিক ও আদর্শিক ধস নেমেছে তাতে লাখ লাখ টাকা ছাড়া রাজনৈতিক সংগঠন চালানো দুষ্কর। টাকা ছাড়া কোন একটা সভা সমাবেশ তো দূরের কথা, একটি কর্মীসভাও করা সম্ভব হয় না। রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে এখন ত্যাগ ও আদর্শের মনোভাব ও প্রভাব বলতে গেলে অনুপস্থিত। এই অবস্থায়, আজ যখন রাজনীতিতে টাকার খেলা, চাঁদাবাজি, অর্থের উৎস-চিন্তা অপরিহার্য বাস্তব, তখন প্রবীণ রাজনীতিবিদ অলি আহাদের নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক দল টিম টিম করে তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। সত্যি বলতে কি, অলি আহাদের নীতি আদর্শের অনুসারী কতিপয় সংগ্রামী নেতা-কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগেই আজো সংগঠনটি টিকে আছে। অলি আহাদের যে পরিচিতি, এবং তাঁর বন্ধুত্বের যে পরিধি, তাতে তিনি সেভাবে চাইলে বা যোগাযোগ করলে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান যে করতে পারেন না, তা নয়। কিন্তু নীতির প্রশ্নে অটল অলি আহাদ মনে করেন, যে শোষক ও লুটেরাদের বিরুদ্ধে তিনি চিরদিন আপোষহীনভাবে লড়ে যাচ্ছেন, সেই গোষ্ঠীর কারো কাছে দলের জন্য অর্থ সাহায্য চাওয়া মানেই নিজেকে আদর্শ থেকে বিচ্যুত করা। ইতিহাস সাক্ষী, পাকিস্তানের ইস্কান্দার মীর্জা, আইয়ুব, মোনায়েম থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশের মুজিবী দুঃশাসনের আমলেও অলি আহাদ বারবার কারান্তরালে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। ৮২ সালে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদ তাঁকে পরপর ছ'বার জেলে নিয়ে এক্ষেত্রে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। এই সময় একবার জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে অলি আহাদ আমার বাসায় এসেছেন। আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে বসলেন, "আবার কবে জেলে যাচ্ছেন।" একটু থমকে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠেছিলেন অলি আহাদ। জীবনে ১২ বছর কারাভোগ ছাড়াও বছরের পর বছর আত্মগোপনে কাটাতে হয়েছে অলি আহাদকে। জিয়াউর রহমানও তাঁকে গ্রেফতার করেছিলেন, কিন্তু পরদিনই মুক্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, শেখ মুজিব সর্বমোট ৮ বৎসর ২ দিন জেল খেটেছিলেন। অথচ তিনি নিজে দাবী করে গেছেন এবং অন্যেরাও বলে বেড়াচ্ছেন যে, তিনি নাকি মোট ১৪ বছর কারান্তরালে ছিলেন। এই দাবী মোটেও সঠিক নয়।

সামরিক ট্রাইবুন্যালে অলি আহাদ

৮২-এর পর অলি আহাদ একমাত্র রাজনৈতিক নেতা যাঁকে এরশাদের সামরিক সরকার বিশেষ সামরিক ট্রাইবুন্যালে বিচারের সম্মুখীন করেছিল। সে দিন সামরিক আদালতে দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

অলি আহাদ অকুতোভয়ে সামরিক শাসনের বিরোধিতা করে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে কোন সংগ্রামী নেতা ও কর্মী সেই বিবৃতি থেকে প্রেরণা লাভ করতে পারেন। আগেই বলেছি, অলি আহাদের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ' ছিল ছাপার অক্ষরে এক জীবন্ত দ্রোহ। এই নিবন্ধ লেখক ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক থাকা অবস্থায়, সম্পাদকের অনুমতিক্রমে দীর্ঘকাল ইত্তেহাদে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখেছিলেন। উল্লেখ্য যে, ইত্তেহাদের সম্পাদকীয় কলামের উপরে ছাপা হতো বিদ্রোহের সেই অগ্নিবাণী ঃ "অসত্যের কাছে নত নাহি হবে শির, ভয়ে কাঁপে কাপুরুষ লড়ে যায় বীর।" এই বাণী সম্পাদকীয় নিবন্ধের উপরে শুধু মুদ্রিতই থাকতোনা, ইত্তেহাদের প্রতিটি পৃষ্ঠায় প্রতিটি ছত্রে এই ঘোষণার বাস্তব প্রতিফলন ঘটতো। যাহোক ১৯৮৪ সালের ৮ই অক্টোবর ৭নং সামরিক আদালতে প্রদত্ত অলি আহাদের সেই ঐতিহাসিক জবানবন্দীর একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃতি করা হলো ঃ-

"আমার বিবেক আর আজীবন রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের কাছে বিশ্বস্ত থেকে আমি বলতে চাই যে, তাত্ত্বিক কিংবা আদর্শগত কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই সামরিক আইন প্রশাসন আমার কাছে গ্রহনীয় নয়, যিনিই এটা জারী করুন না কেন; হোন তিনি জেনারেল আইয়ুব, অথবা জেনারেল ইয়াহিয়া অথবা লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান অথবা মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুর কিংবা লেঃ জেঃ এইচ, এম, এরশাদ। বিচারাসনে উপবিষ্ট হওয়া মাননীয় আদালতের ক্ষমতার উৎস হচ্ছে ১৯৮২ সনের ২৪ শে মার্চের মার্শাল ল প্রক্লামেশন। যেহেতু সামরিক আইন একটি বাস্তবতা; সেহেতু আমাকে মাননীয় আদালতকে মানতে হয়। আধুনিক ইতিহাস রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে জেনারেলদের অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছে। তাদের শাসন তাদের স্ব স্ব দেশ ও জনগণের জন্যে বয়ে এনেছে বিপর্যয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, নবাব সিরাজুদ্দৌলার সেনাপতি মীর জাফর আলী খান বাংলাকে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করার জন্য দায়ী। এই শৃংখলের পথ ধরেই ভারত ১৯০ বছর ধরে পরাধীনতার শৃংখলে শৃংখলিত হয়। নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ফ্রান্সের বিপর্যয় ডেকে আনে। জার্মানীর হিটলার সভ্যতাকে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করে। গণতান্ত্রিক সিস্টেমেও জেনারেলদের শাসন আকর্ষণীয় কিছু নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল আইসেন হাওয়ার (আইখ) সোভিয়েত রাশিয়ার আকাশে ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান পাঠিয়ে '৬০ সনে প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্র প্রধানদের শান্তি-সম্মেলন বিপর্যস্ত করে ফেলেন। জাপানের জেনারেল তোজো তার দেশকে উপহার দিয়েছেন পরাজয় আর বিপর্যয়। সাম্প্রতিক কালের সমর-নায়কদের শাসনের ইতিহাসও চরম ব্যর্থতার আলেখ্য। জেনারেল আইয়ুব, আর্জেন্টিনার জেনারেল গলতিয়ারী, বার্মার জেনারেল নেউইনের শাসন এই নির্মম বাস্তবতারই প্রমাণ বহন করে।"

আন্দোলনের পুরোধা

অলি আহাদ মুসলিম লীগ সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের পুরোধা কর্মী ছিলেন। তিনি ছিলেন পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তীকালে নীতির প্রশ্নে আপোষহীনতার কারণে তিনি ছাত্র লীগ এবং আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেন। কালের পরিক্রমায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত ছাত্র লীগেরই আপোষহীন সংগ্রামী ভূমিকা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

বস্তুতঃ ধাপে ধাপে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তার প্রতিটি পর্যায়ে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছেন অলি আহাদ। সবাই জানেন, ১৯৭১ সালে শেখ

www.pathagar.com

মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণায় দোদুল্যমানতা প্রদর্শন করেছিলেন। এমনকি ৭ই মার্চের ভাষণেও সুস্পষ্ট কিছু বলেন নাই। অথচ ৬ই মার্চ, ১৯৭১ ন্যাশনাল লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে অলি আহাদ নির্বাচিত পরিষদ সদস্যদের প্রতি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র ঘোষণার এবং প্রয়োজনে স্বাধীনতাকামী সকল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহবান জানান। বাংলা ন্যাশনাল লীগের ছাত্র সংগঠন ফরোয়ার্ড ষ্টুডেন্টস ব্লক মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা চলাকালে যে প্রচারপত্র ছেড়েছিল, তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল "আপোষের চোরাবালিতে বাংলার এ স্বাধীনতার উদিত সূর্য যেন মেঘাচ্ছন্ন না হয়।"

এছাড়াও ফরোয়ার্ড ষ্টুডেন্টস ব্লক "তোমরা আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব" নেতাজী সুভাষ বোসের এ উক্তি সম্বলিত ব্যাজ বিতরণ করে। এতেও "মুক্তিফৌজ গঠন করো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো" শ্লোগান উৎকীর্ণ ছিল। এর আগে ১৯৭০ এর ৪ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানের জনসভায় মওলানা ভাসানীসহ বক্তৃতাকালে এবং ৫ই ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় সমাবেশে ভাষণদান কালে অলি আহাদ স্বাধীনতা ঘোষণার দাবী জানান। ১৯৭১ এর ৬ই মার্চ পল্টনের সমাবেশে শেখ মুজিবের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, "মুজিব ভাই, আপনি স্বাধীনতা ঘোষণা করুন। আমরা দেশবাসী আপনার সাথে আছি।"

অলি আহাদসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা ও দল যখন অবিলম্বে স্বাধীনতা ঘোষণার দাবী জানাচ্ছিলেন, তখন শেখ মুজিব তার দলবলসহ ইয়াহিয়া খানের সাথে শর্ত সাপেক্ষে আপোষ আলোচনায় ছিলেন ব্যস্ত। কিন্তু স্বাধীনতার পরে দেখা গেল শুধু আওয়ামী লীগ একাই স্বাধীনতার সকল কৃতিত্ব দাবী করছে। শুধু তাই নয়, তাদের উপরে পাক হানাদারদের নির্যাতনের নানা কল্পিত কাহিনী প্রচার করে তারাই যে সে সময়ে দেশবাসীর একমাত্র নেতৃত্বে ছিল, শতমুখে সেই দাবী প্রচার করে চলেছে।

এদিকে সিদ্দিক সালেকের Witness to Surrender পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে, ২৫শে মার্চ Operation Search Light চলাকালে যাদেরকে জীবিত বা মৃত গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সেই তালিকায় অলি আহাদ ছিলেন নবম ব্যক্তি। তিনি তাঁর সহগামীদের নিয়ে সীমান্ত পার হয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধে তাদের নেতৃত্ব দেন। যদিও সেই অবস্থায় আওয়ামী লীগ সব সময়ই অলি আহাদ এবং তাঁর অনুসারীদের কোনঠাসা করার চেষ্টা করেছে।

আজাদ বাংলা আন্দোলন

স্বাধীনতার পর ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান অলি আহাদ। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারীতে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের দাবী জানান তিনি। ২৫ সালা গোলামী চুক্তির বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। বাংলাদেশের পুতুল সরকার ও আগ্রাসী ভারতের বিরুদ্ধে আজাদ বাংলা কায়েমের ডাক দিয়ে তিনিই প্রথম আন্দোলন শুরু করেন।

১৯৭২ সালের ১৭ই মার্চ ইন্দিরা গান্ধী ঢাকা সফর করেন এবং ১৯ মার্চ ভারত বাংলাদেশ ২৫ বছর মেয়াদী তথাকথিত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের পরদিনই ২০ শে মার্চ ১৯৭২ চট্টগ্রামে জেলা জাতীয় লীগের কর্মী সম্মেলনে এবং ২২ শে মার্চ লালদিঘী মাঠের জনসভায় অলি আহাদ এ চুক্তিকে গোলামীর চুক্তি হিসাবে অভিহিত করে এই চুক্তি বাতিলের দাবী জানান। কিন্তু ওই চুক্তি বাতিল না করে বরং মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই ২৭শে মার্চ

www.pathagar.com

মুজিব সরকার ভারত-বাংলাদেশ অবাধ সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির বিরুদ্ধে অলি আহাদ ১৯৭৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর সারা দেশব্যাপী 'আজাদ বাংলা দিবস' পালনের ডাক দেন এবং পল্টনে জনসভার কর্মসূচী ঘোষণা করেন। কিন্তু ২২শে ডিসেম্বরই আসে তাঁর জন্য এক চরম দুঃসংবাদ। তাঁর অভিভাবকতুল্য বড়ভাই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অধ্যাপক ডঃ আব্দুল করিম ইন্তেকাল করেন। তাঁকে অলি আহাদের ভাই হবার অপরাধে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ না দিয়ে তাঁর জুনিয়ারকে সে পদে নিযোগ দেয়া হয়েছিল। ২৩শে ডিসেম্বর অগ্রজের জানাজা পড়ে লাশ কবরে শায়িত করে বেদনাবিধুর মন নিয়েও অলি আহাদ পল্টন ময়দানে নির্ধারিত জনসভার মঞ্চে এসে হাজির হন এবং মুজিবী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তব্য রাখেন।

একইভাবে ১৯৭৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর বিশেষ ক্ষমতা আইনের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেন এবং এই নিবর্তন মূলক আইন বাতিলের দাবী জানান। তাঁর এই সাহসী ভূমিকাই অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে আন্দোলনমুখী চেতনা জাগ্রত করতে সহায়তা করে। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালের ১৪ই এপ্রিল গঠিত হয় সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্ট এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন বাংলা জাতীয় লীগের ৬৩, বিজয় নগরস্থ অফিসকেই সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্টের অফিস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ২৩শে এপ্রিল পল্টনে অনুষ্ঠিত হয় ঐক্যফ্রন্টের জনসভা। জনসভায় বিপুল জনসমাগম হয়। এতে ক্ষমতাসীন মুজিব সরকারের টনক নড়ে। সরকার দেশের সকল বড় বড় শহরে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে-যাতে বিরোধী দল কোন সমাবেশ করতে না পারে। ঐক্যফ্রন্ট ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে বিভিন্ন এলাকায় কর্মীসভা করে আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

সরকারের জরিমানা ঃ ১৫ স্বর্ণমোহর

২রা জুন, ৭৪ ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঐক্যফ্রন্টের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সরকার ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার না করলে বা মেয়াদান্তে তা পুনঃপ্রবর্তন করলে ৩০শে জুন ১৪৪ ধারা অমান্য করা হবে। সরকার ২৫শে জুন থেকে পুনরায় ১৪৪ ধারা বহাল করলে অলি আহাদ ২৮শে জুন এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রীট আবেদন পেশ করেন। ৩০ শে জুন তারিখে সরকার অলি আহাদকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটকাদেশ দিয়ে কারাগারে পাঠায়। মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করলেও কারাগারের পরিবর্তে সন্তোষের বাড়ীতে গৃহবন্দী করে রাখে। ৯ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের রায়ে ১৪৪ ধারা জারীর আদেশকে অবৈধ ঘোষণা করা হয় এবং মহামান্য আদালত আবেদনকারী অলি আহাদকে মামলার খরচ বাবদ ১৫টি স্বর্ণমোহর প্রদানের নির্দেশ দেন।

বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ ওই ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেছিলেন। অলি আহাদ তখন কারাগারে, মওলানা ভাসানী গৃহবন্দী। এই ফাঁকে সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতারা ঘোষিত ওয়াদা থেকে সরে গেলেন এবং ঐক্যফ্রন্টের ব্যানার গুটিয়ে নিজ নিজ দলের ব্যানারে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করে দিলেন। ঐক্য ভেঙ্গে যাওয়ায় মুজিব সরকার হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বাংলা জাতীয় লীগ অলি আহাদসহ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ও মুক্তির দাবীতে ১৭ নভেম্বর পল্টন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করে এবং এটাই ছিল মুজিব আমলের সর্বশেষ বিরোধী

www.pathagar.com

দলের জনসভা। এরপর পল্টনে শুধু নয় কোথাও কোন জনসভা হতে পারে নাই। কেননা এরপর ২৮ ডিসেম্বর, '৭৪ জারী করা হয় জরুরী অবস্থা। আর গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়া হয় ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারী সব দল ও সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করে একদলীয় বাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। চীফ হুইপ শাহ মোয়াজ্জেমের উত্থাপিত শাসনতন্ত্রের ৪র্থ সংশোধনী বিল ১১ মিনিটের মধ্যে ক্রুট মেজরিটির জোরে কোন সমালোচনার তোয়াক্কা না করেই পাশ করা হয় এবং সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে একদলীয় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। শেখ মুজিবকে 'যেন তিনি নির্বাচিত' হিসাবে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করা হয়।

কি বিচিত্র এই দেশ! সেই আওয়ামী লীগ আজ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক হিসেবে নিজেদের কৃতিত্ব দাবীদার! অথচ বাকশাল ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ উল্লাহ্‌কে তারা সে দিন অপেক্ষারত একটি বিদেশী প্রতিনিধি দলকে সাক্ষাৎদানের জন্য মাত্র ১৫ মিনিট সময় পর্যন্ত দিতে রাজী হয় নাই। এমনকি কোন আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে বঙ্গভবন কিংবা সংসদ ভবনে শপথ গ্রহণের সময় দিতে কিংবা ধৈর্যধারণের সৌজন্যটুকু পর্যন্ত প্রদর্শন করতে পারে নাই। সংসদের লবীতেই শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করানো হয়। শুরু হয় নতুন শ্লোগানঃ "এক নেতা এক দেশ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ।"

বাকশাল এবং অতঃপর

বাকশাল আমলে উন্মোচিত হলো নীতিহীন রাজনীতিবিদ কবি সাহিত্যিক অধ্যাপক বুদ্ধিজীবদের আর এক চরিত্র। প্রবীন নেতা আতাউর রহমান খান, হাজী দানেশ সহ বহু নেতা বাকশালে যোগদানের অনুমতি চেয়ে মুজিব বন্দনার নয়া রেকর্ড সৃষ্টি করলেন। ব্যতিক্রমদের তালিকায় শীর্ষে থাকলেন অলি আহাদ। জেলের ভেতরেও তাঁকে প্রলুব্ধ করা হয়েছে ক্ষমতার প্রতি, কিন্তু তিনি ছিলেন অনড়। অন্যদিকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের বুলি কপচানো কবি সাহিত্যিক অধ্যাপক বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক কলামিষ্টরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন বাকশালে যোগ দিতে। মাত্র গুটিকয়েক সাংবাদিক সেদিন চরম চাপের মুখেও অনড় থেকেছেন। বাকশালে যোগদান না করে তাঁরা এদেশের সাংবাদিকতার সংগ্রামী ঐতিহ্যকেই সমুন্নত রেখে গেছেন। সেদিন যে সব সাংবাদিক,কলামিষ্ট, বুদ্ধিজীবী দল বেঁধে মুজিব বাকশালে যোগদান করেছিলেন, তাদের তালিকা অলি আহাদের "জাতীয় রাজনীতি ৪৫ থেকে ৭৫" পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এদেশের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই পুস্তকটি একটি বিশ্বস্ত দলিল। যাহোক, এভাবেই সেদিন মাঠে একদলীয় আওয়ামী বাকশালী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কোন সুযোগ রইলো না, আর সাহসী কণ্ঠ অলি আহাদ তখন বন্দী হয়ে রইলেন অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠে।

গোটা দেশ জুড়ে শুরু হল খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, লুণ্ঠন আর সন্ত্রাস। শুরু হল দুর্ভিক্ষে অনাহারে মৃত আদম সন্তানের লাশের মিছিল। প্রতিবাদ করার সব গণতান্ত্রিক পথ রুদ্ধ। সারাদেশ যেন এক ভয়াল মৃত্যুপুরী। এমনি সময়ে ১৫ই আগষ্টের সুবেহ সাদেকের সময়ে ইথারে ভেসে এল সমকালীন বিশ্ব ইতিহাসের অমিত ক্ষমতাধর শাসক শেখ মুজিবের পতনের ঘোষণা। গোটা দেশ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল। কারণ মুজিবের পতন যেমন ছিল অবিশ্বাস্য তেমনি দুর্ভাগ্যজনক ছিল তাঁর পতনের প্রক্রিয়াটি। প্রচন্ড ক্ষোভের ঘূর্ণিঝড়ে শেখ

www.pathagar.com

মুজিব একা নন, তার গোটা পরিবার, তার বংশধারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। ১৫ই আগষ্টের পর অলি আহাদ সহ অন্যান্য রাজবন্দীগণ মুক্তি পেলেন কারান্তরাল থেকে। এর পরের ইতিহাস কম বেশী সবারই জানা।

উল্লেখ্য, ১৫ই আগষ্ট ৭৫-এর পর বাংলাদেশ সত্যিকারের স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্থান করে নিল বিশ্ব দরবারে। একে একে মুক্ত হলো সংবাদপত্রসমূহ। ইত্তেফাকসহ অন্যসব সংবাদপত্র মালিকরা ফিরে পেলেন নিজ নিজ মালিকানা। এই নিবন্ধের লেখক বাকশালে যোগদান না করায় ইত্তেফাক থেকে চাকুরিচ্যুত হয়েছিলেন। আবার তিনি ইত্তেফাকে অধিষ্ঠিত হলেন। বাকশাল আমলে পত্রিকা বন্ধ হওয়ার কারণে শতশত সাংবাদিক চাকুরী হারিয়ে সেদিন পথে পথে ঘুরেছেন। বাকশালে যোগদান করেও তারা কেউ রেহাই পান নাই। আজও এদেশে ১৬ জুন সংবাদপত্র জগতে 'কালো দিবস' হিসাবে পালিত হয়ে থাকে। ওই তারিখেই শেখ মুজিবের বাকশাল সরকার সংবাদপত্র কুক্ষিগত করে। যাহোক, ১৫ আগস্টের পর নিষিদ্ধ ঘোষিত সব দল নিজ নিজ ব্যানার ফিরে পেলো। ৩রা নভেম্বর ঘটলো পাল্টা অভ্যুত্থান। ইত্যবসরে জেলখানায় নিহত হলেন স্বাধীনতা যুদ্ধকালের ৪ নেতা তাজুদ্দীন, সৈয়দ নজরুল, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান। ৭ই নভেম্বর বন্দী সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে সিপাহী জনতা মুক্ত করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করলো। স্বীয় মা ভাইয়ের অতি উৎসাহের খেসারত দিয়ে প্রাণ হারালেন পাল্টা অভ্যুত্থানের নেতা জেনারেল খালেদ মোশাররফ। বাকশালের পেট থেকে সিজারিয়ান অপারেশন করে আওয়ামী লীগকে নবজন্ম দিলেন জিয়া। শেখ হাসিনাকে প্রবাস থেকে ফিরে আসার সুযোগ ও তিনি করে দিলেন। শেখ হাসিনা দেশে ফিরে এলেন ১৭ই এপ্রিল '৮১, আর জিয়া নিহত হলেন ৩০ মে, চট্টগ্রামে। এরপর এরশাদ কিভাবে ক্ষমতা দখল করলেন, তা কম বেশী সবার জানা। আজ ১৫ই আগষ্টের পট-পরিবর্তনের নায়করা মৃত্যুর মুখোমুখি; অথচ তাদের জানবাজির ফল ও ফসল ভোগীরা তাঁদের সপক্ষে একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করার নৈতিক সাহস পর্যন্ত প্রদর্শন করতে পারছেন না। রাজনীতির খেলা সত্যি বড় বিচিত্র !

শুরুতে জাতীয় কবির যে কবিতা দিয়ে এই লেখা শুরু করে ছিলাম, সেই ধামাধরা - জামা ধরাদের চির 'বিরোধী হচ্ছেন অলি আহাদ। 'হতাশা' আর 'আপোষ' এ দুটি শব্দ তাঁর রাজনৈতিক অভিধানে নাই। পবিত্র হাদিসে আছে,'জালিম সরকারের মুখের উপর হক কথা বলা উত্তম জেহাদ।' আমাদের তোষামোদী আর আপোষ কামীতার রাজনীতিতে অলি আহাদকে যদি 'মর্দে মোজাহিদ' বলি, ভুল বলা হবেনা। দেখা যায়, ক্ষমতায় যে সরকারই থাকুক, সে সরকারের যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যরা চুপ থাকলেও তিনি প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন। শাসকগোষ্ঠীর যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রকাশে তিনি আজো দ্বিধাহীন ও অকুণ্ঠ। তিনি বিশ্বাস করেন, জনতার মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটবেই।

উপসংহার

ক্ষমতার রাজনীতিতে দৃশ্যতঃ অলি আহাদ সফল নন। কিন্তু গণমানুষের কল্যাণে জাতির ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের ভূমিকা বিশ্লেষণে তাঁর সফলতা ঈর্ষনীয়। আগেই বলেছি, একজন রাষ্ট্রনায়কের যে গুণাবলী থাকার কথা তার সবটুকুই তাঁর চরিত্র ও চিন্তায় বিদ্যমান। তাঁর সান্নিধ্যে একঘন্টা কাটাতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ে একমাস পাঠ নেয়ার জ্ঞান অর্জন করা যায়।

www.pathagar.com

তাঁর মুখ নিঃসৃত প্রতিটি বাক্যেই রয়েছে অনুসন্ধিৎসু মনের চিন্তা ও সৃষ্টিশীল রচনার অবিমিশ্র উপাদান। বিশ্ব রাজনীতির প্রতিটি ঘটনা শুধু তাঁর নখদর্পনে নয়, চলমান ঘটনাবলীর ব্যাপারে তার বিজ্ঞ-বিশ্লেষণও সত্যি চমৎকার। দেশীয় সংবাদপত্র পাঠের পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা দৈনিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিন তিনি গভীর মনযোগ দিয়ে নিয়মিত পাঠ করেন। জাতিকে নেতৃত্ব দিতে হলে যে জ্ঞানস্পৃহা থাকা অপরিহার্য জীবনসায়াহ্নে এসেও অলি আহাদের মধ্যে আজো সেই জ্ঞানস্পহা অপররিসীম। বলতে দ্বিধা ও সংকোচ দুটাই বোধ করছি যে, অলি আহাদের সাথে আমার যে সহমর্মীতা তা তাঁর রাজনীতিতে নয়, বরং তাঁর ব্যক্তি জীবনের সততা ন্যায়নিষ্ঠা অমায়িক সৌজন্যমূলক ব্যবহারে এবং বিশেষতঃ এই জ্ঞানস্পৃহার ক্ষেত্রেই। আল্লাহ্ তাঁর হায়াত আরো দারাজ করুন এবং জাতির বিবেক হিসাবে তাঁকে আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের তওফিক এনায়েত করুন, আমিন!

[আখ্তার-উল্ আলমঃ- সাবেক রাষ্ট্রদূত, বিশিষ্ট কলামিষ্ট, উপদেষ্টা সম্পাদক দৈনিক ইত্তেফাক]

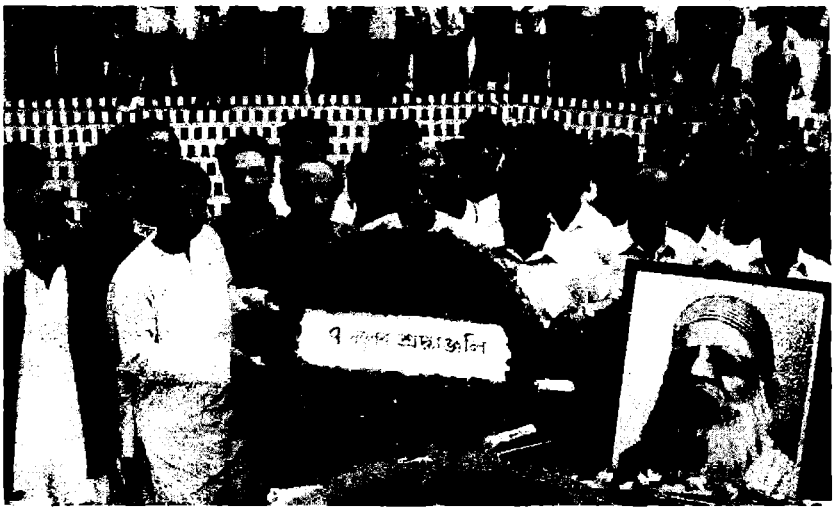

মহান স্বাধীনতা দিবসে (২০০২) জাতীয় স্মৃতিসৌধে অলি আহাদের নেতৃতাধীন ৭ দলের পক্ষে পুস্পস্তবক অপর্ন করছেন। বা থেকে সর্বজনাব আইনুল ইসলাম, মুন্সী আবদুল মজিদ, ইফতেখার করিম মামুন, মীরাজ আব্বাসী, আজিজুল হক মুক্ত, সাইফুদ্দিন আহমেদ মনি, আলাউদ্দিন দেওয়ান, আবুল হাশেম, মোহাম্মদ নাসির, নূরুল ইসলাম হাওলাদার প্রমুখ।

www.pathagar.com

উজান স্রোতের আপোষহীন দুঃসাহসী মাঝি

আবদুল গফুর

নতুন প্রজন্মের কাছে তিনি প্রায় অপরিচিত একটি নাম। অপরিচিত হবারই কথা। তিনি কোন মন্ত্রী-মিনিস্টার নন। কোন বড় দলের নেতাও নন। হতে পারতেন সবই। তাঁর ছেলের বয়সী অনেকেও মন্ত্রী হয়েছে, মিনিস্টার হয়েছে। বড় দলের নেতা হয়েছে। কিন্তু তিনি পারেন নি। কেন পারেন নি, তাঁর সম্বন্ধে বলতে গেলে, সেটাই বলতে হয় প্রথমে। ফিরে তাকাতে হয় তাঁর ৭৪ বছরের দীর্ঘ জীবনের দিকে।

জন্মেছিলেন ১৯২৮ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। মুসলমানদের মধ্যে যখন শিক্ষার হার একেবারেই নগণ্য, তখনও তাঁর পরিবারের খ্যাতি ছিল শিক্ষিত পরিবার হিসাবে। এখনও তাঁর নিকটজনদের প্রায় সকলেই মেধা, যোগ্যতা ও উচ্চ শিক্ষার সুবাদে সমাজে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি নিজেও ছাত্র জীবনে রেখেছেন মেধার স্বাক্ষর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালে কারাজীবন তাঁর প্রায় নিত্যসঙ্গী হওয়ার পরও তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে বি.কম পাশ করেন। রাজনৈতিক কারণে তাঁকে এম কম এ ভর্তির অনুমতি দেয়া হয়নি। হলে, তিনি এম.কম পরীক্ষায়ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতেন। রাজনীতিতে জড়িয়ে না পড়লে সি এস পি হয়ে প্রশাসনের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া, অথবা ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হওয়া তাঁর জন্য কোন ব্যাপারই ছিল না।

কিন্তু সে পথে তিনি যাননি। তিনি বেছে নিয়েছিলেন রাজনীতির পথ। রাজনীতিরও গতানুগতিক পথে থাকলে সামাজিক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ কোনটাই তাঁর জন্য কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁর ছিল ব্যতিক্রমী ভূমিকা। রাজনীতিকে অন্যান্য অধিকাংশের মত তিনি প্রতিষ্ঠালাভের হাতিয়ার করতে চাননি। চেয়েছেন শোষিত, বঞ্চিত মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনীতি করতে। চেয়েছেন ক্ষমতার রাজনীতির গতানুগতিক ধারার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে জাতির মুক্তি ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠির কল্যাণের স্বার্থে আজীবন সংগ্রামী পথে চলতে।

তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন ছাত্র জীবনেই। চল্লিশের দশকে আর দশজন মুসলমান ছাত্রের মত তিনিও জড়িত হয়ে পড়েন পাকিস্তান আন্দোলনে। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মন প্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন একটি স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। এই সুবাদেই তিনি সংস্পর্শে আসেন বিপ্লবী রাজনীতিবিদ আল্লামা আবুল হাশিমের। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নব গঠিত রাষ্ট্রের কর্ণধারদের আচরণে স্বাভাবিক কারণেই মর্মাহত হন তিনি। শুরু হয় সংগ্রামের নতুন পর্যায়। ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই। এরপর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলন, স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, সব শেষে পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ সকল আন্দোলনেই ছিল তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা।

www.pathagar.com

নয় মাসের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের পর অবশেষে একদিন এলো একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর। নতুন করে স্বাধীনতা এলো জাতির জীবনে-জন্ম নিলো স্বাধীন বাংলাদেশ। এবার কি ইতি হল তাঁর সংগ্রামের ? না, ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে যায় আধিপত্যবাদী ভারতের চক্রান্তে এদেশের কিছু সেবাদাসের যোগসাজসে লাখো শহীদের রক্তের মূল্যে অর্জিত এ স্বাধীনতা মিথ্যা, অর্থহীন করে দেয়ার এক নতুন ষড়যন্ত্র। আবার তিনি নামলেন রাজপথে, ডাক দিলেন নতুন সংগ্রামের। দেশে তখন চলছে শেখ মুজিবের শাসন। সেই শেখ মুজিব-যাঁর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তান আমলে অংশ নিয়েছেন ভাষা আন্দোলনে, স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলনে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এবং এসবের পরিণামে যার সাথে একযোগে কারাভোগ করেছেন, তাঁর প্রিয় সেই মুজিব ভাইয়ের শাসনামল। ভাগ্যের পরিহাস তিনি তার স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর প্রিয় মুজিব ভাইয়ের শাসনামলেই নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে। অবশেষে এলো পচাত্তরের পট পারিবর্তন। মুক্তি পেলেন কারান্তরাল থেকে। সবার সাথে তিনিও মুক্তি ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু এবার কি অবসান হলো তাঁর সংগ্রামের ? ১৫ আগষ্টের স্বস্তি আর ৭ নভেম্বরের মুক্তি উল্লাসের রেশ কাটতে না কাটতেই আধিপত্যবাদী চক্রান্তে প্রাণ দিতে হল প্রেসিডেন্ট জিয়াকে। দেশে আবার ফিরে এল সামরিক শাসনের অভিশাপ। শুরু হলো জেনারেল এরশাদের সেনাপতি শাসন। সুতরাং আবার রাজপথে নামলেন তিনি।

সে সংগ্রামেরও অবসান হলো একদিন। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর গণ-আন্দোলনের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হলেন সামরিক ডিক্টেটর জেনারেল এরশাদ। ১৯৯১ সালে দেশে শুরু হল গণতন্ত্রের নতুন অভিযাত্রা। এরপর থেকে দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের মারফৎ সরকার গঠনের এ স্তরেও কিন্তু তাঁর সংগ্রামের ইতি হয়নি। দেশে এখন অবাধ নির্বাচনের মারফৎ সরকার পরিবর্তনের পালা শুরু হলেও দেশ থেকে দুর্নীতি, সন্ত্রাসের মূলোচ্ছেদ সম্ভব হচ্ছে না। সরিষার মধ্যেই যেখানে ভূত, সেখানে ভূত কিভাবে দূর হবে ? তা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী অপশক্তির কাছে নতি স্বীকার করে না, শাসকদের মধ্যে এমন নিরাপোষ মনোভাবই বা কে কতটা দেখাতে পারছেন ? সুতরাং ৭৪ বছরের এ বৃদ্ধ জননেতাকে আজও রাজপথেই দেখা যাচ্ছে যথাসাধ্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে।

জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন বিভিন্ন আন্দোলনে। সম্পৃক্ত হয়েছেন বহু সংগঠনের সাথে-মুসলিম লীগ, গণ আজাদী লীগ, ছাত্র লীগ, যুব লীগ, আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, জাতীয় লীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তরঙ্গ সম্পর্কে এসেছেন অনেক নেতার এ, কে, ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম, আতাউর রহমান খান, কমরুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, মাহমুদ আলী, শেখ মুজিবুর রহমান, খন্দকার মোশতাক আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, কমরেড আবদুল মতিন, আবদুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ। কিন্তু এদের কম জনের প্রতিই তিনি শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা বজায় রাখতে পেরেছেন। কারো প্রতি তিনি শ্রদ্ধা হারান সুবিধাবাদিতার কারণে। আবার কারো কারো প্রতি তিনি শ্রদ্ধা হারান সংশ্লিষ্টদের স্ববিরোধিতা, নীতিহীনতা, স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, দেশপ্রেমহীনতা বা কাপুরুষতার কারণে।

প্রধানতঃ বিপ্লবী ভাষা সৈনিক হিসাবে তাঁর ব্যাপক পরিচয় থাকলেও তিনি অদ্যাবধি এমন একজন রাজনৈতিক নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল, ভাষা আন্দোলনে বিরোধিতার জন্য

www.pathagar.com

যাঁর সাথে তিনি তর্কও করেছেন সামনা সামনি। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের অবিসম্বাদিত নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। বৃটিশ সরকার ও ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতৃত্বের প্রবল বিরোধিতার মুখে পাকিস্তান দাবীতে জিন্নাহর অটল ও অনমনীয় মনোভাব এবং ইতিহাসের সেই ঘোর দুর্দিনে এক প্রতিকূল পরিবেশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর নিঃস্বার্থ, বলিষ্ঠ ও আপোষহীন ভূমিকার কারণে তিনি জিন্নাহর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কখনও কার্পন্য করেন না। আরেক জন আপোষহীন সংগ্রামী জননেতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অপরিসীম। তিনি মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ভাসানীর মতই শোষিত বঞ্চিত গণ মানুষের স্বপক্ষে তাঁর আজীবন সুদৃঢ় অবস্থান। মওলানার মতই অন্যায়, অবিচার, বৈষম্য নির্যাতন, আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের সপক্ষে তাঁর উচ্চকণ্ঠ নিরাপোষ ভূমিকা।

তাঁকে অনেকে ব্যর্থ রাজনীতিবিদ বলবেন। কারণ তিনি এতদিন ধরে রাজনীতি করেও না যেতে পেরেছেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়, না হতে পেরেছেন একটি বড় দলের নেতা। কিন্তু এতে তাঁর কোন দুঃখ নেই। নীতিহীনতা, সুবিধাবাদিতা, আপোষকামিতার পথে আগালে এসব তার জন্য কোন সমস্যাই ছিল না। জীবন-যৌবনের বিরাট অংশ কেটেছে তাঁর জেলে জেলে। বয়সের গুরুভার দৈহিকভাবে তিনি এখন অনেকটাই বিধবস্ত। কিন্তু মানসিকভাবে তিনি এখনও বিপ্লবী তারুণ্যের অফুরন্ত শক্তিতে ভরপুর। তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি ভাঙ্গেন তবুও মচকান না। উজান স্রোতে নৌকা চালাতে অঙ্গীকারাবদ্ধ এই নিরাপোষ দুঃসাহসী মাঝিটির নামই অলি আহাদ।

[অধ্যাপক আবদুল গফুর ঃ ভাষা সৈনিক, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিষ্ট]

বাংলাদেশের অন্যতম স্থপতি অলি আহাদের সাথে অত্র বইয়ের সম্পাদক মুন্সি আবদুল মজিদ ও মিজানুর রহমান মিজান।

www.pathagar.com

জাতীয় রাজনীতির বিবেক পুরুষ অলি আহাদ

ডঃ মাহবুব উল্লাহ

নির্লোভ নির্মোহ ও নির্ভীক একজন রাজনীতিকের নাম যদি আমরা জানতে চাই তাহলে বর্তমান বাংলাদেশে খুব বেশী লোকের নাম বলা যাবে না। জনাব অলি আহাদ এই সব বিরল গুণাবলী সম্পন্ন একজন রাজনীতিবিদ। আজীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন গণমানুষের মুক্তির জন্য। প্রতিবাদে প্রতিরোধে ও সংগ্রামে তিনি কখনো পিছপা হননি। জীবনের মোহের কাছে তিনি কখনো আত্মসমর্পন করেননি। আমাদের জড়াগ্রস্ত ঘুনে ধরা সমাজ ব্যবস্থায় এরকম একজন আদর্শ পুরুষের অবস্থান জাতির জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয়। রাজনীতি ক্ষমতার লড়াই। কিন্তু সেই ক্ষমতার লড়াই যখন নিছকই ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিণত হয় তখন সেই রাজনীতি মানুষের কোন কল্যাণ সাধন করতে পারে না। জনাব অলি আহাদের রাজনীতি হলো মানব কল্যাণবাদের রাজনীতি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের রাজনীতি। রাজনীতিতে বিবেকের কণ্ঠধ্বনি হিসেবে তাঁর নাম এদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

কিশোর বয়সেই রাজনীতিতে জনাব অলি আহাদের হাতে খড়ি হয়। সমকালীন সমাজের দ্বন্দ্ব ঘাতপ্রতিঘাত তাঁর চিন্তা ভাবনাকে রূপ দান করেছে। উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের এক ক্রান্তিলগ্নে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার তাদের শাসনামলে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি একক শাসন ক্ষমতার অধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। যেহেতু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম শাসকবর্গের হাত থেকেই ক্ষমতার রাজদন্ড হস্তগত করেছিল- সেহেতু মুসলমানদের প্রতি তাদের অবিশ্বাস ও সন্দেহ ছিল গভীর। তাই বৃটিশ শাসনের অন্ততঃ প্রথম একশত বছরে মুসলমানরা সকল প্রকার রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত ছিল। চাকুরী-বাকুরী, শিক্ষা-দিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সহ সকল ক্ষেত্রেই মুসলমানেরা তাদের প্রতিবেশী হিন্দু প্রজাবর্গের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। হান্টার সাহেব সেই সময়কার মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছেন, Muslims became drivers of water and heweres of wood. রাজ্যহারা মুসলমানেরা ইংরেজ বিরোধী প্রবল প্রতিক্রিয়ায় অন্ধ হয়ে ইংরেজী শিক্ষা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। ফলে তাদের অনগ্রসরতায় আরো তীব্র রূপ ধারণ করে। এই পর্যায়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব সলিমুল্লাহসহ মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইংরেজ শাসনের কাছ থেকে সীমিত সুবিধা অর্জনের রাজনীতির সূচনা ঘটায়। কিন্তু তখনো মুসলমানরা পৃথক রাষ্ট্রগঠনের লক্ষ্য ব্যক্ত করেনি। বৃটিশ ভারতে মুসলমানরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে নিজেদের অধিকারের গ্যারান্টীসহ একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে বসবাস করতে এবং ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করতে। কিন্তু রাজনৈতিক বিকাশের গতিধারায় যখন মুসলমানরা উপলব্ধি করলো একটি পৃথক রাষ্ট্রীয় সত্তা ছাড়া তাদের অধিকার নির্দিষ্ট করা সম্ভব না কেবল মাত্র তখনই তারা পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবী তুলে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এই দাবীর পিছনে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের যুক্তি উপস্থাপন করেন। জনাব অলি আহাদ ইতিহাসের এই ক্রান্তি লগ্নেই রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার সংস্পর্শে

www.pathagar.com

আসেন। তিনি লিখেছেন-" আব্বা দৈনিক আজাদ, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী ও মাসিক সওগাতের নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। এই সকল দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রপত্রিকায় সচিত্র খেলার বিবরণ, বিশেষ করিয়া ফুটবল খেলার মাঠে কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল এবং ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালে ক্রমাগত একটানা বিজয় সংবাদ আমার কিশোর মনে তথা আবাল বৃদ্ধবনিতা মুসলমানদের মনে এক লুপ্তপ্রায় সত্তার পুণর্জাগরণের আহবান ও আবেদন জানাইত। গ্রামোফোন রেকর্ডে নজরুল রচনা ও আব্বাস উদ্দীনের কণ্ঠ বাংলার মুসলমান মাত্রেরই যেনো গর্বের বস্তু ছিল। অর্থাৎ নজরুলের রচনা, গীত-গজল, আব্বাস উদ্দীনের কণ্ঠ ও মোহামেডান স্পোর্টিং এর কলিকাতার খেলার মাঠের বিজয় আত্মজ্ঞান হারা মৃয়মান মুসলমান সমাজকে আত্মস্থ, আত্মসচেতন ও আত্মবলে বলীয়ান করার মূলে বিশেষ অবদান রাখিয়াছে। ফলে মুসলমানদের ভারতের বুকে স্বীয় ও স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবী আমার কচি মনকে প্রবলভাবে আকর্ষন করে। তাই স্কুল জীবনেই অপরিণত বয়সে প্রস্তাবিত মুসলিম বাস ভূমি পাকিস্তান দাবীর সক্রিয় ছাত্র কর্মী হই।" বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রথম দিকে হিন্দুত্ববাদী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক গনেশ পুজা ও শিবাজী উৎসবকে অবলম্বন করে হিন্দু পুণর্জাগরণবাদের রাজনীতির সূচনা ঘটায়। লক্ষনীয় যে, এই প্রয়াসে যে সব প্রতীক ও উপলক্ষ ব্যবহৃত হয়েছে তার চরিত্র ছিল ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট। অন্যদিকে তৎকালীন বঙ্গদেশের মুসলমান সমাজ নিজস্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য যে রাজনীতির সূচনা ঘটায় তার প্রতীক অবলম্বন গুলি ছিল সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ও ইহজাগতিক। ফুটবল খেলা, গণ কবিতা কিংবা সাহিত্য নিঃসন্দেহে ইহজাগতিক বৈশিষ্টে সমৃদ্ধ ছিল। আর এগুলোকে কেন্দ্র করে মুসলিম স্বাতন্ত্রবোধের উত্থান। সম্ভবত একারণেই জনাব অলি আহাদের রাজনৈতিক জীবন তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হলেও তা মোটেও সাম্প্রদায়িক ছিল না।

যিনি একবার আত্মনিয়ন্ত্রণ চেতনার রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ হন তিনি তো বারবার সেই রাজনীতির মধ্যেই তাঁর জনগনের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথ খুঁজে বেড়াবেন। একারণেই তিনি পাকিস্তান হওয়ার পরপরই ভাষা আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েন। এখন পর্যন্ত আমাদের যে সব ভাষা সৈনিক বেঁচে আছেন এবং যারা পরলোক গমন করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন জনাব অলি আহাদ। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর মতো ক'জন অত্যন্ত উচু মাপের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন রাজনীতিবিদ ও পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল এর সামনে বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেয়ার দাবীতে আলোচনা কালে তিনি যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন তা অতুলনীয়। জিন্নাহ বলেছিলেন In the interest of the intigrity of Pakistan, if necessary, you will have to change your mother tongue জিন্নাহ'র এই উক্তি খন্ডন করতে গিয়ে জনাব অলি আহাদ বলেছিলেন "Sir, Britain, USA, Canada, Australia and New Zealand speak the same language, preach the same religion, come of the same stock, could they form one state ? Despite the same religion Islam, same language Arabic, same semetic blood, one same land Arab, why are there so many states on Arab land ?" জনাব অলি আহাদের এই উক্তি থেকে আমরা আঁচ করতে পারি সেই তরুণ বয়সেই তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পৃথক সত্তার নির্যাসটি

www.pathagar.com

অবচেতন মনে হলেও উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন। জিন্নাহ সাহেব যখন তাঁকে বললেন "I know you also" প্রত্যুত্তরে তাৎক্ষনিকভাবে তিনি বললেন"I also know that you are the governor general whom the queen of England can remove on our appeal" কি সাহসী উচ্চারণ! যার কোথা হতেও ভয় নেই তিনিই পারেন এমন উচ্চারণ করতে। জনাব অলি আহাদ আজীবন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। কি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, কি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং গত বত্রিশ বছরের ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সংগে তিনি কখনো আপোষ সমঝোতা করেন নি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিলেন বলেই তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পথ অবলম্বন না করে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর পথকেই অনুসরণ করেন। তবে মওলানা ভাসানীর সাংগঠনিক কৌশল তার মনপুতঃ ছিলনা। রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংগ্রাম তীব্র ও তীক্ষ্ম না করে কেবলমাত্র জেদের বশবর্তী হয়ে আওয়ামী লীগকে দ্বিধা বিভক্ত করা কিংবা আওয়ামী লীগ ত্যাগ করা তিনি মেনে নিয়েছিলেন বটে কিন্তু অন্তরে মেনে নিতে পারেন নি। রাজনৈতিক জীবনে এই রকম সংকটের মুখোমুখি তাঁকে আরেকবার হতে হয়েছিল মরহুম জনাব আতাউর রহমান খানের সংগে যখন National League তিনি গঠন করেন। তখনও মরহুম আতাউর রহমান খানের স্বচ্ছতা বিবর্জিত রাজনৈতিক কৌশল তাঁর পছন্দ হয়নি। জনাব অলি আহাদ মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে সন্দেহের চোখেই দেখতো। একজন আপাদমস্তক জাতীয়তাবাদীকে ভারত সন্দেহের চোখে দেখবে এটাইতো স্বাভাবিক। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ভারতীয় আধিপত্যবাদী নিগড় থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য তিনি 'আজাদ বাংলা' প্রতিষ্ঠার ডাক দেন। শেখ মুজিবের দুঃশাসন ও ভারতীয় শোষণের বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাতে তিনি কখনো কুন্ঠাবোধ করেন নি। ৭২-৭৫ পর্বে আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়াস চালানো হয় এবং ৬ দলীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয় সেই ফ্রন্টে জনাব অলি আহাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। জনাব অলি আহাদ তার রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে অনেকবার কারারুদ্ধ হয়েছেন। দেশের প্রয়োজনে অতীতে তার সংগে যাদের রাজনৈতিক বিরোধ ও মত পার্থক্য হয়েছিল তাদের সংগে পরবর্তীকালে ঐক্য মোর্চা করতেও তিনি ইতস্তত বোধ করেন নি। একজন নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিকের এটাই বড় গুন। আওয়ামী লীগ যখন বাংলাদেশে দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসে তখনও তিনি গণমানুষের সংগ্রামের প্রেরণার উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। বর্তমান চার দলীয় জোট সরকারের ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতিবাদ জানাতেও তাঁর কোন জড়তা লক্ষ্য করা যায় না।

ন্যায় ও বিবেককে জাগ্রত রাখার জন্য সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিভাষায় civil society নামে একটি শব্দ যুক্ত হয়েছে। অবশ্য এই শব্দটি রাষ্ট্র বিজ্ঞানের দর্শনে বহু পুরাতন। কিন্তু আমাদের দেশে এটির প্রয়োজনীয়তা আমরা হাল আমলে উপলব্ধি করেছি। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলাদেশে Civil Society 'তে যাদের কথা শুনা যায় তারা কোন না কোন বড় দলের লেজুড় বৃত্তি করেন। সত্যিকার Civil Society র সদস্যদের দলীয় রাজনৈতিক পরিচয় থাকতে পারে না। কিন্তু অলি আহাদ হলেন দলীয় পরিচয় নিয়ে মুলতঃ Civil Society রই সার্থক কণ্ঠস্বর।

[ডঃ মাহবুব উল্লাহ ঃ সাবেক ছাত্রনেতা, সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, অর্থনীতির অধ্যাপক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়]

www.pathagar.com

কালের পাতায় কালাধার

আল মুজাহিদী

অলি আহাদ আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির একটি ইতিহাস স্পর্শী নাম। যিনি নিজেই তাঁর অস্তিত্ব উৎকীর্ণ করেছেন কালের অমোঘ এপিটাফে। তিনি তাঁর অস্তিত্বের ভাষা উচ্চারণ করেছেন আত্মগত একটি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

"The man who does not try to raise his spirit above itself, is not worthy to live in the condition of a man."- Angelus Silesius

একজন কৃষক হাল চাষ করে জমিতে বীজ ফেলে শস্যকণা উৎপাদন করে। জীবন নামের জমিটাতে, ঠিক তেমনি প্রতিদিন নিরন্তর নানা বীজকণা বপন করেই মানবিক ফলস ফলাতে হয়। জীবন একটি বিশাল শস্যক্ষেত্র। এই উর্বর ভূমিতে মানুষ যে বীজকণা বোনে, বিপুল সৃষ্টিশীলতায় যখন সেটা বিকশিত হয়ে উঠতে পারে, সেখানেই মানুষের অবদান মূর্ত হয়ে ওঠে। আমরা জানি, মানব-জীবন যদিও সময়ের সংক্ষিপ্ত মুহূর্তে সীমাবদ্ধ, তাই বলে সেটা এমনিতেই নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপার নয়। জীবনের মধ্যে গতি, বেগ, অফুরন্ত শক্তি থাকে। এই গতি, বেগ এবং শক্তির সমন্বয়ে জীবন স্পন্দিত হয়, প্রবাহিত হয় সমুদ্রের জলরাশির মতো। আমাদের ভেতরের শক্তিকে বাইরের বাস্তবের ধুলোবালি মাড়িয়ে ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ করে দিতে থাকে। এখানেই জীবনের ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

প্রকৃতির মতো মানব জীবনের একটি বিচিত্র ছককাটা নক্শা আছে। এ নক্শাটি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আবর্তিত, বিবর্তিত এবং বিভাসিত হতে থাকে। এই আবর্তন, বিবর্তন ও বিভাসন মানব অস্তিত্বের মূলসূত্র এবং বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য নিয়ে ক্রমাগত নির্ধারণ করে চলে। শৃগাল-স্বভাবের মানুষও শৃগালের মতো মৃত্যুবরণ করতে চায় না। মহত্তর কিংবা মহত্তম ভবিষ্যৎই মানুষের কাম্য। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় বলেছিলেনঃ

"জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে জীবন সত্য। অমৃত না থাক জীবনে মধু আছে।" জীবনের শস্যক্ষেত্রে অনেক খড়-বিচালি জন্মাবে, অনেক বিষকাটালিও ফলবে কিন্তু সেগুলো কেটে ফেলে, ঝেঁটিয়ে, বহুদূরে নিক্ষেপ করতে হয়। সোনালি ফসলটুকু সময়ের কুটিল গর্ভ থেকে তুলে আনতে হয়; এটাই তো জীবন। পৃথিবীর সকল দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সংঘর্ষের ওপর পা তুলে দাঁড়াতে হয়, পাথরে পাথর ঘষে, আগুনের ফুলকি ছড়াতে হয়। আবার ঐ আগুনের ফুলকির তাত বহন করে নিয়ে যেতে হয় বহুদূর। মায়া-মরিচীকা দেখেতো জীবনের কোন স্বার্থকতা নেই। জীবনের ধর্ম হলো সংগ্রাম। সংগ্রামের রক্তফল্গুধারা ব'য়ে চলে অবিরাম, নিরন্তর। সংগ্রামের রক্তচিহ্ন ছাড়া জীবনের স্বাক্ষর রাখা সম্ভবপর নয়। মানবজীবন থেকে যখন সংগ্রাম নির্বাসিত হয়, জীবন তখন স্তব্ধ হয়ে যায়, অন্ধকার রাত্রির সরোবরের মতো। জীবনের ধর্মনীতি ঘা মেরে, রক্তের ফিন্‌কি ছোটাতে হয়, এ না হলে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। এজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'মনুষ্যজীবন প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘ সমর মাত্র।' যাযাবর তাঁর

www.pathagar.com

'দৃষ্টিপাত' গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'পলিটিক্সের মতো মানুষের জীবনও হচ্ছে এ্যাডজাস্টমেন্ট আর কম্প্রোমাইজ।'

কিন্তু মানবসংসারে অনেকের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। কেউ কেউ এ্যাডজাস্টমেন্ট করেন, কিন্তু কম্প্রোমাইজ করেন না। এই আপোস না করার স্বভাবের সত্তা থেকে কতোবার কত সময়ই না ম্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট ঘটে। আমাদের সমাজ-জীবনে, বিশেষ করে রাজনৈতিক অঙ্গনে এরকম ব্যতিক্রমের সাক্ষাত ঘটে। জনাব অলি আহাদ সেই ব্যাতিক্রমেরই উজ্জ্বল উদাহরণ।

বাঙালি তার জাতিসত্তার গৌরবে গৌরবান্বিত প্রভূত প্রাণবন্ত। তবে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জাতিদাম্ভিকতা কিংবা অন্তর্হিমিকা যেন কখনো আমাদের পেয়ে না বসে। প্রাণের বিনিময়ে আমরা রক্ষা করেছি আমাদের প্রাণের ভাষা, জন্মভাষা বাংলাকে। আর লক্ষ্য প্রাণের বিনিময়ে অর্জন করেছি বাংলার স্বাধীনতাকে। এই ভাষা ও স্বাধীনতার সংগ্রামে যারা সংগ্রামী সেই সব অগ্নিমান পুরুষদেরকে আমাদের ইতিহাসের পাতায় উৎকীর্ণ করে রাখতে হবে। আমাদের হাজার বছরের ভাষা ও সংস্কৃতি আজ আন্তর্জাতিক শিরোপা অর্জন করেছে- এর পটভূমিতে রয়েছেন এই মহান সংগ্রামী পুরুষেরা। জীবন দিয়ে হলেও এই ভাষা সংস্কৃতিকে আরও অস্তিমান আরও প্রাগ্রসর করে তোলার জন্যে আমাদেরকে হতে হবে অধিকতর ইতিহাস প্রাণ। কালের পাতা বিস্তার করে কালাধার রচনা করা যায়। এটাই প্রাগ্রসর জাতির পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। সতত সততাকে হাতিয়ার করে ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতে হবে।

একুশে ফেব্রুয়ারি, মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস স্বাক্ষরিত দিন। এই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মহান সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে যোজিত একটি নাম, অলি আহাদ। বাঙালি জাতির মহান ভাষা- সংগ্রামের সঙ্গে এ নামটি জড়িত ওতপ্রোত, একান্তভাবে। এটা, সর্বজন বিদিত যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সংগ্রামের ইতিহাসে এ এক অবিস্মরণীয় নাম। আমাদের রাষ্ট্রভাষা ও তার অস্তিত্বের সংগ্রামের ইতিহাস থেকে এ নামটিকে কেউ কখনো মুছে ফেলতে পারবে না। একুশে ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আত্মদান করেছেন- রফিক, সালাম, আবুল বরকত জব্বার শফিউর রহমান আগুনের ফুল্কির মতো প্রজ্জ্বলন, কটি নাম। এই ইতিহাস আজ সারা পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীর জানা- অধীত বিষয়। যাঁরা এই মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও সংগ্রামের পুরোধাপুরুষ, স্থপতিপুরুষ, আগ্নেয়পুরুষ, তাঁদের কথাও সমগ্র পৃথিবী শ্রদ্ধার সঙ্গে এবং কৃতজ্ঞ চিত্তে চিরকাল স্মরণ করবে।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। সময়ের বিবর্তনিক ধারায় আমাদের ইতিহাসের পাতাগুলো ক্রমাগত জ্বলজ্বল করছে। অন্ধকারের কালো দানবতো আমাদের ভাষার অস্তিত্ব, মাতৃসম মহান বাংলা বর্ণমালার মহিমাকে একটুও ম্লান করতে পারেনি। মহান স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন এই ভাষা, মাতৃভাষা। জনাব অলি আহাদ বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির গ্যালাক্সির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র-পুরুষ। তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের একজন মহান সমরবিদ, অনন্য স্ট্র্যাটেজিশিয়ান। অনন্যসাধারণ কৌশলবিদ। অলি আহাদ তাঁর অন্যান্য সহযাত্রীদের সঙ্গে রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন ও সংগ্রামকে যৌক্তিক পরিণতি এবং একটি সফল মাত্রায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানেই অলি আহাদ কীর্তিমান এবং জীবন-যুদ্ধের সফল যোদ্ধা। ভাষা সৈনিক। জীবন্ত জীবন সৈনিক।

এই এতো বড়ো মাপের জাতীয় ব্যক্তিত্ব - কিন্তু তাঁর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য মূল্যায়ন

www.pathagar.com

হলো না আজ অব্দি, এটা তাঁর পক্ষে যেমন মর্মপীড়ার ব্যাপার আমাদের পক্ষেও যে কতোটা লজ্জাকর বিষয় সেটা আমরা ভেবে দেখতেও পারলাম না। এতোটা আত্মবিস্মৃতি কোনো সমাজ ও জাতির জন্যে কখনোই কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। অলি আহাদ সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল জাতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে বিচিত্র, বর্ণাঢ্য ভূমিকা পালন করে এসেছেন। এটা বলাই বাহুল্য। তিনি কখনো কোনো অপশক্তির সাথে আপোস করতে যাননি। মাথা নত করেননি অন্ধদানবের সামনে। বরং বীরের মতো মাথা উঁচু করে লড়ে গিয়েছেন সমস্ত স্বৈরাচারী, ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে। তাঁর এই সংগ্রামের অধ্যায়গুলো জাতি ও দেশবাসীর কাছে অজানা নয়। কিন্তু যারা সমাজের কিংবা দেশের ভালোমন্দের, শুভাশুভের কলকাঠি নাড়েন তারা কখনোই তাঁর কৃতি ও অবদানের কথা মূল্যায়ন করতে প্রয়াস করেন নি। এখানেই আমাদের আপসোস। প্রচণ্ড ঘৃণা এবং অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হই আমরা। তখন ধিক্কার সেই সমাজের প্রতি।

মানব-জীবন যখন দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সংঘর্ষ, ঝঞ্ঝা-বাজার মুখোমুখি হয়- আগুনের হলকার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয় তখন জীবন গতিস্মান হতে থাকে নানা ধারায়, নানা মাত্রায়। আমরা জীবনকে বদ্ধ দরোজার ভেতর কখনই ফেলে রাখতে পারি না। সংগ্রামের সাতত্যে জীবন নামের বিহঙ্গটাকে মুক্তি দিতে হয় দিগন্তের ওপারে।

"Nothing except a battle lost can be half so melancholy as a battle won."
[Duke of Wellington]

জীবনযুদ্ধে অংশ নেয়াটাই বড়ো কথা। কখন, কতোটা জয়ী হতে পারা যাবে সেই যুদ্ধে সেটা বড়ো কথা নয়। তবে বিজয়ের প্রত্যাশা ও অঙ্গীকারকে যিনি রূপদান করতে পারেন বাস্তবে, তিনিই বড়ো রূপকার। জীবন ক্যানভাসের মহান চিত্রকর। মহান শিল্পী। জীবন সংগ্রামের সেই শিল্পের সার্থক চিত্রী তিনিই।

'A fool is a man who never tried an experiment in his life.'
[Erasmus Darwin 1731-1802]

মানব জীবনে সংগ্রামের মধ্যেই সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ত বিদ্যমান। যেখানে এই সংগ্রামের পরীক্ষা নিরীক্ষা নেই সেখানে জীবন কখনো জাজ্জ্বল্যমান, মূর্ত হয়ে ওঠে না। জীবনের জীবন্ত, উজ্জ্বল শিখা জ্বলে ওঠে না। নির্বোধেরা জগতের ভাটির স্রোতে খড়কুটোর মতোই ভেসে যেতে থাকে। অলি আহাদ উজান স্রোতের ধারায় সতত চলমান বিপরীত স্রোতের ধারায় ভ্রাম্যমান মানুষ। এখানেই অলি আহাদের ব্যতিক্রম ধর্মিতা জীবন ধর্মিতা স্পষ্ট প্রতীয়মান। সেকারণেই অলি আহাদ চিরকাল জীবন সংগ্রামী- জীবন সমুদ্রের এক মহাসংগ্রামী নাবিক।

অলি আহাদ ভাইয়ের সংগে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। কম করে হলেও সাড়ে চার দশক কাল হবে। কখন, কোথায়, কিভাবে পরিচয় সূত্রটা হয়েছিলো, এই মুহূর্তে অতোটা স্মরণ করতে পারছি না। তবে আমার বালক বয়স থেকেই তাঁর নাম শুনতে থাকি। ১৯৫২ সালের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে তাঁর নাম খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হতো প্রায় দিনই। এই মহান ভাষা সৈনিক আমার স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত করতো। যেদিন প্রথম দেখা হয় তাঁর পরনে ছিলো খদ্দরের পাঞ্জাবী, ওয়েস্ট কোট, পাজামা। এই দীপ্ত পুরুষকে দেখেই মুগ্ধ হই। তাঁর দু

www.pathagar.com

চোখের পাতা ছেপে কিরকম বিদ্যুৎ কণা ছড়াচ্ছিলো। আবার কেমন স্বভাব সুলভ স্নেহার্দ্র, হার্দিক উচ্চারণে কথামালা, কুশলবার্তা বিনিময় করছিলেন তিনি। অলি আহাদ সারাজীবনই এই মানবীয় ঘরানার দোলাচলে আন্দোলিত হয়ে আসছেন। এখানে আমি কখনো কোনো ব্যত্যয় রেখা খুঁজে পাইনি। তারপর তাঁর সাথে সম্পর্কর 'মাত্রা' সুদৃঢ় হয়েছে দিন দিন। সে সম্পর্কে আজও টিকে আছে নিবিড় বন্ধনে। এক সঙ্গে রাজনীতির মঞ্চে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি। মরহুম আতউর রহমান খান, মিসেস আমেনা বেগম, শাহ আজিজুর রহমান, অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম, বগুড়ার বি এম ইলিয়াস, ইকবাল আনসারী খান, ফেরদৌস কোরেশী, জিয়াউল হক, রিয়াজ আহমেদ, ইকবাল সোবহান চৌধুরী, আবদুল মান্নান খান, কায়সার রিয়াজুল হক, তারেক ফজলুর রহমান, শামিম আল মামুন, কামালুর রহিম, মোতালেব ভুঁইয়া, ইবরাহিম রহমান, এহসানুল হক সেলিম এবং আরও অনেকে মিলে 'আমরা' রাজনৈতিক অঙ্গনে কর্মকাণ্ড করেছি। বাংলার স্বায়ত্বশাসন, স্বাধিকার আন্দোলন, সর্বাত্মক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা উচ্চকিত করেছি। মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে-সর্বদলীয়ভাবে স্বাধীনতার কথা বলেছি পল্টন ময়দানে। মওলানা সাহেব পল্টন ময়দানে পাকিস্তানের সামরিক জান্তার প্রতিভূদের "আসসালামু আলাইকুম' শুনিয়ে দিয়েছিলেন সকলের আগে ইথারের ঝংকার ধ্বনিতে। ইতিহাস কি আমাদের সংগ্রামের এই মহান অধ্যায়টিকে নির্বোধের মতো বিস্মৃত হয়ে থাকবে? আজ এই লেখাটি সমাপ্ত করার পূর্বে আমি অলি আহাদ ভাইকে জিজ্ঞেস ক'রে রাখতে চাই, 'নেতা বলুন , ইতিহাস এই অগ্নি-ঘোষণার মহান ইশতেহার পাঠের ধারা ক্রশটি কি বেমালুম বিস্মৃত হয়ে থাকবে ? একটা উদার, মানবিক, ইতিহাস মনষ্ক উত্তর প্রত্যাশা করি আপনার কাছ থেকে। জানি, এই মুহূর্তে আপনি হয়তো কোনো জবাবই দেবেন না অভিমান করে। কিংবা বলবেন, ইতিহাসই সাক্ষ্য দেবে এসব কিছুরই।'

কখনো কখনো ইতিহাস লিখতে গিয়ে মিথ্যা তত্ত্ব-তথ্যে, ঘটনাপঞ্জির সন্নিবেশ ঘটিয়ে ইতিহাসের পাতাকে কলংকিত করে ফ্যালে হঠকারী ইতিহাস লিখিয়েরা। কিন্তু তাই বলে, সত্যকে মিথ্যা দিয়ে দীর্ঘকাল চেপে রাখা যায় না। একদিন না একদিন সত্য-ই ইতিহাসের শীর্ষচূড়া স্পর্শ করে। মানবাত্মার সংগে গ্রথিত হয়। এটাই ইতিহাসের চূড়ান্ত পরিণতি।

আমরা এটা লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের ইতিহাস রচনার ইতিহাসটি নানা ভ্রান্তির মোড়কে মৈত্রেয়। এটা যে আমাদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠি চেতনার কলংক তিলক, এতে কোনো সন্দেহ-ই নেই। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের যথার্থ মূল্যায়ন করে, জীবন সংগ্রামের সফলতার শিরোপা পরিয়ে দিতে হবে তাদের শির দেশে। অলি আহাদ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের তেমনি এক ইতিবাচক সংগ্রামী পুরুষ- তাঁর অগ্নিময় চরিত্র্যের চালচিত্র ধারণ করতে হবে কালের পাতায় স্থায়ীভাবে এবং সম্পূর্ণ অবিকৃত অবয়বে। আর এটা আমাদের জাতীয় স্বার্থেই প্রয়োজন। ইতিহাসের শিরোচ্ছেদ কোনো অবস্থাতেই কাম্য নয়।

[আল মুজাহিদী ঃ বিশিষ্ট কবি, রাজনীতিবিদ ও সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক।]

www.pathagar.com

চির উন্নত শির অলি আহাদ

বাহাউদ্দীন চৌধুরী

বাঙালি মুসলমানের ইতিহাসে ক্ষণজন্মা মানুষের জন্ম বিরল ঘটনা। অলি আহাদ তেমনি একজন ক্ষণজন্মা ব্যক্তি। বাঙালি মুসলমানের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বড় মাপের মানুষ হয়তো অনেকেই জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া ইতিহাসে মহাপুরুষ বা মহামানব হিসেবে স্থান করে নিতে পারেননি অধিকাংশ বড় মাপের মানুষ। আমি এখানে ইংরেজিতে বলা বিগম্যান ও গ্রেটম্যান'র মধ্যে পার্থক্য নির্নয় করতে চাইছি। বাঙালী মুসলমানের ইতিহাসে রাজনীতিবিদদের মধ্যে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আবুল হাশিম ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া আর কোনো ব্যক্তি এই বিরল সম্মানের অধিকারী হতে পারেন কিনা তা আমার জানা নেই। এই রাজনৈতিক নেতাগণ তাদের জীবনে অসাধারণ সাফল্য প্রদর্শন করেছেন। এদের মধ্যে দুইজন রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারেননি বা বড় দলের নেতা হননি বলে এই বিরল প্রজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নটি জনগণের চোখের আড়ালে থেকে গেছে।

চরিত্রের দৃঢ়তা, নীতিনিষ্ঠা, আদর্শের প্রতি অনমনীয় আস্থা, সততা ও নির্মোহ, নির্লোভ ত্যাগের একমাত্র দৃষ্টান্ত চির বিদ্রোহী জননেতা অলি আহাদ। দূর্নীতিপরায়ন এই দেশের রাজনীতিতে অলি আহাদ একমাত্র আলোকবর্তিকা। বাঙালি নিজের নায়কদের চিনতে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল করে। তাই আজ অলি আহাদ সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে জানতে হবে। অনুকরণ ও অনুসরণ করার আহবান জানাতে হবে। কিশোর বয়স থেকেই অলি আহাদ সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের তিনি ছিলেন একজন অগ্রণী সৈনিক। পরবর্তী সময়ে ১৯৪৮ সাল থেকে ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের প্রধান সেনাপতি। তার প্রজন্মের সব চাইতে ধীমান ও সংগ্রামী এই নেতা মুসলিম লীগ সরকারের স্বৈরাচারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। পরবর্তী সময়েও আইয়ুব খান থেকে ইয়াহিয়া খান পর্যন্ত সব সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তিনি গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। শুধু তাই নয় স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও তিনি সকল অন্যায়, অবিচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেন এবং কারানির্যাতন ভোগ করেন। সকল সরকারের আমলেই তিনি নির্যাতিত হয়েছেন এবং কারাবরণ করেছেন। অনেক সরকারই তাকে ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কিন্তু আদর্শ ত্যাগ করে নিজের ব্যক্তিগত লাভ তিনি কখনো চাননি, তাই ঘৃণাভরে এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। অলি আহাদের অনেক মতামতের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই, তবু এ দেশের ইতিহাসের এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষকে আমি হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানাই। তার দীর্ঘজীবন কামনা করি এবং আশা রাখি আমৃত্যু তিনি তার লড়াই চালিয়ে যাবেন।

[বাহাউদ্দীন চৌধুরীঃ বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, কলামিষ্ট ও সাবেক তথ্য সচিব]

www.pathagar.com

চির বিদ্রোহী অলি আহাদ

নূরুন্নবী

স্বাধীনচেতা, চির বিদ্রোহী, চির প্রতিবাদী এক অসাধারণ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক নেতা অলি আহাদ। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল সেই পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিক থেকেই, যখন আমরা দু'জনেই যুবক ছিলাম। আমরা কখনও এক রাজনৈতিক দল করিনি, তবে জীবনের কোন কোন সময় একসঙ্গে রাজনীতি করেছি। বন্ধুত্বের ভিত্তি রাজনৈতিক। এই বন্ধুত্ব আমার জন্য সম্মানের।

শুধু রাজনৈতিক কারণে যে বন্ধুত্ব তা কিছুটা উপরসা। না, আমাদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। কারণ, মানুষ হিসাবেও অলি আহাদ চমৎকার। বন্ধু বৎসল তো বটেই। তার উপর এমন কিছু মানবিক গুণাবলী আছে, এমন এক ধরনের চমৎকার ব্যক্তিত্ব যা সহজেই আকর্ষণ করে। আর ঠিক এই ব্যক্তিত্বের কারণেই তিনি হয়ে উঠেছেন রাজনৈতিক নেতা। নির্ভীক, স্পষ্টভাষী, সাহসী, দৃঢ়চিত্তের এক মানুষ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি নিজের বিশ্বাসের প্রতি অটল থেকেছেন বরাবর। যাকে অন্যায় মনে করেছেন তার সংগে কখনও আপোষ করেননি। এই আপোষ ও সুবিধাবাদ জিনিসটি তার চরিত্রে একেবারে অনুপস্থিত। সেজন্য হয়তো আমাদের প্রচলিত রাজনীতির ধারায় তাকে অনেক খেসারত দিতে হয়েছে। কিন্তু তিনি পরোয়া করেননি।

আগেই বলেছি, আমরা কখনও একত্রে এক রাজনৈতিক সংগঠন করিনি। আমার রাজনীতির শুরু কলকাতায় বৃটিশ আমলে। আমি করতাম কমিউনিস্ট পার্টি। জীবনে অন্য কোন পার্টি আর করিনি। আওয়ামী লীগ বা ন্যাপও করিনি। তরুণ অলি আহাদ তখন ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্প পরেই তার রাজনীতির ধারা পরিবর্তিত হলো। তিনি প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে অংশ নিলেন। সেদিন যে স্বল্পসংখ্যক তরুণ নতুন রাজনীতির ধারার উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন তার সর্বাগ্রে অলি আহাদের নাম আসতে পারে। ১৯৪৮ সালে যে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়, অলি আহাদ ছিলেন তার অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় নেতা। ১৯৪৮ সালেই তিনি কারাবরণ করেন। এই প্রথম জেলে যাওয়া। তারপর যে কতবার জেলে গেছেন, তা আমার সঠিক জানা নাই। শুনেছি এ পর্যন্ত মোট ১৭ বার গ্রেফতার হয়েছেন। আত্মগোপনেও থেকেছেন দুইবার। আইয়ুব আমলেই শুধু ৬/৭ বছর আত্মগোপনে থেকেছেন। আমিও বহুবার জেলে গেছি, কিন্তু কখনও একসঙ্গে জেলে থাকার সুযোগ হয়নি।

যে কথা বলছিলাম, পাকিস্তান আমলের শুরুতেই অলি আহাদ কারাবরণ করেন। আমার ক্ষেত্রেও তাই। তারপর পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকে, সময়টা আমার ঠিক মনে নাই, দুজনেই সদ্য জেল থেকে বেরিয়েছি। এমনই এক সময় মোহাম্মদ তোয়াহার ৪৩ যোগীনগরের বাড়ীতে আমাদের দুজনের প্রথম দেখা হয়। ঐ বাড়ীটা ছিল তখনকার প্রগতিশীল বাম সংগঠন যুব লীগের অফিস। এরপর কত ঘটনায় কতবার দেখা হয়েছে, একত্রে কাজ করেছি, কখনও কখনও বিতর্কও করেছি, কিন্তু পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অক্ষুন্ন ছিল।

www.pathagar.com

. পাকিস্তান আমলে প্রথম কমিউনিষ্ট পার্টির তিনজনের প্রকাশ্য টিমের একজন ছিলাম আমি। আর অলি আহাদ ছিলেন ভাসানী নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের তরুণ অংশের প্রভাবশালী নেতা। তিনি কমিউনিষ্ট পার্টি করেননি, কিন্তু কমিউনিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল ছিল। বিশেষ করে কমরেড খোকা রায়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। আমার ব্যক্তিগত ধারণা তখনকার কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব এই সাহসী অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন তরুণকে ধারণ করতে পারেনি।

অলি আহাদ অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি বি.কম পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। তবু রাজনৈতিক কারণে তাকে পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভর্তি হবার সুযোগটুকু দেয়নি। তিনি খুব পড়ুয়া এবং জ্ঞানপিপাসা অপরিসীম। অন্যদিকে অলি আহাদের ছিল অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা। তিনি ছিলেন যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী লীগের প্রচার ও সংগঠনিক সম্পাদক এবং পরবর্তীতে ন্যাপের যুগ্ম সম্পাদক। এ সবই পাকিস্তান আমলের কথা।

১৯৫৭ সালের দিকে তদানিন্তন আওয়ামী লীগের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। একদিকে সোহরাওয়ার্দী- শেখ মুজিব, অপরদিকে মওলানা ভাসানী। সোহরাওয়ার্দী-মুজিব পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করেন এবং পাক মার্কিন সামরিক চুক্তি, সিয়াটো সেন্টোর পক্ষে অবস্থান নেন। ভাসানী দৃঢ়ভাবে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন অবস্থান গ্রহণ করেন। সেই সময় অলি আহাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী অবস্থানের কারণে সোহরাওয়ার্দী-মুজিব অংশের চক্রান্তের ফলশ্রুতিস্বরূপ আওয়ামী লীগ থেকে সাসপেন্ড হন। পরে তিনি ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হন। ভাষা আন্দোলনে, পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ঐ পঞ্চাশের দশকের অলি আহাদের যে ভূমিকা ছিল তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গৌরবের। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা আজকের প্রচার মিডিয়া এসব কথা বলে না। আজকের প্রজন্মও এসব কাহিনী জানেনা।

অলি আহাদের এই রাজনৈতিক অবস্থানের কারণেই কমিউনিস্ট হিসাবে আমারও তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল। মনে আছে ১৯৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় আমাকে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে পাঠানো হয়েছিল ভাসানীর নেতৃত্বাধীন কর্মী শিবিরে। উদ্দেশ্য পার্টি কর্মীরা যাতে ভালভাবে নির্বাচনে অংশ নেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। তখন অলি আহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সে অনেক কাল আগের কথা। এরপর আবার অলি আহাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আশির দশকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময়।

অলি আহাদ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের ভিতর অবস্থান করেই সাহসের সঙ্গে গোপনে স্বাধীনতার স্বপক্ষে কাজ করে যান। এরপর দেশ স্বাধীন হলে প্রথম আওয়ামী লীগ আমলে তিনি অন্যায় নির্যাতন ও ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। তারপর থেকে তিনি লাগাতার বিদ্রোহের পতাকা বহন করে চলেছেন। কারণ এখনও পর্যন্ত জনগণের পক্ষের কোন শক্তি ক্ষমতায় আসেনি। তাই অলি আহাদের মতো মানুষকে তো বিদ্রোহের পতাকা বহন করতেই হবে। আজ আমাদের দুজনেরই বয়স হয়েছে। তবু আশা করবো অলি আহাদের মতো মানুষের কণ্ঠে মানুষ শুনবে প্রতিবাদের ধ্বনি, বিদ্রোহের বাণী। কারণ এক কথায় যদি অলি আহাদকে চিত্রিত করতে হয়, তবে বলতে হবে তিনি হলেন চির বিদ্রোহী।

[কমরেড নূরন্নবীঃ বাম রাজনীতিবিদ]

www.pathagar.com

অলি আহাদ ঃ দেশপ্রেমিকতা যাঁর রাজনীতির একমাত্র ধর্ম

অধ্যাপক মোমেনুল হক

জনাব অলি আহাদের রাজনৈতিক জীবন যেমন সংগ্রামমুখর তেমনি বহ্নিপ্রতিম। সুদীর্ঘ ৩৮ বছরের নিকট সান্নিধ্যের কারণে নিঃশংকচিত্তে আমি বলতে পারি নীতির প্রশ্নে, দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে, অসাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর প্রশ্নে তাঁর মত অটল চিত্ততা দেখিয়েছেন এমন রাজনীতিবিদের সংখ্যা এদেশে বিরল। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর ত্যাগ তিতিক্ষার আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী জনাব অলি আহাদের রাজনৈতিক পদচারণা অর্ধশতাব্দীর উর্ধকাল। উপমহাদেশের সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কর্মী হিসেবে এ মেধাবী ছাত্রের রাজনৈতিক জীবন শুরু। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যুবলীগ প্রতিষ্ঠা, ৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে, তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানের শাসনতন্ত্র বিষয়ক মূলনীতি রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠনে, প্রথম বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা,'৫২ সালে একুশে ফেব্রুয়ারী অগ্নিগর্ভ দিনের জন্ম দেয়ায় তাঁর বিপ্লবী অবদান এ জাতির ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

তাঁর ঝঞ্ঝামুখর জীবনের একটি অত্যন্ত উজ্জল অধ্যায় দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু ষাটের দশকে স্বাধিকার আন্দোলনে তাঁর নির্ভীক চিত্ততা এবং ৬৯-৭০ সালে স্বাধীন বাংলা মুক্তি ফৌজ গঠন করার মত দৃঃসাহসী পদক্ষেপ গ্রহণের সাক্ষী আমি, যাঁরা সেদিন তাঁর সাথে ছিলেন আজকের শ্রীভ্রষ্ট রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে পড়ে তাঁরা যদিও তাঁর নাম উচ্চারণ করেন না কিন্তু পরম শ্রদ্ধার সাথে এ কথা বলেন জনাব অলি আহাদ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শীর্ষস্থানীয় সংগঠক।

আবার স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে তিনিই অশান্ত বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। মওলানা ভাসানীর জনভিত্তি বেশী ছিল সেজন্যে তাঁর নাম বেশী উচ্চারিত হয়। কিন্তু ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম যিনি জনসমাবেশে '৭১ পরবর্তী সময়ে আন্দোলন ঘোষণা করেন তিনি অলি আহাদ।

ক'দিন আগে আমার এক বন্ধু বলেছিলেন অলি আহাদ সাহেব সব সময়ই দেশের পক্ষে বলেন কিন্তু তাঁর রাজনীতি খানিকটা দূর্বোধ্য। আমি অলি আহাদের এ আপাতঃ সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে জানি। সংগ্রামী পুরুষ হিসেবে তিনি শেখ মুজিবকে অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব মনে করেন। কিন্তু একই নিঃশ্বাসে মনে করেন শেখ মুজিব বাকশাল প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ করেছেন।

www.pathagar.com

তাঁর কাছ থেকে শতকরা ১০০ ভাগ নিখাদ ছাড়পত্র-যাকে বলে Blank cheque পাওয়া কঠিন। সেজন্যে যে অলি আহাদ বলেন, "ছয়দফা ভিত্তিক স্বাধিকার আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব ছিল বলিষ্ঠ এবং অনবদ্য; মুজিব স্ত্রী মহিয়সী নারী, সে অলি আহাদই বলেন, মুজিব ভাই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এটা সঠিক নয়। স্বাধীনতার ঘোষণা আমরা মেজর জিয়ার কণ্ঠেই শুনেছি এতে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ তিনি যে ঘটনা যে অবস্থায় দেখেছেন তাই বলবেন, Expediency Politics এ তিনি বিশ্বাসী নন। অলি আহাদ সাহেবের পড়াশুনার পরিধি এবং বিস্তৃতি অনেক বেশী, সাধারণ আলাপচারিতায় এটা বোঝা কঠিন। কারণ ভণিতা বা ভঙ্গিমা তিনি জানেন না। তিনি যেমন লণ্ডনভিত্তিক Rise of European Liberalism (ইউরোপীয় উদারনৈতিকতাবাদ), কিংবা হিটলারের অভ্যুদয়ে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির অবিমৃষ্যকারী ভূমিকা, কিংবা কমিউনিস্ট বিশ্বে polycentrism (বহু কেন্দ্রিকতা) কিংবা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল প্ল্যান সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্য দিতে সক্ষম তেমনি বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী Stephen Hawkins এর সাম্প্রতিক গবেষণা সম্পর্কেও অবহিত।

তাঁকে অন্তরঙ্গ আলোকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বে রয়েছে সারল্য-যা আজকের রাজনীতিতে অকল্পনীয়, মধুর ভাষায় কথা বলতে পারেন না- তাঁর বক্তব্য, সবসময়েই ঝাঁঝালো (ইংরেজীতে যাকে বলে Caustic Tone)। অন্যায়ের প্রতিবাদ যেই করুক তাঁর প্রতি অলি আহাদ সমর্থন দেবেনই-সমর্থন না চাইলেও। কিন্তু তিনি যখন প্রতিবাদ করেন তখন সমর্থন না আসলে মনে কষ্ট পান। প্রচণ্ড অভিমানী তিনি-এটা সহজে বোঝা যায় না। কোন প্রবন্ধ অলি আহাদ সাহেব সম্পর্কে লেখা আমার পক্ষে কঠিন। এত ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি তাতে একটি বই লিখলেও শেষ হবে না। আমি ব্যথিত হই যখন দেখি তাঁর সমসাময়িকরা যারা তাঁর সম্পর্কে চায়ের টেবিলে উচ্ছসিত প্রশংসা করেন তাঁরা প্রকাশ্যে তাঁর অবদান সম্পর্কে বলতে কুণ্ঠিত হন- সম্ভবতঃ ব্যক্তিবাদভিত্তিক রাজনৈতিক দলের কর্তা বা কর্ত্রীর ভীতিতে।

অলি আহাদ সাহেব অত্যন্ত আবেগপ্রবণ মানুষ তবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে তিনি আবেগ তাড়িত হন না। আমার কাছে তিনি মিনতির ভঙ্গিতে একটি কথা বলেছিলেন। সেটা অনুল্লেখিত থাকা সঠিক নয় বলেই আমি মনে করি। সম্ভবতঃ ১৯৯৪-৯৫ সাল। অলি আহাদ সাহেব গুরুতর অসুস্থ। আমাকে আমার গ্রীন রোডের বাসায় বলেছিলেন, "আমার সময় বোধ হয় শেষ, আরও দু-একজনকে বলেছি, আপনাকেও বলছি। যদি পারেন আমার মৃত্যুর পর আমাকে ভাষা আন্দোলনের শহীদান বরকত-সালামের কবরের পাশে মসজিদের সন্নিকটে কবরস্থ করার চেষ্টা করবেন।" তাঁর অগোচরে আমি অশ্রু সংবরণ করতে পারছিলাম না। কিন্তু সেদিন আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে অলি আহাদের ব্যক্তিত্বে show-manship নেই কিন্তু মনের গহীনে একুশের শহীদানদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কতটা তা পরিমাপ করা কঠিন। পঞ্চাশ বছর রাজনীতি করলেন, প্রথম হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হলেন, আমার জানামতে তাঁর মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ কতবার তিনি ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছেন-

www.pathagar.com

যে মানুষটি কিছুই চাইলেন না তাঁর অন্তিম বাসনার কথাটা না লিখলে ভবিষ্যতে হয়ত আমিও স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারি।

জনাব অলি আহাদ সম্পর্কে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু মরহুম অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম সাহেবকে আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আচ্ছা ৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভঙ্গে ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত অমান্য করে অলি আহাদ সাহেব ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার ব্যাপারে প্রস্তাব আনলেন কেন এবং এত অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করলেন কেন? তিনি তো তখন কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্বস্ত লোক ছিলেন।"

অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন- আমার প্রশ্নের পর তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন যাকে বলে "Pregnant Silence" অনেকক্ষণ পর ইংরেজীতে বললেন "Are you really curious to know about it?" আমি বললাম 'yes' তিনি বললেন: I am not sure to what extent Oli Ahad was involved with the Communist Party. But one thing I can say with utmost certainety , Oli Ahad is not an ideologue. He has not taken in the past nor shall take dictation from any authority or party if it is not aimed at welfare of the people & country. I repeat Mr. Oli Ahad is not an ideologue- his only political religion is "Patriotism" আমার মনে হয় অলি আহাদ সাহেবকে বোঝার জন্য এর বেশী বলার নেই।

[অধ্যাপক মোমেনুল হক ঃ বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও শিক্ষক।]

www.pathagar.com

একজন স্পষ্টবাদী অলি আহাদ

ডঃ তারেক শামসুর রেহমান

অলি আহাদ রাজনীতি করেন। লেখকও বটে। বইও লিখেছেন একটি, 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫'। তবে তার লেখক সত্তা হারিয়ে গেছে রাজনীতির কারণে, যেখানে তিনি সফল নন। কিশোর বয়স থেকেই রাজনীতির সাথে জড়িয়ে আছেন। আজো রাজনীতির পথে হাটছেন। অলি আহাদ কি তাহলে একজন ব্যর্থ রাজনীতিবিদ? তাকে মুল্যায়ন করার সাহস আমার নেই। একজন সাধারণ মানুষ আমি। রাজনীতি বিজ্ঞানের ছাত্র। রাজনৈতিক পরিবারেই আমার জন্ম। সেই ছোটবেলা থেকেই রাজনীতি দেখতে দেখতে বড় হয়েছি। আজও দেখছি। তবে সে দেখার মাঝে পার্থক্য রয়েছে যথেষ্ট। বয়স, বিবেক, মেধা আর জ্ঞানের সমন্বয়েই চলমান রাজনীতিকে দেখছি। আর এভাবেই আমার পরিচয় অলি আহাদের সাথে। আমি এক সময় খুব গর্ব অনুভব করতাম যখন তিনি ফোনে আমার প্রকাশিত কোন রাজনৈতিক প্রবন্ধ পড়ে মন্তব্য করতেন। নিংসন্দেহে তিনি একজন বড় মাপের মানুষ। এই মানুষটি যখন আমার লেখার শেষটুকু পড়েন, তখন আমার ভালো লাগে। ইদানিং যদিও তার সাথে আমার আর কথা হয় না।

লেখার শুরুতে একটি প্রশ্ন রেখেছিলাম-অলি আহাদ কি একজন ব্যর্থ রাজনীতিবিদ? প্রশ্নটি রেখেছি একারণে যে একজন রাজনীতিবিদের চাওয়া-পাওয়া থাকে। রাজনীতিবিদের মূল টার্গেটই হচ্ছে ক্ষমতায় যাওয়া। এই ক্ষমতায় যাওয়াটিকে তারা দেশ সেবা হিসাবে মনে করেন। রাজনীতিবিদরা হচ্ছে কৌটিল্য ম্যাকিয়াভেলির আদর্শ রূপ। সেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আসনে রাজার উপদেষ্টা হিসাবে ব্রাহ্মণ পন্ডিত কৌটিল্য। ক্ষমতায় থাকার জন্য সব ধরণের শঠতা, চতুরতা, ক্ষমতা প্রদর্শনের কথা বলেছিলেন কৌটিল্য। একই ধরণের কথা বলেছিলেন ম্যাকিয়াভেলী তার 'দি প্রিন্স' গ্রন্থে। মূল কথা ক্ষমতায় থাকা ও ক্ষমতায় যাওয়া। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কতটুকু সফল হয়েছেন, সেটি ভিন্ন কথা। কিন্তু তারা যে কৌটিল্য আর ম্যাকিয়াভেলির জন্যে আদর্শ থেকে সরে যাবেন-এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের অনেকেই হয়ত জীবনে কৌটিল্য কিংবা ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রদর্শন পড়েন নি। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে অনেকটা অজান্তেই কৌটিল্য আর ম্যাকিয়াভেলিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ অলি আহাদের অবস্থান কোথায়? তিনি রাজনীতি করেছেন। এবং প্রচলিত অর্থে তিনিও ক্ষমতায় যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমতায় যান নি কিংবা যেতে পারেননি। তাহলে কি বলবো এটা তার ব্যর্থতা ?

ভাষা আন্দোলনের প্রথম দিককার কথা, সেই ১৯৪৮ সালের মার্চে তিনি আন্দোলন করতে গিয়ে জেলে গিয়েছিলেন। ১৯৫১ সালে যুব লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অলি আহাদ। ১৯৫২ সালে মহান ভাষা আন্দোলনে যুবলীগের ভূমিকা কারো কাছে অজানা নয়। ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেফতার বরণ করেছিলেন তিনি। তারপর আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগ যখন গঠিত হয়, তখন ১৯৫৩ সালে অলি আহাদ ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক। তারপর সাংগঠনিক সম্পাদক। আওয়ামী লীগে থেকে ১৯৫৭ সালের সেই ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন সোহরাওয়ার্দীর সাম্রাজ্যবাদী নীতির। প্রতিবাদ করেছিলেন আরো একজন মওলানা ভাসানী। ফলশ্রুতিতে অলি আহাদ সাসপেন্ড হলেন। ভাসানীর সাথে আওয়ামী লীগ থেকে বেড়িয়ে এসে গঠন করলেন ন্যাপ। দায়িত্ব নিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের। কিন্তু এখানেও তিনি তার অবস্থান ধরে রাখতে পারলেন না। ১৯৫৮ সালে জেল ও ১৯৬৩ সালে জেল থেকে বেড়িয়ে আসার দীর্ঘদিন পর আতাউর রহমানকে সাথে নিয়ে গঠন করলেন জাতীয় লীগ। তিনি হলেন এই দলের সাধারণ সম্পাদক। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে যে ক'জন রাজনীতিবিদ মুজিব শাসনের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। অলি আহাদ ছিলেন তাদের একজন। তার এই প্রতিবাদের কারণে তাঁকে মুজিব আমলে কারাভোগ করতে হয়। আগষ্টের ('৭৫) রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরই তিনি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। পঁচাত্তর পরবর্তী রাজনীতিতে জাতীয় লীগ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে, তিনি গঠন করেছিলেন ডেমোক্রেটিক লীগ। আজ তিনি এর সভাপতি। পঁচাত্তর পরবর্তী রাজনীতিতে বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির জন্ম এ দেশের রাজনীতিতে নতুন একটি মাত্রা যোগ করেছিল। অলি আহাদের মত ব্যক্তিত্ব এই প্রক্রিয়ায় নিজেকে জড়িত করেননি। ক্ষমতায় গিয়ে দল গড়া-এই প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করতেন না অলি আহাদ। আর এ কারণেই ক্ষুদ্র পরিসরে ডেমোক্রেটিক লীগ দিয়ে তিনি আজো রাজনীতির ময়দানে সোচ্চার। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে, ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের জন্ম দিয়ে যে রাজনীতির শুরু, সেখানে কি পেলেন তিনি ? হয়তঃ জবাব আসবে 'হালুয়া-রুটির' জন্য অলি আহাদ রাজনীতি করেন নি। কথাটা হয়ত সত্য। কিন্তু তার চাইতেও বড় সত্য রাজনীতি করে মানুষ কিছু নীতি বাস্তবায়ন করার জন্য। আর নীতি বাস্তবায়ন করতে হলে অবশ্যই ক্ষমতায় যেতে হবে। তবে বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থেই ভালো কিছু করা কঠিন জিনিস। ভাসানী ক্ষমতায় যাননি। কেননা তিনি ক্ষমতায় যাবার রাজনীতি করতেন না। মুজিব গিয়েছিলেন। কিন্তু বির্তকিত হয়েছিলেন তিনি। আজো মৃত মুজিবের ভুল রাজনীতি মানুষ স্মরণ করে। আতাউর রহমান প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন বটে। কিন্তু তিনি জাতীয় রাজনীতিতে তেমন কোন অবদান রাখতে পারেননি। অলি আহাদ প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন, নিদেনপক্ষে মন্ত্রী হওয়া তার জন্য কঠিন কিছু ছিল না। কিন্তু হননি। আর আজ মানুষ তার দল সম্পর্কে জানে খুব কমই।

আজীবনই 'বিদ্রোহী' অলি আহাদ। এই 'বিদ্রোহী' মনোভাব একদিকে তাকে 'বিতর্কিত' করেছে যেমনি, তেমনি অন্যদিকে তিনি প্রশংসাও কুড়িয়েছেন। এরশাদ জামানায় ছ'বার তাঁকে জেলে নেয়া হয়েছিল। সামরিক আদালতে তার বিচার হয়েছিল ১৯৮৪ সালে। এরশাদের সামরিক শাসনামলে সামরিক আদালতে দাঁড়িয়ে এরশাদের বিরুদ্ধে কথা বলতেও তিনি পিছ পা হননি। সেদিন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, "এই প্রসঙ্গে (এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণ) হয়ত তার সাময়িক ব্যক্তিগত সুবিধা হবে, কিন্তু সমস্ত জাতির ভাগ্যে নেমে আসবে বিপর্যয়। পরবর্তিতে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সাংবিধানিক কাঠামো হবে ধ্বংস প্রাপ্ত। সেটাই আজ ঘটছে।" তবে এটা সত্য। যে আদালত তার বিচার করেছিল, সেই আদালতের জন্ম নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুললেও, তিনি স্বীকার করেছিলেন, "সামরিক আইন একটি

www.pathagar.com

বাস্তবতা। সেহেতু আমাকে মাননীয় আদালতকে মানতে হয়।" অলি আহাদের এই বক্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাস্তবতাকে এবং প্রচলিত আইনের প্রতি তিনি সম্মান দেখিয়েছেন। সামরিক আইনকে তিনি সমর্থন করেননি। সামরিক শাসনকে সমালোচনা করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। কিন্তু বিদ্যমান ব্যবস্থার প্রতি তিনি সম্মান জানিয়েই তার সমালোচনা করেছিলেন। আর এ কারণেই অলি আহাদ অনন্য। যার যতটুকু প্রাপ্য, তাকে ততটুকু দিতে তার এতটুকু কার্পন্য নেই। এক সময় মুজিবের খুব কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। অথচ তাকে সমালোচনা করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। মনে আছে বেগম জিয়া যখন বিরোধী দলে, তখন তার পাশে থেকে তার প্রতি সমর্থন ছুড়ে দিয়েছিলেন। যতদূর জানি সময়-অসময়ে বেগম জিয়া তার কাছ থেকে পরামর্শও নিতেন। বেগম জিয়া আজ আবারো সরকার গঠন করেছেন। আমার ধারণা ছিল অলি আহাদের মত ব্যক্তিত্ব যিনি বিএনপির মিত্র ছিলেন, তাকে সংসদে দেখতে পাবো। অলি আহাদ যদি সংসদে যেতে পারতেন, আমার বিশ্বাস তার কাছ থেকে দেশ ও জাতি কিছু আশা করতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। বিএনপির সাথে ৭ দলের দূরত্ব এখন বেড়েছে। বিএনপি গড়ে তুলেছে চারদলীয় ঐক্যজোট, ৭ দল তথা অলি আহাদ এখানে উহ্য। তবুও অলি আহাদের মত ব্যক্তিত্বের চাওয়ার কিছু নেই। তিনি বর্তমানে সরকারেরও সমালোচনা করেছেন তার চিরাচরিত ভঙ্গীতে। অতীতেও রাখ-ঢাক করে কথা বলতেন না। আজও বলেন না। এটাই তার স্বভাব। তার সর্ম্পকে আমার জানার খুব বেশী সুযোগ হয়নি। তবুও তার বই পড়ে, তার মতামত পত্রিকার পাতায় দেখে যতটুকু আমার মনে হয়েছে একজন ব্যক্তি অলি আহাদের এই সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের দুর্ভাগ্য তিনি ৭৪-এ পা দিয়েছেন।

পশ্চিমা সমাজে ৭৪ খুব বেশী বয়স নয়। কিন্তু আমাদের এখানে বেশী। শরীরও সুস্থ নয়। অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। কিন্তু অসুস্থতা তাঁকে কাবু করতে পারেনি কখনো। কখনো কখনো আমার মনে হয়েছে তার মত ব্যক্তিত্বকে আমরা মূল ধারায় পেলাম না কেন। জবাবও খুঁজে পেয়েছি এক সময়। কালো টাকা, মাস্তানতত্ত্ব, পদলেহীতা, মিথ্যাবাদীতা আমাদের রাজনীতিকে নোংরা করে দিয়েছে। এই নোংরা রাজনীতি দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। নষ্ট করে দিচ্ছে সব ধরনের নিয়মনীতি, শৃংখলা আর ভালোলাগা। এই নষ্ট সমাজে অলি আহাদের মত লোক অচল। তবুও তিনি থাকুন তার নিজস্ব বলয় নিয়ে। থাকুন তার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর নিয়ে। আমরা ভাববো এই নষ্ট হয়ে যাওয়া সমাজে তবুও একজন মানুষ আছেন, যিনি সুবিধার কাছে মাথা নত করেননি। এবং আগামীতেও করবেন না। মাথা নত না করার এই যে রাজনীতি- এই রাজনীতি তাকে আরো অনেক দূরে নিয়ে যাক। আমাদের প্রত্যাশা এটাই।

[ডঃ তারেক শামসুর রেহমানঃ অধ্যাপক জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজনৈতিক নিবন্ধকার]

www.pathagar.com

অর্ধ-শতাব্দীর চলমান ইতিহাসঃ অলি আহাদ

আসাদ চৌধুরী

ছোটবেলা থেকেই আমার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, গল্পের বইর নায়কই নন, তরতাজা কিছু মানুষ আমার কাছ থেকে হিরোর মর্যাদা পেয়ে আসছেন, তাদের মধ্যে অলি আহাদ একজন। রবীণ হুড, দস্যু মোহন, বাহরাম এরা যেমন প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন, গাজীউল হক, আবদুল মতিন, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, এমাদউল্লাহ, শেখ মুজিব, মওলানা ভাসানী অর্থাৎ মুসলিম লীগের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, দেশ ও সমাজকে সচেতনতা উপহার দিয়েছিলেন, সংঘবদ্ধ করার প্রয়াস নিয়েছিলেন- তাঁরা আমার ভীষণ প্রিয় ছিলেন। এদের মধ্যে এমাদউল্লাহকে আমি চোখে দেখিনি-আর আমার প্রিয় হিরোদের দেখেছি অনেক পরে-মুক্তিযুদ্ধের সময় গাজীউল হক এবং আরো অনেক পরে মতিন ভাইকে।

ভাষা আন্দোলনে যুক্তফ্রন্ট গঠনে, সরকারের পতনের ব্যাপারে আমাদের পরিবারের ভূমিকা উজ্জ্বল। আমার বাবা মরহুম মোহাম্মদ আরিফ চৌধুরী (বশীর আল হেলাল বাংলা একাডেমীর ইতিহাস লিখতে গিয়ে বন্ধনীতে ধানু মিয়া লিখেছেন, আব্বার ডাক নাম ধনু মিয়া, এই সুযোগে সংশোধন করে নিলাম) কংগ্রেস করলেও নেহেরুর এক ভাষণের পর মুসলিম লীগে চলে এসেছিলেন।' ৪৬ এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে যুক্তবঙ্গের শেষ আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান হাসেলের আগে-পরে টের পেয়েছিলেন সাধারণ গরিব-দুঃখীদের জন্য এই আজাদী আসেনি। তখন থেকেই তিনি মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনীতির উদ্যোগ নেন। আমার চাচাতো ভাই বাহাউদ্দীন চৌধুরী মুসলিম লীগ বিরোধী আন্দোলন করে সেই উত্তাল সময়ে জেল খেটেছিলেন, তাঁর কক্ষ সঙ্গী ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমার এক চাচা আবদুর রহমান চৌধুরী (পরে মাননীয় বিচারপতি) যেমন পাকিস্তান আন্দোলনে তেমনি মুসলিম লীগ বিরোধী আন্দোলনে জোরালো ভূমিকা রেখেছিলেন, তখনও তিনি ছাত্রই ছিলেন। আমাদের পরিবারের কৃতি সন্তান আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ছাত্রাবস্থায় লিখেছিলেন 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী' আমাদের বরিশালের আবদুল লতিফ পরে আলতাফ মাহমুদ এই কবিতায় সুরারোপ করেছিলেন। আমার ফুফাতো ভাই আমিনুল হক চৌধুরী নির্বাচনে প্রাদেশিক আইন পরিষদের যুক্তফ্রন্টের নৌকা নিয়ে জয়ী হয়েছিলেন।

অলি আহাদ, এই নামটি, '৪৯-'৫৪-র দিকে বহুল উচ্চারিত একটি নাম। যিনি আন্দোলন করেছেন, সংগঠন করেছেন, যুব লীগকে মায়ের আঁচল দিয়ে ঢেকে রক্ষা করেছেন, সংগঠনের স্বার্থে পুলিশের হাতে ধরা-না-পড়ে গোপনে কাজ করেছেন। আমার প্রিয় হিরোদের একজন এই অলি আহাদ। যিনি এই বয়সেও, জনপ্রিয়তা বা জেল জুলুমের তোয়াক্কা না-করে জাতিকে সতর্ক করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সত্য ও বিবেকের তাড়না তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন।

ক্ষমতালোভী রাজনীতিচর্চার ব্যর্থতার পরিমাণ আমরা যতোটুকু ভাবছি, হয়তো, তারও চেয়ে বেশিই হবে, কম হবে না। অর্থাৎ যে ত্যাগ এদেশের সৎ রাজনীতিবিদগণ স্বীকার করে

www.pathagar.com

নিজেদের পরিবারে নিজেদেরকে প্রায় অপদার্থের পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন তার পরিমাণও তো কম নয়। পাশাপাশি সুবিধেখোর মানুষগুলো চাটুকারিতা চামচামি করে ক্ষমতাকে কীভাবে কলুষিত করেছে এবং করছে তা তো হরহামেশাই দেখছি। রাজনৈতিক আচরণে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সামান্য প্রতিফলনও আমরা দেখি না অথচ গণতন্ত্রের জন্য মাইক-ফাটানো ব্যক্তিত্বের অন্ত নেই। প্রতিপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না-হওয়ায় সন্দেহ সংশয় বেড়ে যাচ্ছে এবং এক পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য যে-কোন নীচু পর্যায়ের কাজেও পিছ-পা হচ্ছে না। গত কয়েক সপ্তাহ (সেপ্টেম্বর/ অক্টোবর, ২০০২) ধরে কাগজে যে-সব লেখালেখি হচ্ছে এ-সব পড়ে আমি যদি এ-রকমই কিছু ভেবে বসতে বাধ্য হই, তাহলে বোধ হয় তেমন দোষের হবে না। এই অবস্থায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন নিতান্তই অলীক স্বপ্ন-আর এই অনৈক্য আর যাই হোক গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করতে পারবে না। কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি এবং আড়ৎদারির ভঙ্গির অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সামন্তবাদী ধ্যানধারণায় অভ্যস্ত এই সমাজটিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পরবর্তী বৃটিশ-রাজ, গোটা উপমহাদেশের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে মহাত্মাগান্ধী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ-বাম সংগঠনসমূহ যে-উলোট-পালোট করে গেলেন, সেই লিগেসি নিয়েই এই অঞ্চল। পাকিস্তান অর্জিত হবার পর স্বপ্নভঙ্গের কারণ শুধু নানকার বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, রাজশাহীর খাপড়া ওয়ার্ডে গুলিবর্ষণই শুধু নয়, আমাদের ভাষা সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র, জাতিসত্তার বিলোপ ঘটানোর যে সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য আয়োজন চলছিলো আমাদের সৌভাগ্য আমাদের অগ্রজরা তা রুখতে পেরেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতার রাজনীতির দাপটে ঘুরে ফিরে সেই দুষ্টচক্রের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছে সমাজ। সংসদে না গিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় নজির হিসেবে আমাদের দেশটি সম্ভবত দুর্নীতির মতোই এ ক্ষেত্রেও চ্যাম্পিয়ন হবে।

যে সহে, সে রহে। অলি আহাদের মতো নির্ভীক, তেজস্বী সাহসী ও নির্লোভ মানুষটি সমাজের এই কাপুরুষ আপ্তবাক্যটি মেনে নেননি বলেই বিভিন্ন সময়ে পদে পদে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, সেই পাকিস্তানী আমলে, তাঁর সবচেয়ে গৌরবময় প্রহরে- (তাঁর বইটি 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫' এই দিক থেকে অভিজ্ঞতার, তত্ত্ব ও তথ্যের দিক থেকে ঐতিহাসিকদের কাছে আকরগ্রন্থ হিসেবেই বিবেচিত হবে এক সময়) এমন কি বিপুল ত্যাগের বিনিময়ে, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশেও-বিনা বিচারে জেলখানায় ধুঁকে ধুঁকে প্রহর গোণার কাজটি তাঁকে করতে হয়েছিল। কারণ একটাই তার অনাপোসী মনোভাব- যা সত্য বলে বুঝেছিলেন, সেখান থেকে বিন্দুমাত্র সরে না-আসার দৃঢ় অঙ্গীকার।

মওলানা ভাসানীকে সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদরা যেমন ব্যবহার করেছেন- আমার কেন যেন মনে হয়-(মনে হওয়াটা মোটেও উচিৎ হচ্ছে না) অলি আহাদকেও বোধহয় ব্যবহার করা হয়েছে। এবং তিনিও কখনো রাজনৈতিক জেদের কারণেই এমন সব লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে যার বিন্দুমাত্র যোগ নেই। এর ফল তার জন্য তো বটেই, রাজনীতিতেও নতুন কোনো মাত্রা যোগ করতে পারেনি। মওলানা ভাসানীকে, তাঁর মতো অসাম্প্রদায়িক লোক আমার চোখে কম পড়েছে, যেমন তার প্রতিপক্ষ এবং সহযোগীরা নির্দ্বিধায় সাম্প্রদায়িকতার জোব্বা পরিয়ে দিয়েছেন তাঁর ভারত-বিদ্বেষী মনোভাবের জন্য, অলি আহাদ যিনি মনে প্রাণে অসাম্প্রদায়িক-তাঁর কাঁধেও এই জোব্বা চাপানো হয়েছে। মুজিব বিরোধী হিসেব যিনি যে-সময়ে পরিচিতি লাভ করেছেন,

www.pathagar.com

সেই পঞ্চাশের দশকেই আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে গিয়ে যে বিরোধ-এবং যেখানে তিনি লড়াকু সৈনিকের ভূমিকা নিয়েছিলেন-দেশ স্বাধীন হবার পর, দুর্ভাগ্যবশত তাঁকে অন্য অবস্থানে দেখা যায়। ব্যক্তিগত কারণ অবশ্যই থাকতে পারে- কিন্তু রাজনীতিতে তার প্রভাব সুফল বয়ে যে আনেনি-১৫ আগস্ট ঘটনার পর যারা রাজনৈতিকভাবে সুবিধাটুকু নিয়েছেন বা নিচ্ছেন-তাদের সঙ্গে অলি আহাদের সম্পর্কের অমিলটুকু রাজনৈতিকভাবে সনাক্ত করা হয়তো একটু কঠিনই হয়ে পড়বে। বোধহয় অতি সরলীকরণের ঝুঁকি নিলাম। অথচ অলি আহাদ যিনি, সৎ, সাহসী নির্ভীক, তেজস্বী, ত্যাগী এই জমানায় এই গুণের মানুষ পাওয়া প্রায় দুর্লভ- কীভাবে পরিস্থিতির শিকার হয়ে রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়লেন। বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি বঞ্চনার শিকার হয়েছেন (শুধু তিনি নন, তার অগ্রজ এবং অনুজেরাও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন) তবু তিনি থেমে থাকেন নি।

উপমহাদেশের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূল্যায়নে তিনি যে মেধা ও যোগ্যতা প্রদর্শন করেছেন তার তুলনা হয় না, অথচ নিজেকে তিনি সেভাবে দাঁড় করাতে পারেন নি।

বর্তমান রাজনীতিতে রাজনীতিবিদদের চেয়ে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদেরই দাপট ও প্রভাব বেশী। সেখানে অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, সেনাবাহিনীর অবসর প্রাপ্ত অফিসার, বৈধ বা অবৈধভাবে অর্জিত বিপুল বিত্তের ব্যবসায়ীদের প্রতাপের সামনে রাজনীতিবিদরা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ছেন-এছাড়া ডাইনেস্টি স্টাইল তো উপমহাদেশে আর নতুন কিছু নয়। রাজনীতিতে দূরত্তায়ন কতোটা গভীরতা পেয়েছে সঠিক জানিনা, তবে পেশাদার সন্ত্রাসীরা যেভাবে রাজনৈতিক প্রশ্রয় ও আশকারা পেয়ে আসছে, আইন শৃঙ্খলার অবনতির পাশাপাশি এ-সবও রাজনৈতিক আচরণে প্রভাব ফেলবে। এ পরিস্থিতিতে জনগণের ওপর আস্থাশীল অলি আহাদের মতো বড়ো মাপের মানুষ সমাজ পরিবর্তনে কী ভূমিকা রাখবেন বা রাখতে পারবেন আমি জানি না। তবে মাঝে মধ্যে তিনি যখন বিবৃতি দেন সেখানে সত্য ভাষণ দেখে বিচলিত বোধ করি। বেআক্কেল বোকা, গাঁজা বা আফিমখোর মানুষগুলোর মুখেই সাহসী সত্য-উচ্চারণ শোনা যায়, আর সবই তো গোঁজামিল। মন্ত্রী-মিনিস্টারদের আয়ের উৎসই হোক-প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ডাঃ বি. চৌধুরীর পদত্যাগই হোক - তাঁর, অলি আহাদের, অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ় এবং অনড়।

ইলা মিত্রের সংবর্ধনায় রাশেদ খান মেননের কথায় একটি কবিতা পড়েছিলাম। নিজেকে যোগ্য মনে হয়নি- অলি আহাদের মত বড় মাপের মানুষের সম্পর্কে লিখতে গেলে যে যোগ্যতা প্রয়োজন, তাও আমার নেই, তবু, তাঁকে যে শ্রদ্ধা করি- সম্মান করি এবং মূল্যবোধের এই সংকটের প্রহরেও তাঁর কাছেই এখনও আমরা কিছু হলেও আশা রাখি, এই কথা বলার সুযোগটুকু নিলাম। জানি, অত্যন্ত ভালভাবেই জানি, তিনি লোভের বশবর্তী হয়ে কিছু বলবেন না, তিনি ভয় পেয়ে চুপ করে থাকবে না, ব্যক্তি স্বার্থ-প্রণোদিত হয়ে এমন কিছু বলবেন না বা করবেন না- যা দেশের ক্ষতি করবে, সমাজের ক্ষতি করবে।

অর্ধশতাব্দীর চলমান ইতিহাস অলি আহাদ সাহেবকে আমার শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন।

[কবি আসাদ চৌধুরীঃ সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষক]

www.pathagar.com

অলি আহাদের অপর নাম আপোষহীন সংগ্রাম

-শামসুজ্জামান মিলন

এক

বায়ান্ন'র স্বপ্ন পুরুষ
অলি আহাদ একটি নাম
আমাদের গর্ব, আমাদের পরিচয়
বাঙালির ইতিহাসে অনন্য, আজীবন সংগ্রাম।

রত্নগর্ভা মায়ের আদরের দুলাল
অসহায় নিপীড়িত মানুষের লোক
সাহসী পুরুষ, চির উন্নত শির
চেতনায় নজরুল, বঙ্গ শার্দুল, জাতীয় বীর।

সাত চল্লিশে, উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দানব
ধর্ম নিয়ে দাঙ্গা লাগায় ধ্বংস করতে মানব!

হিন্দু- মুসলিম ভাগাভাগি
সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার বিষধর অজগর
মানুষে মানুষে বিভেদ লাগায়
শোষন লুটপাট জুলুম চালায়

অসহায় লাঞ্ছিত শ্রমজীবী মানুষের
মুখের গ্রাস কেড়ে খায়।
মানুষ দেশ জাতি ও ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা
সুখ শান্তি নিরাপত্তার বদলে
জুলুম অত্যাচার হত্যা ধর্ষণ দাঙ্গা
শোষণ শাসন বিভাজন দীর্ঘ করে।
বাঙালি হিন্দু মুসলিম আবাল বৃদ্ধ বনিতা
হিংস্র উম্মাদ শ্বাপদের কচুকাটা অভিযান
বাংলার শহর নগর বন্দর
মাঠ, ঘাট, সবুজ প্রান্তর
রেলগাড়ী, লঞ্চ, স্টিমার
রক্তে রঞ্জিত, লুণ্ঠিত ঘরবাড়ী, দোকান কারখানা;
লাশ আর লাশ
খাল বিল নদীর পানি
রক্তের রং, বাতাসে অসহ্য দূর্গন্ধ।

দুই

আটচল্লিশে জিন্না এসে
ফরমান করলো জারী
উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা
সারা পাকিস্তান জুড়ি।

ওরা কেড়ে নিতে চায় মায়ের ভাষা
ধর্মের নামে চির তরে মুছে দিতে চায়;

www.pathagar.com

শুধু তাই নয়
বাংলা অক্ষর বিনাশ করে দিতে চায়
একদল ক্রিমিনাল, বাংলা হরফে আরবী আদল
দিতে চায়, প্রতিক্রিয়ার সেবাদাস
দেশ জাতি জনতার চির দুশমন
বেঈমান চাটুকার এফ. রহমান!

তিন

ঊনপঞ্চাশ সাল, জিন্নার পর লিয়াকত আলী,
পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র; খসড়া প্রস্তাব পেশ
পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন উপেক্ষিত
আমাদের স্বপ্ন বিকাশ আকাংখার সর্বনাশ !
চরম বিক্ষোভ, বিপ্লবী প্রতিবাদ
সামনের কাতারে একটি নাম অলি আহাদ।
শাসক শোষক সামন্ত জমিদার
বিদেশী দালাল রাজনীতির বেড়াজালে
গড়ে উঠে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ
আবার ধর্মের রাজনীতি
আবার প্রতিবাদ
অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির দাবীতে পদত্যাগ
অনন্য অসাম্প্রদায়িক অলি আহাদ।

চার

ঊনিশ'শ একান্ন সাল
বাঙালি চেতনায় বিকশিত তরুণ সমাজ
প্রগতির ঝাণ্ডা উর্ধ্বে তুলে ধরে
গণতান্ত্রিক যুব লীগ, অসাম্প্রদায়িক ধারা
নতুন সড়ক, প্রগতির পথ
অলি আহাদ প্রথম সম্পাদক
হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান সবাই একমত।
মায়ের ভাষার সম্মান
রাখবোই, যে করেই হোক
যদি দিতে হয়, দিয়ে দেবো প্রাণ।
অন্যায়, অবিচার, অনিয়ম বিনাশে
লাগাতার লড়াই আপোষহীন
সুমহান ত্যাগ, লোভ, মোহ, ব্যক্তিস্বার্থ
কখনো আচ্ছন্ন করেনি যাকে,
গদির লিপ্সা, শাসকের টোপ
প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, শতবাধার বেড়াজাল
টলাতে পারেনি একচুল
সত্য ন্যায় আর আদর্শের প্রতীক
জনস্বার্থে অটল অবিচল
একটি নাম অলি আহাদ
জুলুম অন্যায় অত্যাচার শোষন
অবিচারের বিরুদ্ধে
অবিরাম প্রতিবাদ .....।

www.pathagar.com

অলি আহাদ আপোষহীন যোদ্ধা

ইসমাইল হোসেন বেঙ্গল

"সমাজ ও মানুষের কল্যাণের জন্য, দেশের অগ্রগতি সাধনে রাজনীতি করতে হলে অনেক কষ্ট সইতে হবে। নির্যাতন নিপীড়ন সইতে হবে। দৈন্য জীবন বরণ করে নিতে হবে। হাজারো লোভ লালসার মাঝে নিজেকে সততার সহিত অটল রাখতে হবে। বিপদের যত বড় ঝড় ঝাপটাই আসুক অম্লান বদনে সহ্য করে নিতে হবে। আর তা যদি পারেন ইতিহাসের কোনায় বিজয়ীর নামটি থাকতেও পারে। আর দালালী করলে আমার সাথে চলে লাভ নেই। আমি ভিন্ন পথের মানুষ। আমি নগদ চাই না। দালালী আমাকে দিয়ে হয় না, হবে না। অনেকেই আছেন যারা রাজনীতির ব্রত জীবন ছেড়ে দালালী করে সটকাট পথে মন্ত্রী, প্রধান মন্ত্রী কিংবা বেনিফিসারী হয়েছে। তাদের কথা আলাদা। এ জাতীয় লোক সর্বকালেই ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। তা নিয়ে আমি কখনো চিন্তা করি না। রাজনীতিতে প্রত্যেকটি মানুষের একটি এইম এন্ড অবজেক্ট থাকতে হবে। স্বপ্ন এবং আদর্শ ছাড়া রাজনীতি কখনো মানুষের কল্যাণ আনতে পারে না। রাজনীতিবিদও তার মঞ্জিলে পৌছতে পারেনা। আমার পথ, আমার ষ্টাইল ভিন্ন। সেজন্যে আমার সাথে অনেকের মিল হয়না। আমি সব সময় সত্য কথা বলতে চাই, সৎ পথে চলতে চাই। যতদিন বেঁচে আছি সত্য কথা বলবোই। তাতে কেউ পছন্দ করুক অথবা না করুক তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তাতে আমি দুঃখিতও নই"।

এক নিমিষে কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন বর্তমান রাজনৈতিক অঙ্গনের সব চাইতে পোড় খাওয়া বর্ষিয়ান অথচ চীর সবুজ, ৫২-র ভাষা আন্দোলনের প্রধানেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম স্থপতি, মজলুম জননেতা অলি আহাদ।

অর্ধশতাব্দীর বেশী সময় ধরে বৃটিশ, পাকিস্তান এবং স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে অলি আহাদ বিরতিহীন ভাবে সবচাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছেন।

প্রায় ছয় দশকের মত রাজনৈতিক জীবনে অলি আহাদ বহু জাতীয় বিবর্তন পরিবর্তনের অগ্রসৈনিক থেকেও কখনই নিজের আদর্শ বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দেননি। সমকালীন রাজনীতিতে অলি আহাদ একজন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। দার্শনিক চরিত্রের অধিকারী অলি আহাদ চলনে বলনে নিজস্ব একটা ষ্টাইল লালন করেন। যা আজকের দিনে খুব একটা চোখে পড়ে না। হাজারো সমস্যা সংকুল রাজনীতিতে বড়রা যখন স্বার্থপরের মত কৌশল করে অপেক্ষা করেন, আত্মরক্ষায় নিজেকে আড়াল করে রাখেন, নিজস্ব দায়িত্ব অবস্থান থেকে পালিয়ে স্বার্থপরের মত বাঁচতে চান। অলি আহাদ তখন বিবেকের ভুমিকায় সোচ্চার হন, মহাবিদ্রোহীর মত গর্জে উঠেন। প্রতিবাদ করেন, সমালোচনা করেন, কখনও কখনও জাতীয় অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পরামর্শ দেন, পথ দেখান জাতিকে। এজন্য আহতও হন, আঘাতপ্রাপ্তও হন। তবুও নীতিতে অনড় পথ চলতেই থাকেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র অলি আহাদ একজন সাচ্চা দেশপ্রেমিক, আপাদমস্তক সার্বক্ষণিক রাজনীতিবিদ, সমসাময়িক কালে অলি আহাদের মত বয়সে অভিজ্ঞতায় এবং

www.pathagar.com

দেশের মানুষের প্রতি দয়া, প্রেম ও নীতি-আদর্শের প্রতি অবিরল ধারাবাহিক বলিষ্ঠতা রক্ষা করে হিমালয়ের মত চরিত্র নিয়ে চলতে দ্বিতীয় জন খুঁজে পাওয়া যায় না এই বাংলাদেশে।

সাবেক কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ইসলামপুর গ্রামে ১৯২৮ সালে জনাব অলি আহাদ জন্মগ্রহণ করেন। সে মোতাবেক তাঁর বয়স প্রায় ৭৫ বৎসর। এ বয়সেও অলি আহাদ চির তরুণ, চির যুবা। বিশেষ করে তাঁর একাকী চলনে তার ক্ষুরধার অনলবর্ষী বক্তৃতায় আজকের ২৫ বছরের যুবককেও হার মানায়। অলি আহাদের বাবা মরহুম আব্দুল ওহাব ছিলেন ডিষ্ট্রিকট রেজিষ্ট্রার। সংগত কারণেই পড়াশুনার প্রতি শৈশব কাল থেকেই একটা গাইডেন্স ছিল। ছাত্র হিসাবে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ১৯৪৪ সালে হোমনা হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে অলি আহাদ ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। কিশোর অলি আহাদ স্কুল জীবন থেকেই মূলতঃ রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং ভারতের মুসলমানদের মুক্তির জন্য রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। তদানীন্তন ভারতীয় মুসলিম সমাজে যে জাগরণ গড়ে উঠে সময়ের সে আন্দোলনের সু-বাতাস কিশোর অলি আহাদের মনকে আলোড়িত করে উজ্জীবত করে তোলে। সেই সময়কার রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিশেষ করে এ অঞ্চলে মুসলিম জাগরণে অলি আহাদের মনে রেখাপাত করে। তাছাড়া পড়ার প্রতি আগ্রহী অলি আহাদ বিভিন্ন পত্র পত্রিকা পাঠ করে খেলার মাঠে কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিজয় কিংবা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর রচনা সমগ্র কিংবা বিখ্যাত গায়ক আব্বাস উদ্দীনের মুসলিম রেঁনেসার উদ্দীপনামূলক গান তখনকার দিনের মুসলমান তরুনদের মতই অলি আহাদকে রাজনীতিতে উদ্দীপ্ত করে ভারতের বুকে মুসলমানদের স্বীয় এবং স্বতন্ত্র বাসভূমি প্রতিষ্ঠা করার দাবী অলি আহাদের কচি মনে দারুনভাবে বাসা বাঁধে। যার ফলশ্রুতিতে অপরিণত বয়সে প্রস্তাবিত মুসলমানদের বাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা দাবীর একজন সক্রিয় ছাত্রকর্মী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের আলাদা বাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দানা বাঁধে। এ সময় সারা দেশে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে দারুন চেতনা পরিলক্ষিত হয়। ছাত্র সংগঠনগুলি নিজস্ব আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার মানসে সংগঠিত হতে থাকে।

১৯৪৪ সালে ঢাকা কলেজে পড়াকালীন অলি আহাদ ছাত্র রাজনীতির সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন। ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী অলি আহাদ পাকিস্তান আন্দোলনের পুরোধা সংগঠন মুসলিম কর্মী শিবিরের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এ সময় তিনি মুসলীম ছাত্রলীগে এত বেশী জড়িয়ে পড়েন যার কারণে ১৯৪৬ সালে আই,এস,সি, পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হয়নি। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে তিনি আই,এস,সি পরীক্ষা দেন এবং কৃতিত্বের সাথে পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি,কম, ক্লাসে ভর্তি হন। বি,কম, পড়া এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে থাকাকালীন অলি আহাদের নাম একজন সাহসী দৃঢ় সত্যবাদী সম্ভাবনাময় বিপ্লবী তরুণ ছাত্র নেতা হিসাবে তখনকার দিনের ছাত্রনেতা বা বিভিন্ন পেশার অলি আহাদের বন্ধুরা তাকে আগামী দিনের এক উজ্জল সম্ভাবনাময় ছাত্র নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবে বলে নিশ্চিত হন। কারণ অলি আহাদ নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছেন। তার জীবন চলার পথে সময় জ্ঞান বিরাট একটি গুণ পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ধৈর্য্য, সাহস, কর্ম উদ্দীপনা, সাংগঠনিক দক্ষতা, লোভ লালসাহীন অধ্যবসায় সমৃদ্ধ সাচ্চা দেশ প্রেমিক চরিত্র চিত্রনে তরুন বয়সেই সবার দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হন। সব চাইতে বড়

www.pathagar.com

জিনিস অলি আহাদের সত্যবাদিতা ও সাহসিকতা তার বিরুদ্ধবাদীরাও স্বীকার করে। এরপর আর অলি আহাদ পিছন ফিরে তাকাননি। তিনি চলেছেন অবিরত, চলেছেন বাধা বিঘ্নহীন পথে। মুজাহিদের মত অকুতোভয়ে দৃঢ় সাহসীর ভূমিকায়। পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনে অলি আহাদ বহু বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসেন এবং নিজস্ব কর্ম ও চরিত্র গুনে নেতাদের দৃষ্টি কাড়েন। এসময় তিনি কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হক, খাজা নাজিম উদ্দিন, লিয়াকত আলী খাঁন প্রমুখ জাতীয় নেতাদের সান্নিধ্যে আসেন। খুব অল্প বয়সেই কর্মদক্ষতায় অলি আহাদ জাতীয় ছাত্র রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করেন। জনাব অলি আহাদ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

অলি আহাদের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে তিনি আন্দোলন করতে গিয়ে ১১ বছর কারাবরণ করেছেন। দুই বছরের অধিককাল আত্মগোপন করে থেকেছেন। তিনি প্রথম কারাবারণ করেন ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে' সময় ছিল ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ।

১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানের শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত মূলনীতি রিপোর্টে পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের অঙ্গিকার না থাকায় এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে অলি আহাদ তাঁর মূখ্য ভূমিকা পালন করেন।

মুসলিম ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অলি আহাদ সংগঠনকে অসাম্প্রদায়িক না করার প্রতিবাদে তারই গড়া সংগঠন থেকে তিনি পদত্যাগ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবী আদায়ে অলি আহাদ অন্যতম সংগঠকের ভূমিকা পালন করে। ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যুবলীগ। যার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অলি আহাদ। অলি আহাদের নেতৃত্বে যুবলীগই এদেশে প্রগতিশীল আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁর কর্মতৎপরতা নিরলস সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ও আন্দোলনে সাফল্য আনয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত ইতিহাস এ সংগঠনের অমূল্য অবদান। ৫০ সালে অলি আহাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি,কম, পরীক্ষায় প্রথম হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম,কম, ক্লাসে ভর্তি করা হয়নি।

রাজনৈতিক কারণে অলি আহাদকে বহিষ্কার করা হল। অথচ দেশ স্বাধীন হয়ে গেলো আজ অবধি অলি আহাদের উপর দেয়া বহিষ্কার আদেশ বাতিল করা হলনা। পৃথিবীর কোন জনপদে এ ধরনের ঘটনা চোখে পড়ে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যাও আজ অবধি দিল না। সেদিনের সংবাদপত্রগুলি এ বিষয়ে অনেক সম্পাদকীয় লিখে প্রতিবাদ করেছিল। নিয়তির কি পরিহাস যে মহান স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট তৈরী করার জন্য জীবনে ১১টি বছর অলি আহাদ জেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যৌবনে সর্বোত্তম সময়টি ব্যয় করে দেশের স্বাধীনতা এনেছিল সে অলি আহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিষ্কার আদেশ আজো অবধি কলঙ্ক হিসাবে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়ে গেল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রেক্ষাপট তৈরীতে অলি আহাদ এক অনন্য ভুমিকা রাখেন। তিনি অগ্রসৈনিকের ভূমিকা রাখেন। রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর উদ্যোগ ও কার্য্যকরি অগ্রণী ভূমিকা ইতিহাসের মূল্যায়নে প্রথম এবং প্রধানতম। তার সংগ্রামী উপস্থাপন তেজদীপ্ত বাগ্মিতা তৎকালীন ছাত্র ও যুব সমাজকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে উজ্জীবিত করে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল।

২১শে ফেব্রুয়ারীকে উপলক্ষ্য করে গণমানুষের মাঝে যে চেতনা দীপ্ত আন্দোলন

www.pathagar.com

পর্যায়ক্রমে গণআন্দোলনে রূপ নিয়েছিল তার রূপকার অলি আহাদ। ২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারীর জনতার যে গণ উত্তাল তরঙ্গ কিংবা শহীদ মিনার নির্মাণ এ সবই ঘটেছিলো মহা নায়ক অলি আহাদের নেতৃত্বে। ১৯৫৩ সালে অলি আহাদকে বন্দি করা হয়। তখন তিনি ব্রাহ্মনবাড়ীয়ায় অন্তরীন ছিলেন। অন্তরিন আদেশ বাতিল হলে তিনি মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন, যা পরবর্তী কালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগে রূপান্তরিত হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে অলি আহাদ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। জনাব অলি আহাদের সমসাময়িক অনেক প্রখ্যাত নেতাই এ কথা স্বীকার করেছেন যে অলি আহাদ ও মরহুম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মজলুম জননেতা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে সব চাইতে শক্তিশালী জুটি হিসাবে এ দেশের রাজনীতির ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেন। তাদের নেতৃত্বে ও অক্লান্ত পরিশ্রম প্রচেষ্টায় আওয়ামী লীগ এর সাংগঠনিক ভীত শক্তিশালী হয়। যার কারণে মুসলিম লীগ দৃশ্যপট থেকে সরে যাচ্ছিল। আওয়ামী লীগ এক নূতন মাত্রায় জনগণের মনে আসন গেড়েছিল। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগের কাগমারী সম্মেলনে অলি আহাদ পাক মার্কিন সামরিক চুক্তি ও বাগদাদ চুক্তি, সিয়াটো নামক সামরিক চুক্তি বাতিলের জোর দাবী জানান।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্লোগান দিয়ে এ দেশে জন্ম নিয়েছিল কম্যুনিষ্ট পার্টি। এটা ছিল কম্যুনিষ্ট পার্টির আদর্শিক ভিত্তি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে যে দু'জন নেতা বক্তব্য রাখেন তাদের মধ্যে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং অকমুনিষ্ট ব্যক্তিত্ব অলি আহাদ। সেদিন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার অলি আহাদকে নেহেরুর দালাল হিসাবে আখ্যায়িত করেছিল। এর মাসুল তাঁর সাথে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকেও দিতে হয়েছিল।

এ কারণে অলি আহাদ দল থেকে সাসপেন্ড হলেন। এর প্রতিবাদে আইন পরিষদের ৮ জন সদস্য তার পক্ষে পদত্যাগ করেন। মওলানা ভাসানীও বেরিয়ে এলেন। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। অলি আহাদ হলেন এ পার্টির যুগ্ম সম্পাদক। এর পর এলো মার্শাল-ল বা সামরিক শাসন। সনটি ছিল ১৯৫৮ সাল। আবার কারাগারে যেতে হল অলি আহাদকে। ১৯৬৩ সালের শেষের দিকে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন। প্রতিষ্ঠিত হল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে এন,ডি,এফ। অলি আহাদ চেষ্টা করলেন এন,ডি,এফ কে সু-প্রতিষ্ঠিত করার, কিন্তু পারলেন না।

এরপর ১৯৬৯ সালে আতাউর রহমান খানকে সভাপতি করে জাতীয় লীগ গঠিত হয়। অলি আহাদ হন জাতীয় লীগের প্রথম সাধারণ সম্পাদক। এ সময়ে বাংলার স্বাধীনতার আন্দোলন প্রায় তুঙ্গে। ৭ দফা আন্দোলন নিয়ে মাঠে নামলো জাতীয় লীগ আতাউর রহমান ও অলি আহাদের নেতৃত্বে। ফলশ্রুতিতে অলি আহাদ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচনায় অলি আহাদের ভূমিকা ইতিহাস সমৃদ্ধ। তিনি মুক্তিযুদ্ধের একজন শীর্ষ সংগঠক। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তার ভবিষ্যদ্বানী আজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। তিনি চেয়েছিলেন দেশের মাটিতেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হবে। সময় যতদিনই লাগুক তাতে ক্ষতি নেই তবু জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা আসবে তার মূল্য অপরিসীম। সুদূর প্রসারী চিন্তা থেকে অলি আহাদ বাংলার স্বাধীনতাকে মূল্যায়ন করার

www.pathagar.com

প্রয়াস নিয়েছেন।

স্বরাজ গঠনের সহায়ক শক্তি হিসাবে জাতিকে নিরংকুশ স্বাধীনতা এনে দিতে চেয়েছিলেন অলি আহাদ। তিনি আগাম বুঝতে পেরেছিলেন ভারতীয় সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারণবাদ বাংলাদেশকে কখনই স্বাধীন হতে দিবে না। ভবিষ্যতে ভারত বাংলাদেশকে তাদের অঙ্গরাজ্য হিসাবে আগ্রাসিত করবে। বাংলাদেশকে সব সময় পদানত করে রাখবে। ভারত তাদের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য সাময়িক সহযোগিতা হয়তো করবে কিন্তু ভবিষ্যতে তাদেরই অঙ্গরাজ্যের মত ব্যবহার করবে।

মধ্যযুগ থেকে এ পর্যন্ত ভারতের আগ্রাসী চরিত্রই প্রকাশ পেয়েছে। ভারত কখনই এ অঞ্চলে কোন স্বাধীন রাষ্ট্র বরদাস্ত করতে পারেনি এবং পারেনা। রাজনীতিতে মেধাবী পরিপক্ষ ও দূরদর্শী অলি আহাদ তা সত্যিকার অর্থেই বুঝতে পেরেছিলেন বলেই ভারত নির্ভর স্বাধীনতা চাননি। সে কারণেই তিনি দেশের মাটিতেই জনযুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন যা দিল্লীর পছন্দ হয়নি। যুদ্ধকালীন ৯ মাসের মধ্যেই অলি আহাদের ভবিষ্যদ্বানী অক্ষরে অক্ষরে ফলতে শুরু করে। আমরা যারা বয়সে তরুন, রাজনীতিতে অত পরিপক্ক নই আমরা দেখলাম ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে একটা অপরিণত অবস্থায় এনে দর কষাকষি করে দেশের নেতাদেরকে আগাম চুক্তি করতে বাধ্য করছেন। ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন কিছু ঘটনাবলী তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ মিলে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দিকে ভারতের দেরাদুনে তৎকালীন নেতাদের ডেকে চুক্তির ভিত্তিতে ডিসেম্বরে বাংলাদেশের বিজয় নির্ধারিত হয়। তার আগে ৫-৬ মাসে উল্লেখযোগ্য কোন সশস্ত্র সহযোগিতা ভারত বাংলাদেশকে করেনি, ক্যাম্পগুলির খরচ বহন ব্যাতিরেকে। শুধু তাই নয়, জাতীয় নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং কাজী জাফর আহমদ সহ স্বরাজ গড়ার মানসিকতার অনেক নেতাকে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে। সেক্টরে সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে যেতে দেয়া হয়নি। প্রবাসী সরকারের সাথে চুক্তির পরই ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করতে লাগলো এবং মুক্তিযোদ্ধাদের পশ্চাতে থেকে সাহায্য করতে শুরু করলো। মুক্তিযোদ্ধারা পুরো ৯ মাস অগ্রণী বাহিনী হিসাবে কখনও সম্মুখ যুদ্ধ, কখনও গেরিলা যুদ্ধ করে শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করে স্বাধীনতা তরান্বিত করলো। যুদ্ধকালীন ভারতীয় সরকার বা মিত্র বাহিনীর অনেক আচরন আমাদের তরুন মনে প্রশ্ন সৃষ্টি করেছিল যা অলি আহাদ এবং জাতীয় অনেক নেতাই পূর্বাহ্নে সাবধান করেছিল জাতিকে। কিন্তু তখন আমাদের কিছুই করার ছিলনা। কারণ নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব ছিল চুক্তিবাদী আওয়ামী প্রবাসী সরকারের হাতে। তাছাড়া জাতি যার উপর সমস্ত বিশ্বাস জমা দিয়ে নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন সেই বঙ্গবন্ধুও ছিলো না। তিনি ছিলেন পাকিস্তানীদের হাতে বন্দি। এমতাবস্থায় সমগ্র জাতি প্রবাসী সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিল। আমি আজ নিশ্চিতভাবে আশ্বস্ত এবং বিশ্বাস করি সেদিন যদি অলি আহাদের কথায় আমরা জনযুদ্ধের পথ ধরে স্বাধীনতা সংগ্রাম করতে পারতাম, তাহলে একদিন না একদিন বাংলাদেশ স্বাধীন হতোই। কেননা দেশের ভিতরই সে প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছিল। সাড়ে সাত কোটি মানুষই শত্রু নিধনের আকাংখায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ মিলে যখন আপামর সাধারণ মানুষ পাক বাহিনীর অত্যাচার অবিচার সহ্য করেও নিশ্চিত বিপদ জেনেও মুক্তিযোদ্ধাদের খেতে দিয়েছে, থাকতে দিয়েছে, শত্রুর গতিবিধি জানিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন রক্ষা করেছে। ঘরের ধান বিক্রি করে যুদ্ধে সাহায্য করেছে।

www.pathagar.com

১৬ই ডিসেম্বর বাংলার পূর্ব আকাশে স্বাধীনতার লাল সূর্য উদয় হল। দেশ বিজয় লাভ করলো সত্য, কিন্তু বিজয়ের মুহূর্তে নূতন করে অজান্তেই পাকিস্তানের উপনিবেশের হাত থেকে দিল্লীর উপনিবেশের হাতে আমরা হস্তান্তরিত হলাম।

স্বাধীনতার জন্য লাখো লাখো ভাই-বোন জীবন বিসর্জন দিল ৫২ থেকে ৭১ পর্যন্ত। কিন্তু বেইমানী আর মোনাফেকীর কারণে আমরা তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা আজো পরিপূর্ণ ভোগ করতে পারছিনা। নিজ দেশে আজো পরবাসী আমরা। স্বাধীনতার উষালগ্নে জনাব অলি আহাদ ভারতের সাথে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী ২৫সালা দাসত্ব চুক্তির বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিলেন। যার জন্য আজীবন সংগ্রামের সাথী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তাকে ১৪ মাস কারাগারে আটকে রাখেন। হয়তো আরো থাকতে হতো। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু নিহত হন। যা কারোই কাম্য ছিল না। তবু নিয়তিকে কেউ ঠেকাতে পারেনা। এত বিশাল জনসমর্থন নিয়ে যে নেতা বাংলার ভাগ্য নির্ধারক হয়ে মসনদে বসলেন, দোর্দন্ড প্রতাপে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করলেন অথচ তারই মৃত্যুর পর একজন মানুষও এ দেশে প্রতিবাদ করলো না, রুখে দাঁড়ালো না। হিমালয়সম ইমেজ নিয়ে যিনি বাংলার স্বাধীনতার ধারক বাহক হয়ে নিরংকুশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন অথচ মাত্র তিন বছরের মাথায় তার ইমেজ শূন্যের কোঠায় চলে আসলো। অবাক বিস্ময়ে সারা বিশ্বের মানুষ বিষয়টি অবলোকন করলো, রাজনীতিকরা এর তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করলো। বাংলাদেশের মানুষ চীরকালই স্বাধীনচেতা, ধর্মভীরু। স্বাধীনতার প্রশ্নে এ অঞ্চলের মানুষ কখনই মাথা নত করেনি। কখনো কারো অধীনস্থ থাকতে শিখেনি। অসীম সাহসিকতায় ইংরেজকে এদেশ থেকে উৎখাত করেছে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে এই পূর্ব বাংলার মানুষই সবচাইতে বেশী আত্মত্যাগ করেছে, ইতিহাস তার স্বাক্ষ্য বহন করে। পিতা, পিতামহের কষ্টার্জিত পাকিস্তান যখন এ অঞ্চলের মানুষকে পরাধীন করতে চাইলো তখনও একই রক্তের ধর্মের মানুষ হয়েও বাঙ্গালীরা তা মেনে নেয়নি। সে ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌত্তলিকদের তাঁবেদারী কোনদিনই এ দেশের মানুষ মেনে নেবে না। ফলশ্রুতিতে আজীবন বাংলার জনগণের ত্যাগী নেতা এ দেশের আলালের ঘরের দুলাল শেখ মুজিবের ভারত প্রীতি নতজানু পররাষ্ট্র নীতিকে কেউ সমর্থন করতে পারেনি। জীবন দিয়েই তার মাশুল দিতে হয় বঙ্গবন্ধুকে।

বঙ্গবন্ধুর ইন্তেকালের পর অলি আহাদ কারাগার থেকে মুক্ত হলেন। অলি আহাদ আজ অবধি অশান্ত চির বিদ্রোহীর ভুমিকা পালন করে চলেছেন। নূরুল আমিন, নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান, আইয়ুব খান, শেখ মুজিবুর রহমান, জেনারেল জিয়াউর রহমান, প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ উল্লেখিত সরকারের সময় জনাব অলি আহাদ গণমানুষের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে, আন্দোলন করতে গিয়ে বার বার কারারুদ্ধ হয়েছেন। শুধুমাত্র এরশাদ সাহেবের আমলেই অলি আহাদ ছয়বার কারাবরণ করেছেন। মানুষের জন্য দেশের জন্য কথা বলতে গিয়ে অলি আহাদকে সারাটি জীবন অত্যাচার অবিচার নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন নি। বহুবার তাকে মন্ত্রীত্বের লোভ দেখানো হয়েছে কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। লোভ লালসা তাকে তার নীতি আদর্শ থেকে কখনও একচুলও টলাতে পারে নি। তিনি সজ্ঞানে আজন্ম বেছে নিয়েছেন কংকটাকীর্ণ বন্ধুর পথ। চিরদিনই সত্যের পক্ষে জনগণের গান গেয়ে গেছেন। পরাভব মানেননি।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে ছিল অলি আহাদের নিবিড় সম্পর্ক। ইতিহাস থেকে জানা যায় মওলানা ভাসানী অলি আহাদকে সন্তানতুল্য ভালবাসতেন। মাওলানা ভাসানীর

www.pathagar.com

লেখা পত্রগুলি যা তিনি বিভিন্ন সময় অলি আহাদকে রাজনীতির বিভিন্ন সংকটময় মুহূর্তে স্বহস্তে লিখেছিলেন, তা থেকেই প্রতীয়মান হয় অলি আহাদ মওলানা ভাসানীর সব চাইতে বিশ্বস্ত স্নেহাস্পদ রাজনৈতিক সহচর ছিলেন। মওলানা ভাসানী যখনই কোন রাজনৈতিক সংকটে পড়েছেন প্রথমেই তিনি স্মরণ করেছেন অলি আহাদকে। জেলে কিংবা আত্মগোপন করে যেখানেই ছিলেন পত্র মাধ্যমে অলি আহাদকে দলের কর্মসূচী পালন করার নির্দেশ দিতেন। মহাসংকটে অলি আহাদ পার্টি বা দলের জন্য যেভাবে অকুতভয়ে অকুণ্ঠ চিত্তে নেতার নির্দেশ পালন করেছেন বর্তমান সময়ের রাজনীতিতে তার উদাহরণ মেলা ভার।

জনাব অলি আহাদের জীবনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড পর্যালোচনা করলে রাজনীতির মৌলিক বিষয়গুলো অনায়াসেই চোখের সামনে ধরা পড়ে। যা থেকে নূতন প্রজন্ম অনেক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। বর্তমান রাজনীতির দৈন্যতার এই দিনে অলি আহাদের কালজয়ী লেখা ১৯৪৫ থেকে ৭৫ প্রতিটি রাজনীতিক নেতা-কর্মী কিংবা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পড়া আবশ্যক। তাহলে রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য আদর্শ কি হওয়া উচিৎ তা বুঝা বা শেখা যাবে। একটি আদর্শবাদী রাজনীতি বা সংগঠন গড়ে তুলবার জন্য এবং তার ভিতরের কর্মী বাহিনীকে লালন করার পদ্ধতি শেখানোর জন্য অলি আহাদের জীবনের ঘটনাবলী সম্মিলিত ইতিহাস সমৃদ্ধ বইটি পড়া অপরিহার্য্য। অলি আহাদের সারা জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা ব্যক্তি জীবন, সংগ্রামী জীবন এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ড তথা সাংগঠনিক তৎপরতার পদ্ধতিগত দিক জানার জন্য বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাজনৈতিক কর্মীদের সামনে এটি একটি মডেল হতে পারে। যার পথ ধরে আগামী প্রজন্ম একটি সুস্থ সৎ প্রগতিশীল রাজনীতির অনুকরণীয় অনুস্মরণীয় কর্মী হতে পারে। স্বাধীনতা লাভের পর অলি আহাদ লাখো শহীদের রক্তের কেনা স্বাধীনতা অর্থবহ করে তোলার জন্য নূতন উদ্যমে ও আঙ্গিকে দেশটাকে গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

স্বরাজ গড়ার মানসিকতায় অলি আহাদ সবাইকে নিয়ে একটি জাতীয় ঐক্য রচনা করতে চেয়েছেন। অলি আহাদের বিশ্বাস ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত এদেশটাকে স্বাধীন রাখতে হলে সর্বাগ্রে জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য্য। অলি আহাদ অনেক বড় বড় নেতাদের সাথে রাজনীতি করেছেন একসাথে গাঁট ছাড়া বেঁধে জোট বা ঐক্য করে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সে ঐক্য ভেঙ্গে গেছে। অলি আহাদ তাঁর অবস্থান ঠিক রেখে নীতি আদর্শের প্রতি অনড় থেকে একাকী পথ চলেছেন। মানুষের জন্য দেশের জন্য স্বদেশীকতার প্রশ্নে আপোষহীন হয়ে অবিরত আন্দোলন করেছেন। নীতির প্রশ্নে এক চুলও তাকে কেউ টলাতে পারেনি।

প্রত্যেকটি মানুষেরই কিছু না কিছু ক্ষমতার লোভ থাকে কিন্তু অলি আহাদ সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র। তিনি মনে করেন বিরোধী অবস্থান থেকেও দেশের কাজ করা যায়। দেশের অগ্রগতি সাধনের জন্য ভূমিকা রাখা যায়।

মানুষের জন্য দেশের জন্য কাজ করতে ক্ষমতায় যাওয়া অপরিহার্য্য নয়। বিরোধী অবস্থানে থেকেও দেশের প্রগতির জন্য নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করা যায়, যদি সদিচ্ছা থাকে।

জননেতা অলি আহাদের সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় খুব বেশী দিনের নয়। ১৯৯৭ সালে যখন সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ ও সাবেক উপপ্রধান মন্ত্রী জননেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এর নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি আলাদাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তখন আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি, ক্ষমতা থেকে নামাবার অভিপ্রায়ে আমরা ক'জন

www.pathagar.com

নূতন একটি ফর্মুলা উদ্ভাবন করি। জাতীয়তাবাদী ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছোট বড় দলগুলিকে একটি বিরোধী দলীয় ঐক্যজোট বা ঐক্যফ্রন্ট গঠন করে দেশে গণ আন্দোলন সৃষ্টি করে আওয়ামী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ফর্মুলা এই রকম। যেহেতু আওয়ামী লীগ পূর্বাপর মোট ভোটের ৩৬% শতাংশ পেয়ে জাতীয় পার্টি এবং স্বতন্ত্র সদস্যদের নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে সরকার গঠন করতে সমর্থ হয়েছে। সেহেতু আওয়ামী লীগকে এক ঘরা করে বাকী ছোট বড় সমস্ত দলগুলিকে নিয়ে একটি বিরোধী বৃহত্তর ঐক্যজোট করে আন্দোলন নির্বাচন এবং সরকার গঠনকল্পে একটি আগাম নকশা জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে।

এ কাজগুলি এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কাজী জাফর আহমদ প্রথমেই যার শরণাপন্ন হলেন তিনি হলেন ডেমোক্রেটিক লীগের সভাপতি, সব চাইতে বর্ষীয়ান জননেতা জনাব অলি আহাদ সাহেব। অলি আহাদ সাহেব কাজী জাফর আহমদ সাহেবকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। নিজের ছোট ভাইয়ের মত মনে করেন। সর্বোপরি একজন শরীফ ঘরের সন্তান হিসাবে সম্মান করেন। আমার যতদুর মনে পরে বেশ কয়েকদিন অলি আহাদ, কাজী জাফর আহমদ আলোচনার পর বেশ কয়েকটি দলের সাথে কথা বলেন কাজী জাফর আহমদ। এ সময় জামাতে ইসলামের আব্দুল কাদের মোল্লা, শফিউল আলম প্রধান, শওকত হোসেন নীলুসহ অনেকেই প্রায় প্রতিদিন আমরা রাতভর গুপ্ত মিটিং করে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে পৌছাতে সক্ষম হই। কিন্তু বড় দল বি,এন,পি, নেত্রী খালেদা জিয়াকে কনভিন্স করবে কে? দায়িত্ব দেয়া হল অলি আহাদকে। তিনি ম্যাডাম জিয়াকে রাজী করালেন। অবশেষ ৭ দলীয় জোট গঠিত হল। প্রথম প্রোগ্রাম দেয়া হল বেগম জিয়ার নেতৃত্বে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে লংমার্চ। আন্দোলন দানা বাঁধতে লাগলো। কাজী জাফর আহমদ, অলি আহাদ, শফিউল আলম প্রধান, শওকত হোসেন নীলু, কামরুজ্জামানসহ আমরা কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বিরোধী আন্দোলন জোরদার করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশব্যাপী আন্দোলনের কর্মসূচী দিলেন। এ সময় তিনি যখনই কোথাও জনসভা করতেন সর্বাগ্রে তিনি কাজী জাফর আহমেদ, অলি আহাদ সাহেবকে ডেকে পাঠাতেন। বড় সভাগুলিতে কাজী জাফর, অলি আহাদ ম্যাডামের দুই পাশের চেয়ারে উপবেশন করতেন। এ সময় জনাব অলি আহাদের অনলবর্ষী বক্তৃতা সবার মনে আগুন ধরিয়ে দিত। অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে সেদিন অলি আহাদ আওয়ামী সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামাবার জন্য জনগণকে সংগঠিত করতে অনেকাংশেই সমর্থ হয়েছিলেন।

কিছুদিন পর জাতীয় পার্টি এরশাদ এবং জাতীয় পার্টি (জা-মো) পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হল। তারপরই ৭ দলীয় ঐক্যজোট ভেঙ্গে ৪ দলীয় ঐক্যজোট গঠন করা হল। অলি আহাদসহ অন্যরা বাদ পড়লেন ঐক্যজোট থেকে। কি জন্য, কি কারণে আওয়ামী বিরোধী আন্দোলনের জোট গঠনে অন্যতম মূল উদ্যোক্তা অলি আহাদ বাদ পড়লেন দেশবাসী কিছুই জানতে পারল না। দেশের মানুষ আশা করেছিল নির্বাচনে কিংবা সরকার গঠনে অলি আহাদ সাহেবের ভূমিকা থাকবে। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই অভিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাকে এতটুকু তার প্রাপ্য সম্মান দেয়া হল না।

রাজনীতিতে এ ধরণের নির্মম আচরণ কারো কাছেই কাম্য নয় অথচ তাই হল তাই হচ্ছে এই দুর্ভাগা দেশে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে জনাব অলি আহাদ এমন একটি চরিত্র যার তুলনা

www.pathagar.com

শুধুমাত্র তিনি নিজেই। অন্য কারো সাথে তার তুলনা করা বোকামী ছাড়া আর কিছু না। জনাব অলি আহাদের রাজনৈতিক আদর্শ চলমান রাজনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। একটি স্বতন্ত্র ষ্টাইল নিয়ে তিনি রাজনীতি চর্চা করেন। রাজনীতিকে তিনি জীবনে মিশন বা ব্রত মনে করেন। জনকল্যাণই যার মূল লক্ষ্য। যার জন্য তিনি ব্যাক্তিগত চাল চলনে সময়ানুবর্তিতা, সত্যবাদিতা, মিতব্যয়িতা সর্বোপরি কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত অতিবাহিত করেন। জনাব অলি আহাদের মত হিমালয় সম ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসে জীবনের অনেক অপূর্ণতার খেদ মিটে যায়। না পাওয়ার ব্যাথা বেদনা মন থেকে মুছে যায়। মনে হয় পাবার চেয়ে দেয়ার আনন্দ অনেক। সবাই তো পাবার জন্যেই দৌড়াচ্ছে। দেবার মানসিকতা ক'জনের আছে এই দেশে। এ শুধু অলি আহাদের পক্ষেই সম্ভব।

অলি আহাদ সাহেব দীর্ঘ রাজনীতিক জীবনে অসংখ্য কর্মী অনুসারী তৈরী করেছেন। যারা রাজনীতির বিভিন্ন কেন্দ্রবিন্দুতে সাফল্য নিয়ে অবস্থান করছেন। সবাইর কথা আমি বলতে পারবোনা তবে যে দু'জন অনুসারীকে আমি খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে জেনেছি তাদের দু'জনের একজন সাইফুদ্দিন আহমেদ মনি, আরেকজন মুন্সি আবদুল মজিদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ দু'জন মানুষ অলি আহাদ সাহেবের জীবনের সাথে নিজেদের একাত্ম করে নিয়ে যেভাবে সংগঠন করে চলেছেন সত্যিকার অর্থেই এরা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

আমরা এমন এক দেশে বসবাস করি যে দেশে বীর সন্তানদের জীবদ্দশায় মূল্যায়ন করা হয় না। এ জাতি দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝে না। সে কারণেই আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তনও হয় না।

এ জাতি হয়তো অলি আহাদ সাহেবের কাছ থেকে আরো অনেক কিছু পেতে পারতো। যদি তাকে দেশের অগ্রগতির প্রশ্নে কাজে লাগাতো। কিন্তু আমরা মনের দিক দিয়ে এতই দরিদ্র যে আমরা আমাদের বীর সন্তানদের সঠিক মুল্যায়ন করিনা, করতে জানিনা। যার পরিণতিতে জাতীয় জীবনে অগ্রগতির চেয়ে অবনতিই পরিলক্ষিত হয়।

সময় এসেছে পিছনে ফিরে তাকানোর, আমাদের সমৃদ্ধ অতীতের যারা শ্রেষ্ঠ, মহান গুনী মহাজন তাদের জীবনের অবদানগুলি জাতির সামনে বেশী বেশী করে তুলে ধরতে হবে। আগামী প্রজন্মের জন্য অলি আহাদ সহ আমাদের পিতা পিতামহ যারা বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন করেছেন কিংবা জাতিসত্তার উন্মেষের জন্য, স্বাধীনতার জন্য অকাতরে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, যারা সত্য ও ন্যায় নিষ্ঠার জন্য আজীবন লড়েছেন। মানুষের কল্যাণের জন্য সততা, নিষ্ঠা ও সত্যিকার দেশপ্রেমের স্বাক্ষর রেখেছেন সে সমস্ত মানুষের জীবন কাহিনী লিপিবদ্ধ করে আগামী দিনের বংশধরদের জন্য তৈরি করে যেতে হবে। শত ব্যর্থতার পাদপিঠে দাঁড়িয়ে সফলতার পথ রচনা করতেই হবে। যদি হতাশা আসে অলি আহাদ এর মত আদর্শবাদী ত্যাগী নেতাদের প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে হবে। তাদের চরিত্র চিত্রন করে আগামী দিনের জন্য "অলি আহাদদের মত আরো ভাল মানুষ চাই"-সর্বাগ্রে এই শ্লোগান দিয়ে যাই।

[লেখক মহান মুক্তিযুদ্ধের ২নং সেক্টরের-ঢাকা মহানগরী (রমনা তেজগাঁও) এর প্লাটুন কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সাবেক সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ।]

www.pathagar.com

অলি আহাদ ॥ এক সাচ্চা দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদীর প্রতিকৃতি

এহ্‌সানুল হক সেলিম

'৫২ এর রক্তস্নাত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, মহান একুশে ফেব্রুয়ারী আর সেই ভাষা আন্দোলনের সিপাহশালার অলি আহাদ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক জীবন্ত কিংবদন্তী। তাঁর বিচক্ষনতা, একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা, নির্ভীকতা, একগুয়েমীজেদ আর দুর্জয় সাহসই সমস্ত প্রতিকূলতাকে ছিন্ন করে নুরুল আমীন সরকারের জারীকৃত ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার ক্ষেত্র সৃষ্টি করে রক্তস্নাত ২১শে ফেব্রুয়ারীর কালজয়ী ইতিহাসের স্রষ্ঠা হয়ে যান। ছোটবেলা থেকেই তাঁর নামটির সাথে আমি পরিচিত ছিলাম। মুরুব্বিদের কাছ থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিপ্লবী কর্মকান্ডের বীরত্বপূর্ণ কার্য্যক্রমের কাহিনী শুনে শিহরিত হতাম। রোমাঞ্চিত হতাম। তাঁকে দেখার খুব ইচ্ছে হতো। যখনই তাঁকে দেখতে চেয়েছি তখনই শুনেছি তিনি কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে কালাতিপাত করছেন। বিপ্লবীদের জীবন এমনই হয়।

. বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস পড়তে গিয়ে কখনো নেতাজী সুভাষ বসু, কখনো ডঃ এম. এন.রায়, রাস বিহারী বসূ ইত্যকার অনেক বিপ্লবীর কাহিনী পড়েছি। একেক সময় একেক জনকেই মনে হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী। সেই আমার আদর্শ। বিশেষ করে নেতাজী সুভাষ বসুর প্রতিই দুর্বলতা ছিল একটু বেশি। জনাব অলি আহাদকে নেতাজীর সাথেই বেশি মিলাতাম আর তুলনা করতাম। তাঁর সাথে আমার দেখা না হলেও মনে মনে তাঁকেই আমার জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলাম।

১১ দফা আন্দোলনের পর ১৯৬৯ সালে জুন মাসে পুর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ দ্বিধা বিভক্ত হয়। একাংশের নেতৃত্বে আল মুজাহিদী আরেক অংশের নেতৃত্বে তোফায়েল আহমদ। আমি আল মুজাহিদী নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগের সাথে একাত্ব ছিলাম। সেই সময় জনাব আতাউর রহমানের নেতৃত্বে জনাব অলি আহাদসহ দেশের বেশ কিছু বরেণ্য রাজনীতিবিদের নেতৃত্বে জাতীয় প্রগতি লীগ (National Progressive League) নামে একটি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে ঢাকার হোটেল ইডেনে এক সম্মেলনের মাধ্যমে দলের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কমিটি গঠন করা হয়। এবং দলের নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় জাতীয় লীগ (National League) দলের সভাপতি নির্বাচিত হন জনাব আতাউর রহমান খান। অল পাকিস্তান কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন জনাব শাহ্ আজিজুর রহমান ও পূর্ব পাকিস্তান কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন জনাব অলি আহাদ। অল পাকিস্তান ভিত্তিক এ দলটি জনাব আতাউর রহমান খান, শাহ্ আজিজুর রহমান, অলি আহাদ, আবদুল হামিদ চৌধুরী, আমেনা বেগম, খয়রাত হোসেন, দিলদার আহমদ, ফেরদৌস আহমদ কোরেশী, আবুল কালাম আজাদ, দেওয়ান সিরাজুল হক, আশরাফ হোসেন, ইকবাল আনসারী খান, অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম, নুরুর রহমান প্রমূখ বরেণ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে গঠিত হয়। রাজনৈতিক কর্মসূচীতে আমাদের ছাত্র সংগঠন বাংলা ছাত্রলীগ এ দলটিকে সমর্থন

www.pathagar.com

দেয়। বাংলা ছাত্রলীগে তখন আমার অবস্থান ছিল কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক। সেই সুবাদে অলি আহাদ সাহেবের সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় হয় ৬৩, বিজয় নগরস্থ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। তার পর থেকে দীর্ঘ দিন তাঁর সাথে একজন রাজনৈতিক কর্মী ও তাঁর আদর্শের একজন একনিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে আমার অতিবাহিত হয়। সুদীর্ঘ এই সময়ে তাঁর সাথে চলার পথে তাঁকে অতি নিকট থেকে দেখার ও জানার সুযোগ আমার হয়েছে।

সত্যিকার অর্থে একজন নির্লোভ, সৎ চরিত্রবান, আপোষহীন সংগ্রামী, জাতীয় স্বার্থে নিবেদিত প্রান, ত্যাগী মহান জাতীয়তাবাদীর সঠিক প্রতিকৃতিই দেখতে পাওয়া যায় জনাব অলি আহাদের মধ্যে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষনের প্রশ্নে নির্ভীক সাহসী উচ্চারনে অলি আহাদ এই প্রবীন বয়সেও তারুণ্যের বাঁধভাঙ্গা সিংহ গর্জনে গর্জে উঠেন। অনেকে বলেন তিনি প্রচন্ড একরোখা মানুষ। তিনি ছাড় দিতে জানেন না। তিনি তাঁর চিন্তা চেতনায় শতকরা একশতভাগ অটল থাকেন। আপোষের অলিগলি বেয়ে ক্ষমতায় আরোহনের সিঁড়ি তিনি মাড়াননি। চির বিদ্রোহী অলি আহাদ তাঁর এই সততা, দেশ প্রেম আর আপোষহীনতার ঝান্ডা উঁচু করে ক্ষমতার লোভনীয় সব প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন। ক্ষমতা তাঁর পায়ের কাছে গড়াগড়ি খেয়েছে কিন্তু আপোষ করে তিনি সেই ক্ষমতার ধারে কাছেও যাননি। আমার জানা মতে শেখ মুজিব, জিয়া, এরশাদ প্রমুখ তাঁকে ক্ষমতায় অংশ গ্রহনের জন্য লোভনীয় অনেক প্রস্তাব দিয়েছেন, অনেক লোভনীয় পদ পদবী দেয়ার প্রলোভন দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহন করেননি। তিনি পাকিস্তান আমলের মতোই স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের শাসনামলে হাসিমুখে কারাভোগ করেছেন। স্বাধীনতার পর '৭৩ সালে তিনি সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ প্রকাশনা ও সম্পাদনা শুরু করেন। তৎকালীন সময়ে আধিপত্যবাদ বিরোধী পত্রিকা হিসেবে সুপরিচিত ইত্তেহাদে তিনি শাসকশ্রেণীর সকল অন্যায় অত্যাচার আর জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সকল কার্যক্রম সোচ্চারভাবে তুলে ধরেছেন। তাদের অপকর্ম আর ব্যর্থতায়, জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বজ্রনিগুঢ়-সত্য উচ্চারণে তৎকালীন শাসক মুজিব, জিয়া, এরশাদ প্রত্যেকেই তাঁর পত্রিকা নিষিদ্ধ করেছেন। তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন।

১৯৬৯ সালের শেষদিক থেকে শুরু করে এই সুদীর্ঘকাল সময় তাকে অতি নিকট থেকে দেখার আমার সুযোগ হয়েছে তাঁর সান্নিধ্যে অনেক দুঃসহ সময় অতিক্রম করেছি বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে, মুক্তিযুদ্ধ উত্তর স্বাধীন বাংলাদেশে ৭২-৭৫ সালে আওয়ামী দুঃশাসনের সময়।

আমাদের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে জনাব অলি আহাদ এক জীবন্ত কিংবদন্তী। নির্ভীকতায়, সাহসিকতায়, কুণ্ঠাহীন সত্যভাষনে, ত্যাগ তিতিক্ষায় অগ্নিশুদ্ধ, নির্লোভ চরিত্রের গৌরবময় অহংকারে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত মহান এক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব অলি আহাদ আমাদের জাতীয় রাজনীতির পরিচিত আবহের মধ্যে ব্যতিক্রম।

জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ-জনাব অলি আহাদ পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই তাঁর রাজনৈতিক কর্মকান্ডে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, পাকিস্তানের সাথে এ অঞ্চলের মানুষ একরাষ্ট্রের কাঠামোতে বসবাস করতে পারবেনা। নিজস্ব স্বকীয়তায় স্বাধীনসত্বা নিয়েই বাঁচতে হবে। তাঁর রাজনৈতিক কার্যক্রমে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাশাপাশি সকল সম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারনবাদ, আর আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধেও তাঁর অবস্থান ছিল প্রশ্নাতীত।

দল কর্তৃক ১৯৭০ এর সাধারন নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহনের পর ৪ঠা ডিসেম্বর

www.pathagar.com

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর সাথে ন্যাপ-জাতীয় লীগের যৌথ উদ্যোগে পল্টনের জনসভা- যে জনসভা থেকে স্বাধীন পূর্ব বাংলার ঘোষনা দেয়া হয়। পর দিন ৫ই ডিসেম্বর নিজ শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়া ন্যাপ জাতীয় লীগের যৌথ সভায় প্রধান অতিথির ভাষনে নির্বাচন বর্জন করে স্বাধীনতার সংগ্রামে দলমত নির্বিশেষে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানান। তাঁর বক্তব্য যেমনি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে দেশবাসীকে উজ্জীবিত করেছিল তেমনি এটার অনিবার্যতা ২৫শে মার্চ'৭১ এ প্রমানিত হয়।

নির্বাচনোত্তর কালে তিনি বসে থাকেননি জনাব আতাউর রহমান খানের সাথে রাজনৈতিক কর্মসূচীতে মতানৈক্য হলে ১০ই জানুয়ারী '৭১ইং কুমিল্লায় দলীয় কনফারেন্সের মাধ্যমে দলের নাম বাঙলা জাতীয় লীগ করেন এবং দলকে পুনর্গঠিত করেন। সেদিন তিনি নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের বিকাশকে স্বাগত জানিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে আওয়াজ তুলেনঃ

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায় !"

জাতীয় লীগের এই বিভাজনের প্রভাব আমাদের ছাত্র সংগঠনের উপরও পড়ে। আমার নেতৃত্বে বাংলা ছাত্র লীগের একাংশ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র শক্তি মিলে একটি নতুন ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে তিনি আমাদেরকে নবগঠিত ছাত্র সংগঠনের নাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর "ফরওয়ার্ড ব্লকের" অনুকরণে "ফরওয়ার্ড ষ্টুডেন্টস্ ব্লক" নামকরনের জন্য বলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী "ফরওয়ার্ড ষ্টুডেন্টস্ ব্লক" গঠনের পর সুভাষ বসুর সেই ঐতিহাসিক উক্তি "তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব" মুদ্রিত করে আমরা সারা দেশে ব্যাজ পরিবেশন করি। এতে "মুক্তি ফৌজগঠন করো। বাংলাদেশ স্বাধীন করো" শ্লোগান ও উৎকীর্ণ ছিল।

রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের জনসভার আগের দিন ৬ই মার্চে বাংলা জাতীয় লীগ পল্টন ময়দানে এক জনসভা করে সে জনসভা হতে জনাব অলি আহাদ শেখ মুজিবকে উদ্দেশ্য করে বলেন "মুজিব ভাই আপনি স্বাধীনতা ঘোষনা করুন আমরা আপনার সাথে আছি"। এবং আওয়াজ তুলেনঃ মুক্তি ফৌজ গঠন করো- বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

ত্যাগ যত বড়ই হোক না কেন রক্ত যতই ঝরুক না কেন দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। এই ছিল তার প্রতিজ্ঞা। দেশবাসীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য তিনি উল্কার মতো সারা বাংলাদেশে জনসংযোগ করে বেরিয়েছেন। তার বক্তৃতা, বিবৃতিতে তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে আপোষের বেড়াজাল থেকে বের হয়ে সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহনের আহবান জানান। ১৭ই মার্চ চট্টগ্রামে লালদীঘি ময়দানে ঐতিহাসিক জনসভা শেষে আন্দর কিল্লাস্থ জাতীয় লীগের কার্যালয়ে এক জনাকীর্ন সাংবাদিক সম্মেলনে অবজারভার পত্রিকার সিনিয়র এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন- আপনি যেভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলেছেন এতে তো বায়াফ্রার মতো গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে ভেবে দেখেছেন কি ? উত্তরে তিনি সিংহের মতো গর্জন করে বলেছিলেন "Let it be Byafra -রক্ত যতই ঝরুক দেশকে স্বাধীন করতে হবে"।

গনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একজন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিবিদ অলি আহাদ চেয়েছিলেন যেহেতু নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেছে তাই স্বাধীনতা আন্দোলনে আওয়ামী লীগসহ

www.pathagar.com

অন্যান্য স্বাধীনতাকামী দলসমূহকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। বিশাল হৃদয়ের অধিকারী জনাব অলি আহাদকে কখনো ব্যক্তি স্বার্থকে সমষ্টিগত কিংবা জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিতে দেখিনি। আগরতলায় '৭১ এর এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি ও আনসার হোসেন ভানু অবস্থান করছিলাম। জনাব ভানুকে যে মিশন দিয়ে তিনি ভারতে পাঠিয়েছিলেন সেই মিশনেরই অংশ হিসেবে মানিক চক্রবর্তীর মাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনির কর্নেল বানার্জির সাথে সাক্ষাতের সময় কর্নেল বানার্জি জনাব অলি আহাদের জন্য একটি ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বেতার ট্রান্সমিটার দেবার কথা বলেন। সীমান্ত সন্নিকটবর্তী গ্রাম- দূর্গাপূরে অবস্থানরত জনাব অলি আহাদকে একথা বলার পর তিনি সরাসরি তা প্রত্যাখান করে বলেন যে, ইতিমধ্যে স্বাধীনবাংলা বেতার চালু হয়েছে এখন আমি যদি অন্য একটা বেতার কেন্দ্র চালু করি তাহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ব্যাহত হতে পারে। কাজেই ওটা আমি নেবনা বরঞ্চ উনাকে বলে দিন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের যন্ত্রটি কোন কারনে ক্ষতি হলে ওটা যেনো Replace করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই তিনি চেয়েছিলেন যথা সম্ভব শীঘ্র প্রবাসী সরকার গঠন করা হোক এবং যুদ্ধের কৌশল ও সাহায্য সহযোগিতার ব্যপারে ভারত সরকারের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করা হোক। তিনি চেয়েছিলেন ভারত যে সাহায্য সহযোগিতা করবে সেটা স্বল্প মেয়াদী কিংবা দীর্ঘ মেয়াদী যাই হোক না কেন এ ব্যপারে একটা স্বচ্ছতা থাকা দরকার কারন এতে রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক বিষয় জড়িত। এ বিষয়ে তিনি আবদুল মালেক উকিল, জহুর আহমদ চৌধুরীসহ অনেক আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেছেন চাপ প্রয়োগ করেছেন। অবশেষে ১০ই এপ্রিল '৭১ মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়। যা নাকি পরবর্তীতে কুষ্ঠিয়ার মেহেপুরের বৈদ্যনাথ তলায় ১৭ই এপ্রিল ঘোষণা করা হয়। জনাব অলি আহাদ চেয়েছিলেন এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই ব্রাহ্মনবাড়ীয়া মুক্ত অঞ্চলকে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী ঘোষনা করে সেখান থেকেই অস্থায়ী সরকারের ঘোষনা দেয়া হোক। কিন্তু এটা তিনি করাতে পারেননি। উপরন্তু অলি আহাদ সাহেবের তৎপরতাকে ভারতীয় ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার ও আওয়ামী লীগ ভালো চোখে দেখেনি। তাইতো আমরা একদিন আগরতলা থেকে সোনামুড়ি যাবার পর গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথে পুলিশের একজন সি, আই এবং সোনামুড়ি থানার ও.সি. জিজ্ঞাসাবাদের নামে প্রকান্তরে থানায় নিয়ে আটক করে। এবং ও,সি, এর বাসভবনে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন। সেখানেই ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার একজন উর্ধতন কর্মকর্তা উনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। এভাবে প্রায় ৪দিন উনাকে আটক রাখেন। আমাদের সাথে ত্রিপুরা রাজ্য শাখা সি,পি, আই সাধারণ সম্পাদক বাবু সমর চৌধুরীও ছিলেন। যিনি পরবর্তীতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। উনাকে অবশ্য আটক করা হয়নি। প্রতি পদে পদে আওয়ামী লীগের ইন্ধনে কংগ্রেস সরকার ভারতে তাঁর অবস্থানকে দুরুহ করে তুলে। অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে তাঁর মাথার দাম ১০ হাজার টাকা। পাক সামরিক জান্তা তাঁকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে নগদ ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষনা করে। সেই সব দুঃসহ দিনগুলোতে তাঁর সাথে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

লাখো শহীদের আত্মত্যাগ আর অসংখ্য মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে রক্ত সাগর পাড়ি দিয়ে বহু কাংখিত স্বাধীনতা অর্জিত হয়'৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর

www.pathagar.com

আত্মসমর্পনের মধ্যদিয়ে। দেশ স্বাধীন হবার পর উনার মধ্যে দেখতে পাই এক ধরনের উৎকণ্ঠা। পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পনের সময় সহরোয়ার্দী উদ্যানে জেনারেল অরোরার সাথে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর অনুপস্থিতি। দেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থান ও তাদের ব্যাপক লুটপাঠ। তাঁরা কবে বাংলাদেশ থেকে যাবে এ ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা না থাকা। এ সব বিষয়ে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। উনার নির্দেশে ১৪ই জানুয়ারী'৭২ এ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফরওয়ার্ড ষ্টুডেন্টস্ ব্লক এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীনতা বরণ উৎসব পালন করে এবং যথা শীঘ্র সম্ভব সারাদেশে মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে ছড়িয়ে থাকা অস্ত্র উদ্ধার এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ফেরৎ পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আহবান জানালাম। ভারতীয় সেনাবাহিনীর লুঠপাটের বিরুদ্ধে, এবং তাদের ফেরৎ পাঠানোর জন্য তিনি সোচ্চার হলেন।

আওয়ামী লীগের লুটপাট, স্বজন প্রীতি, দুর্নীতি, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতির বিরুদ্ধে গনতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতার সুফল ও মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তিনি "আজাদ বাংলার" ডাক দেন। আওয়ামী শাসনামলে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, ছিলাম পিন্ডির অধীনে হয়ে হেলাম দিল্লীর অধীন। তাই তিনি ডাক দিলেন "দিল্লি নয় ঢাকা।"

'৭৩ এর সাধারণ নির্বাচনে তাঁর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবে দেখেছি যে কিভাবে মিডিয়া ক্যু'-এর মাধ্যমে জয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করা যায়। রাত ১২টার পর যখন তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী থেকে ২৬ হাজার ভোটে এগিয়ে ব্রাহ্মনবাড়ীয়া নির্বাচন কমিশন অফিসে বসে সকলের সামনে টেলিভিশনে ঘোষনা শুনলাম যে তিনি ১০ হাজার ভোটে পরাজিত হয়েছেন। এ অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবনেও ভুলতে পারিনি। আমি এ খবর শুনে চরম উত্তেজনায় দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য। এমতাবস্থায় কাজী পাড়ায় স্নেহ্নীড়ে গিয়ে উনাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে এ খবর জানাতে উনি নিরুত্তাপ কণ্ঠে শুধু বললেন "এখন গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন এর পরিণাম তাঁরা ভোগ করবে"। আমি বললাম মামলা করবো, তিনি বললেন কোন লাভ হবে না।

ছাত্র রাজনীতির সাথে যারা জড়িত তাদের লেখাপড়ার ব্যাপারে তিনি খুব সচেতন। এ ব্যাপারে তিনি কোন ছাড় দিতেন না। আমাদের বলতেন শুধু চুংগা ফুকলে চলবেনা সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত হতে হবে। লেখা পড়া না করে রাজনীতি করে নেতা হলে দেশের জন্য কোন মঙ্গল হবে না। অশিক্ষিত নেতৃত্ব দেশকে অতলে নেয়া ছাড়া কিছু দিতে পারেনা। সংগঠনের কাজে অনেক সময় সন্ধ্যার পর পার্টির অফিসে দেখলেই ডেকে বলতেন কি ছাত্রনেতা লেখাপড়া ফেলে এখানে কি করছেন ? লেখাপড়া না শিখলে দেশকে কিছু দিতে পারবেননা। ব্রাহ্মনবাড়ীয়া আমার নিজের এলাকা। জাতীয় লীগের কমিটি হবে। আমি সংগত কারনেই একদিন আগে চলে গেলাম। সার্কিট হাউজে রাতে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে তিনি আলাপ আলোচনা করছেন কমিটি গঠনের ব্যাপারে। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে দেখে রেগে একেবারে আগুন। বল্লেন লেখাপড়া ফেলে এখানে কি? আপনি ছাত্রনেতা আপনার তো এখানে কোন কাজ নেই। ছাত্রদের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। অথচ নুতন দলের কমিটি গঠনে নেপথ্যে আমারও একটা ভুমিকা ছিল। কিন্তু তিনি আমার উপস্থিতি মেনে নিলেন না।

মুজিব-ইন্দিরা স্বাক্ষরিত ২৫ বৎসর মেয়াদী বাংলা ভারত মৈত্রী চুক্তির বিরুদ্ধে তিনি

www.pathagar.com

অবস্থান গ্রহন করেন। তিনি এই চুক্তিকে দিল্লির দাসত্ব চুক্তি বলে অভিহিত করেন। ভারতীয় আধিপত্যবাদের ক্রীড়নক আওয়ামী সরকারের ভারতীয় স্বার্থ সংরক্ষন ও তাবেদারীর বিরুদ্ধে তিনি ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তিনি মনে করেন যে লাখো মানুষের আত্ম বলিদান আর অসংখ্য মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা আমরা পিন্ডির কবল থেকে ছিনিয়ে এনেছিলাম, ভারতীয় সেবাদাস আওয়ামী চক্রের মাধ্যমে তা দিল্লীর অধীনে চলে গেছে। তাই তিনি ডাক দিলেন দিল্লি না ঢাকা। দিল্লির কবল থেকে দেশ মাতৃকাকে মুক্ত করতে তিনি দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিলেন 'আজাদ বাংলা' কায়েমের আহবানের মাধ্যমে।

সরকারের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে শত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তিনি তার আজাদ বাংলার ডাক সারা দেশের ঘরে ঘরে পৌছে দিলেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ' পত্রিকা ও তাঁর সংগঠন বাংলা জাতীয় লীগের কার্যক্রমের মাধ্যমে। বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের লক্ষ্যে তিনি মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর সাথে জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন।

অবস্থা এমন দাঁড়ায় একদিকে '৭৪ এর দূর্ভিক্ষ, বিপর্যস্ত অর্থনীতি, আইন শৃংখলা পরিস্থির চরম অবনতি, সন্ত্রাস আর ছিনতাই, খুন রাহাজানী, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়, এমনিতর অরাজক পরিস্থিতিতে দেশবাসী বিপর্যস্ত, আওয়ামী সরকার দিশেহারা। শেখ মুজিব প্রকাশ্য জনসভায় বলতে বাধ্য হচ্ছেন "আমার চারদিকে পা'চাটা আর চোরের দল"। রাজনৈতিক আন্দোলনকে দমনের লক্ষ্যে বিশেষ ক্ষমতা আইন জারী, দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষনা এতদসত্বেও তারা পার পেলেননা। তাদের সমস্ত ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্য আত্মরক্ষা ও আজীবন দেশকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে শাসন করার ব্যর্থ প্রয়াসে সকল নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে সংসদে মাত্র ১৩ মিনিটে সংবিধান সংশোধন করে একদলীয় 'বাকশাল' রাজত্ব কায়েম করে। সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হলো। সমস্ত পত্র পত্রিকাকে বন্ধ করে দিয়ে মাত্র ৪টি পত্রিকাকে সরকারী মালিকানায় চালু করা হলো। মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীকে সন্তোষে গৃহবন্দী করা হলো। বিদ্রোহী নেতা অলি আহাদকে করা হলো কারারুদ্ধ। রাজনৈতিক দলের কার্যালয় গুলোকে সীল করে দেয়া হলো। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার এই শংকাকুল দুর্বিষহ অবস্থা দেশবাসী মেনে নিতে পারছিলনা। তাদের মধ্যে একধরনের ভয়মিশ্রিত চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল। আওয়ামী বাকশালী চক্র আজীবন দেশের মানুষকে গোলাম বানিয়ে শাসন করার দুর্বিনীত অভিলাশে অক্টোপাশের মতো গোটা দেশকে গ্রাস করার প্রক্রিয়ায় নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যেতে লাগলো।

কিন্তু এই আমাবস্যার ঘোর অন্ধকারের মাঝে হঠাৎ আলোর ঝলকের মতো '৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট সোবেহ সাদেকে এদেশের দেশ প্রেমিক সেনাবাহিনীর কতিপয় অকুতোভয় সূর্য সন্তান নিজেদের জীবনকে বাজী রেখে সপরিবারে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে এক বিয়োগান্তক ঘটনার মধ্যদিয়ে শাসন ক্ষমতার ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটায়। ক্ষমতার এই পট পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাকশালের পতনের সাথে সাথে অবরুদ্ধ গণতন্ত্রের দ্বার উম্মোচিত হয়। জাতি আবার তার কাংখিত গনতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পায়। রুশ-ভারত অক্ষশক্তির প্রাথমিক পরাজয় ঘটে এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও তার দোসরদের অবস্থাও তথৈবচ। তারা পর্দার অন্তরালে ঘাপটি মেরে থাকে। পটপরিবর্তনোত্তর খন্দকার মোশতাক্ আহমদ সরকার অলি আহাদকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন। আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ফিরে আসে

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, আস্‌সালামুআলাইকুম ও বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

তিনি ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে আধিপত্যবাদ বিরোধী সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠায় একমনাদের নিয়ে একটি ব্যপক ভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের বাস্তবতা অনুধাবন করেন।

আধিপত্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ আর সম্প্রসারনবাদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য, এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, গনতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দৃঢ়প্রত্যয়ে খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে তিনি নিজ দল বাংলা জাতীয়লীগকে অবলুপ্ত করে ডেমোক্রেটিক লীগ গঠন করেন। এদিকে বিচারপতি আবু সাদাত মোঃ সায়েমকে সরিয়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় বসলেন। এক পর্যায়ে ডেমোক্রেটিক লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করলেন। দলীয় প্রধান খন্দকার মোশতাক, সাধারন সম্পাদক শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক কে,এম, ওবায়দুর রহমান প্রমুখকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন এবং মশিউর রহমান (যাদু মিয়া), কাজী জাফর আহমদ ও মওদুদ আহমদসহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের মন্ত্রীত্ব ও অন্যবিধ সুযোগ সুবিধা দিয়ে তিনি তাদেরকে তাঁর কাছে টানলেন। জনাব অলি আহাদকেও জেনারেল জিয়া অনেক লোভনীয় প্রস্তাব দেন তাঁর সরকারে অংশ গ্রহনের জন্য কিন্তু জনাব অলি আহাদ তা প্রত্যাখ্যান করেন।

জনাব অলি আহাদ ১৫ই আগষ্ঠের ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনকে জাতির জন্য 'নাজাত' মনে করতেন। তাই তিনি দলের অভ্যন্তরে মতদ্বৈততা সত্ত্বেও ১৫ই আগষ্ঠ কে 'নাজাত' দিবস হিসেবে পালন করেন।

২৩শে মে ১৯৮০ সালে বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত ডেমোক্রেটিক লীগের প্রথম ঐতিহাসিক লাখো মানুষের সমাবেশে বোমা হামলার ঘটনায় ১৩ জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়। এ হামলার জন্য জনাব অলি আহাদ আওয়ামী বাকশালী চক্রকে দায়ী করেন। আর দলীয় প্রধান খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াকে দায়ী করেন। আমার মনে হয় এর পর থেকেই খন্দকার মোশতাক সাহেবের সাথে অলি আহাদ সাহেবের মতদ্বৈততা শুরু হয়। এরপর আমরা দেখলাম রহস্যজনকভাবে খন্দকার মোশতাক সাহেব সংগঠনের কার্যক্রমে এমন ভূমিকা পালন করতে লাগলেন যাতে করে সংগঠনের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হতে লাগলো। অলি আহাদ সাহেব সাংগঠনিক কার্যক্রমকে যতই জোরদার করার মাধ্যমে আন্দোলনে গতি সঞ্চার করতে চাইতেন- বিভিন্নভাবে তিনি বাধাগ্রস্থ হতে লাগলেন।

৩০শে মে ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হলে দেশে সাংবিধানিক সংকট দেখা দেয়। সেই অবস্থায় আমরা অলি আহাদ সাহেবকে দেখেছি সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষাকল্পে সমস্ত রাজনৈতিক দলসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকট উত্তরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার সাহেবের সময়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তৎকালীন সেনা বাহিনীর প্রধান হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ বিদেশী সাংবাদিকদের নিকট রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেন। যা নাকি সম্পূর্ন বে-আইনি এবং সেনাবাহিনীর চাকুরী বিধিমালা ও শৃংখলা পরিপন্থি। সেনা শাসন বিরোধী জনাব অলি আহাদ এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে সেনাপ্রধান এরশাদের বিরুদ্ধে তড়িৎ ব্যবস্থা নিতে চাপ প্রয়োগ করেন। অথচ কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেল সাত্তার সাহেবকে সরিয়ে জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। এরশাদ সাহেব ক্ষমতা দখল করার আগে জনাব অলি আহাদ সাহেবের সমর্থন চেয়েছিলেন বিনিময়ে ওনাকে

www.pathagar.com

বিশেষ পদে আসীন করার প্রলোভনও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঘৃনাভরে তিনি সে প্রলোভন প্রত্যাখান করে জেনারেল এরশাদকে বলে দিয়েছিলেন যে, যদি বাংলাদেশের সমস্ত লোকও তাঁকে সমর্থন করে সেক্ষেত্রে একজন ব্যতিক্রম থাকবে সে হচ্ছে অলি আহাদ। কোন উচ্চাভিলাশী ক্ষমতালোভী সেনা কর্মকর্তার উচ্চাভিলাশকে তিনি অতীতে যেমনি প্রশ্রয় দেননি এখনো দিবেন না। তার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করে যাবেন। এরশাদ সাহেব ক্ষমতা দখলের পরও বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে জনাব অলি আহাদকে ক্ষমতায় অংশ গ্রহনের জন্য রাজী করানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হন। অলি আহাদ সব সময়ই ঐ সমস্ত প্রস্তাব ঘৃনাভরে প্রত্যাখ্যান করতেন। তিনি সামরিক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও ইত্তেহাদের মাধ্যমে লেখনী চালিয়ে যান। অতঃপর এরশাদ ক্ষীপ্ত হয়ে ইত্তেহাদের প্রকাশনা বন্ধ করে দেন এবং তাঁকে গ্রেফতার করে সামরিক আইনে তার বিরুদ্ধে মামলা করেন।

শেরে বাংলা নগরে বিশেষ সামরিক আইন আদালতে তাঁর বিচার অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীর দিনগুলোতে আমরা সেখানে যেতাম। সামরিক আদালতে বন্দি অলি আহাদ সাহেব একটি জবানবন্দি দেন। ইংরেজীতে লিখিত নাতিদীর্ঘ ঐ জবানবন্দিটি ছিল একটি ঐতিহাসিক দলিল।

উক্ত জবানবন্দিতে তিনি সামরিক আইন ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে এমন সমালোচনা করেন যা শুনে আমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেলাম। আমাদের রাজনৈতিক সহকর্মী প্রয়াত এডভোকেট আবদুল আহাদ মিয়া রসিকতা করে বলেন যে এই জবানবন্দিতে তিনি যতগুলো সামরিক আইনের ধারা লংঘন করেছেন তার বিচার হলে অন্তত ৩৬৫ বৎসর জেল হবে আর ১ কোটি টাকার উর্ধ্বে জরিমানা হবে। আমরা দেখলাম কঠিন কঠিন সব ইংরেজী শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে বজ্রনিগূঢ় কণ্ঠে পিন পতন নিরবতায় সামরিক আদালতে দাঁড়িয়ে নির্ভকচিত্তে অবলীলায় জেঃ এরশাদ আর তার সামরিক আইনের চৌদ্দ গোষ্ঠি উদ্ধার করে তার জবানবন্দি পাঠ করে যাচ্ছেন। এরকমটি একমাত্র অলি আহাদকে দিয়েই সম্ভব। আরো মজার ব্যাপার হলো সামরিক সরকার কিন্তু অলি আহাদ সাহেবকে সাজা দিতে সাহস করেন নি। বেশ কিছুদিন কারাগারে আটক রাখার পর সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

এক পর্যায়ে দলের সাধারন সম্পাদক শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন দলের একাংশ নিয়ে দল ত্যাগ করেন এবং পরবর্তীতে এরশাদ সাহেবের মন্ত্রীত্ব গ্রহন করেন। খন্দকার মোশতাক সাহেবের সাথে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বিষয়ে মতদ্বৈত্বতার কারনে বিশেষ করে খন্দকার মোশতাক সাহেবের রহস্যজনক ভূমিকার কারনে একসাথে দল চালানো জনাব অলি আহাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠে। তাই তিনি আলাদা অবস্থান গ্রহন করেন এবং মোশতাক সাহেবকে বাদ দিয়ে ডেমোক্রেটিক লীগকে আলাদাভাবে পুনর্গঠিত করেন। আজো পর্যন্ত তিনি ডেমোক্রেটিক লীগ নিয়েই আছেন। বহু পূর্বেই খন্দকার মোশতাক আহমদের ডেমোক্রেটিক লীগের বিলুপ্তি ঘটেছে।

রত্নগর্ভা মায়ের সন্তান অলি আহাদ। যার তিন তিনটি ভাই সি,এস,পি একভাই বিজ্ঞানী। তিনি নিজে বি, কম এ প্রথম শ্রেনীতে প্রথম স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও আপোষহীন রাজনীতিতে সম্পৃক্ত থাকার কারনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিরদিনের জন্য বহিস্কৃত হন। তরুন বয়সে পাকিস্তান আন্দোলন থেকে শুরু করে বর্তমানে সত্তুর উধর্ব প্রবীন বয়সেও যিনি দেশের কল্যান চিন্তায় রাজনীতিতে প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেন। সেই তিনি ব্যক্তি জীবনে ঢাকা শহরে

www.pathagar.com

একটুকরো জমিরও মালিক হতে পারেননি। বলা যায় হতে চেষ্টা করেননি। উপরন্তু সর্বকালের সরকার বিরোধী আপোষহীন রাজনীতির কারনে তাঁর পরিবারকে চরম খেসারত দিতে হয়েছে। সি,এস,পি ভাইয়েরা যোগ্যতা থাকা সত্বেও যুগ্ম সচিবের উপরে পদোন্নতি পাননি। যোগ্যতা থাকা সত্বেও বিজ্ঞানী ভাই ডঃ করিম কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হতে পারেননি। স্ত্রী প্রফেসর রাশিদা বেগম (সাবেক ডি,জি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা) সচিব হতে পারেননি। তাঁর গোটা পরিবারকেই রাজরোষের শিকার হতে হয়েছে। এতে তাঁর আক্ষেপ থাকলেও ভ্রুক্ষেপ নেই।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জীবন্ত কিংবদন্তী জনাব অলি আহাদ তাঁর স্পষ্ট ভাষন আর অপ্রিয় সত্য উচ্চারণের কারনে অনেকের কাছেই তিনি গ্রহণযোগ্য নন। তাঁকে এড়িয়ে চলতে সকলেই সচেস্ট। তাঁর এই সত্যনিষ্ঠ নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদীতা আর নির্ভেজাল স্বচ্ছতাই তাঁকে একলা চলতে বাধ্য করে। স্বার্থের ঠুলিপড়া রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাঁকে ভয় পায়। জাতীয় রাজনীতিতে তিনি তাই মনের মাধুরী মিশিয়ে অবিভাবকের মতো সকলের ত্রুটি বিচ্যুতি আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দেন। যারা সরকার পরিচালনা করেন কিংবা বিরোধী দলে অবস্থান করেন কাউকে তিনি ছাড় দেননা। তাইতো আমরা দেখি যে, তাঁর রাজনৈতিক মিত্র বলে যারা পরিচিত তাদের সম্পর্কেও কুন্ঠাহীন ভাবে স্পষ্ট সত্য উচ্চারণে রাখ-ঢাক করেন না। এমনি করেই তাঁর সারাজীবনের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে- তাঁর কাছে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দল বড় নয় বড় হচ্ছে দেশ ও জাতি। ত্যাগ তিতিক্ষার কষ্ঠিপাথর যাচাইয়ে দেশ প্রেমের কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ তিনি একজন সাচ্চা দেশ প্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতা। তাইতো আমরা দেখি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলীয়নেত্রী থাকা কালে জনাব অলি আহাদকে জাতীয়ভাবে সম্বর্ধনা দেন। জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সেই সম্বর্ধনা সভায় বেগম খালেদা জিয়া "অলি আহাদকে "জাতির বিবেক" হিসেবে আখ্যায়িত করেন আর সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ বলেন অলি আহাদের জন্ম না হলে ভাষা আন্দোলন সফল হতো না, বাংলাদেশও স্বাধীন হতো না।" আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তাঁর নামটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। আগামী প্রজন্ম তাঁকে অনুসরন ও অনুকরন করবে। ইতিহাস তাঁকে সেখানেই নিয়ে যাবে। পরম করুনাময়ের কাছে আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য আর দীর্ঘায়ু কামনা করি। কামনা করি তিনি যেনো সুস্থ শরীরে জাতির এই দুর্দিনে কান্ডারী হতে পারেন। জাতিকে দিক নির্দেশনা দিতে পারেন।

[এহসানুল হক সেলিম মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ]

www.pathagar.com

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃতকরণ ও তার নায়কেরা

বদরুদ্দীন উমর

[১৯৯৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী কোলকাতার 'দেশ' পত্রিকায় এই নিবন্ধটি প্রকাশ হওয়ার পর শেখ হাসিনা সরকার পত্রিকার ঐ সংখ্যাটি বাংলাদেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।]

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস ছিল এক অবিস্মরণীয় গণজাগরণ, গণআন্দোলন এবং অভ্যুত্থানের মাস। ১৯৫৩ সাল থেকেই ২১শে ফেব্রুয়ারী এই গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পালিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৭২ সাল থেকেই এখানে শুরু হয়েছে, অন্য এক প্রক্রিয়া, যার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এই ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পরিণত হয়েছে এক ধরনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবসায়ী এবং মতলববাজ বুদ্ধিজীবীদের বাণিজ্যিক উৎসবে। এ জন্যই আমরা যারা পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনের বিস্তারিত তথ্যের সাথে পরিচিত, যারা তথাকথিত ভাষা সৈনিক না হলেও ভাষা আন্দোলনকে নিজেদের অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি, তাদের জন্য এই বাণিজ্য উৎসব, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিস্ময়কর না হলেও, যথেষ্ট পীড়াদায়ক।

এই পীড়ন গত কয়েক বছর ধরে বেশী মাত্রায় চলছে এবং নিয়মিতভাবে এর মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকের দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় 'এ মাসে ভাষা সৈনিক ও রাজবন্দীদের সম্মেলন' শীর্ষক এক খবর প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হচ্ছে যে, "মহান ভাষা আন্দোলনে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য" সরকার নিয়ন্ত্রিত শিল্পকলা একাডেমীতে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ ২১ জন ব্যক্তিত্বকে জাতির শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের জন্য" এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্মেলনের আহ্বায়কদের মধ্যে দুই একজন আছেন একুশে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলনের সময় যাঁদের একটা প্রান্তিক ভূমিকা ছিল। কিন্তু সেই প্রান্তিক ভূমিকা তাঁদের নির্লজ্জ এবং অবাধ আত্মপ্রচারণা এবং প্রধান প্রচার মাধ্যমগুলি কর্তৃক তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে এই প্রচারকে এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়মিত ব্যাপারে দাঁড় করানোর ফলে, এই সব মিথ্যার অবাধ পরিমাণগত বৃদ্ধি মিথ্যার গুণগত পরিবর্তন সাধন করে তাকে প্রকৃত তথ্যের সঙ্গে অপরিচিত লোকদের কাছে, বিশেষতঃ নতুন প্রজন্মের কাছে, উপস্থিত করছে এমন এক পরম সত্য হিসেবে, যে "সত্যের" বিরোধিতা বাঙলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শুধু যে সাধারণভাবে মূল্যহীন তাই নয়, অনেক দিক থেকে রীতিমতো বিপজ্জনক।

এ তো গেল বর্তমান 'ভাষা- সৈনিক' নামে আত্মপ্রচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের কথা। এবার আসা যেতে পারে "ভাষা আন্দোলনের অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য" যাঁদের প্রতি জাতির শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের কথা বলা হয়েছে তাঁদের প্রসঙ্গে। যে তিনজনের নাম এব্যাপারে ঘোষণা করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য অবশ্যই স্মরণযোগ্য। কিন্তু অন্য দুই জন অন্য কারণে স্মরণযোগ্য হলেও ভাষা আন্দোলনে "অবিস্মরণীয়

www.pathagar.com

অবদানের জন্য" স্মরণযোগ্য, একথা ঠিক নয়।

প্রথমত মওলানা ভাসানীর কথা। ঢাকার বার লাইব্রেরীতে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠনের জন্য ৩১শে জানুয়ারী ১৯৫২ তারিখে যে সভা হয় তাতে আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী সভাপতিত্ব করেন। কিন্তু এই সভাপতিত্বের পর তাঁকে আর আন্দোলনে দেখা যায়নি। ২০শে ফেব্রুয়ারী 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি'র যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক (১৯৪০-৪৭) আবুল হাশিম। এ কারণে, ২৫শে ফেব্রুয়ারী তাঁকে গ্রেফতার করে ১৯৫৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত সিলেট ও ঢাকা জেলে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়।

১৩ই মার্চ মওলানা ভাসানীর নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয় এবং ১০ এপ্রিল তিনি ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এই ভূমিকার কারণে ভাষা আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর "অবিস্মরণীয় অবদানের" কথা বলার অর্থ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিষয়ে মুর্খতা অথবা নির্ভেজাল রাজনৈতিক মতলববাজী। এখানে আবার বলা দরকার যে, ভাষা আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর অবদান ৩১শে জানুয়ারীর সভায় সভাপতিত্ব করার বেশি কিছু না হলেও, এ দেশের রাজনীতিতে তাঁর অন্য অবদান ও ভূমিকার জন্য তিনি অবশ্যই স্মরণীয়। এ দুই বিষয়কে গুলিয়ে ফেলার মধ্যে কোন ইতিহাস জ্ঞান অথবা সত্যনিষ্ঠা নেই।

শেখ মুজিবর রহমানের ক্ষেত্রে একথা আরও সত্য। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে কার্যতঃ তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল না। ১৯৪৯ সালের ১১ই অক্টোবর ঢাকার আরমানীটোলা ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে তৎকালীন খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষাবস্থার প্রতিবাদে এক জনসভা হয়। সেই সভায় ভাসানী ছাড়া শেখ মুজিবর রহমানসহ আরও অনেকে বক্তৃতা করেন। জনসভায় যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং তারপর মিছিল বের হলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় পুলিশ লাঠি চার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। পরে পুলিশ মওলানা ভাসানী, তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ও যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানসহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। এইভাবে ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে গ্রেফতার হয়ে শেখ মুজিব ফরিদপুর জেল থেকে মুক্তি লাভ করে ১৯৫২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী, যে সময়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকারীদেরকে বিপুল সংখ্যায় গ্রেফতার করা হচ্ছে এবং 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি'র অনেক সদস্য আত্মগোপন করে আছেন। এই পরিস্থিতিতে জেল থেকে শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি লাভ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন ভাষা আন্দোলনে তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল না এবং আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে মুক্তি দেওয়াটা সরকার নিজেদের জন্য অসুবিধেজনক বা বিপজ্জনক কিছুই মনে করেনি।

কিন্তু শেখ মুজিবের কোন ভূমিকা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে না থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগ দল এবং তাদের অনুসারী বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে সেই আন্দোলনের নেতা, এমনকি মূল নেতা হিসেবে আখ্যায়িত ও প্রচার করে আসছে। এবং তাদের সেই প্রচার এখন এক ভয়ঙ্কর কুৎসিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ওপরে তাঁর "অবিস্মরণীয় অবদানের" জন্য তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের কথা যেভাবে বলা হয়েছে তার মধ্যেই এই কুৎসিত মিথ্যার একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

এই মিথ্যা যে শুধু অন্যেরাই প্রচার করছে তাই নয়। ১৯৭২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী এক টেলিভিশন প্রোগ্রামে তিনি নিজেই একথা বলেন। আমি অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখ নিঃসৃত কথা টেলিভিশনে শুনি এবং আমার লেখায় তার প্রতিবাদ করি। কিন্তু মিথ্যার বাহবা ধ্বনি এই

www.pathagar.com

প্রতিবাদের দ্বারা স্তব্ধ হওয়ার কোন অবস্থা তখন ছিলো না, এখনো নেই।

এ প্রসঙ্গে শেখের বক্তব্য ছিল এই যে, ভাষা আন্দোলন চলাকালীন অবস্থায় কিছুটা অসুস্থ হলে তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে। সেইভাবে হাসপাতালে থাকার সময় সেখানকার পায়খানার জানালা থেকে কাগজের চিরকুট ছুঁড়ে ছুঁড়ে তিনি ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান এবং সে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। সে কারণেই নাকি তাঁকে তখন ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলে বদলি করা হয়েছিল। তাই যদি হয় তাহলে ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী তৎকালীন নূরুল আমিন সরকার তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেয় কীভাবে? যিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের পায়খানার গবাক্ষ থেকে ভাষা আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন তাঁকে কীভাবে সেই সংকটজনক সময়ে সরকার মুক্তি প্রদান করলো ? এ রাজনৈতিক মারফতী বা আধ্যাত্মবাদের মহিমা বোঝা আমাদের মতো ক্ষুদ্র বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের কর্ম নয়।

দ্বিতীয়তঃ সে সময় শেখ মুজিব নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগারদের মধ্যে একজন হলেও আওয়ামী লীগের মধ্যে তখন ভাসানী, শামসুল হক, নারায়ণগঞ্জের ওসমান আলীসহ অন্য নেতারাও ছিলেন এবং শেখের এমন অবস্থা ছিল না যাতে তিনি তৎকালে ওই রকম এক আন্দোলন নেতৃত্ব দিতে পারতেন। বস্তুতঃপক্ষে সে সময়ে আওয়ামী লীগের নিজেরই তেমন কোনও রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তি ছিল না। সে কারণে আওয়ামী লীগেরও কোন মুখ্য তো নয়ই, এমনকি কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও যে সে আন্দোলনে ছিল এমন বলা চলে না, যদিও তাদের মুসলিম ছাত্র লীগের বিভিন্ন স্তরের কিছু কর্মী ও নেতা তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে সব থেকে সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো নারায়ণগঞ্জের খান সাহেব ওসমান আলীর। এ কারণে তাঁর ও তাঁর সমগ্র পরিবারের ওপর তখন যে নির্যাতন হয়েছিল সেটা অন্য কারও উপর হয়নি।

পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা রাত্রের 'সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি'র বৈঠকে তাদের প্রকাশ্য প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ২১শে তারিখে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরোধিতা করে। তাদের দিক থেকে সে সময় এই বিরোধিতার যুক্তি সঙ্গত কারণ ছিল। ১৯৪৮-৫০ সালে রণদিভে লাইনের হঠকারিতা এবং তার পরিণতিতে পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিপুল ক্ষতির কথা মনে রেখে স্বভাবতঃ কোনও পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া ওই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে তারা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কৃতিত্ব ছিল এই যে, ২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্রেরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হল সে পরিস্থিতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে তারা সঙ্গে সঙ্গেই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। আন্দোলনের সমর্থনে তখন কমিউনিস্ট পার্টিই গোপনে সব থেকে অধিকসংখ্যক লিফলেট ছেপে প্রকাশ করে। এ ব্যাপারে পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত ছাত্রকর্মী হিসেবে হাসান হাফিজুর রহমান যথেষ্ট কাজ করেন। সেই লিফলেটগুলি বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত [আমার দ্বারা সম্পাদিত *'ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গঃ কতিপয় দলিল'*-এর দ্বিতীয় খণ্ডে ছাপা হয়েছে।]

কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 'যুবলীগ'ই সে সময় সাংগঠনিকভাবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যদিও একথা বলা যাবে না যে, তৎকালীন আন্দোলন কোনও একটি সংগঠন অথবা কোনও একজন নেতার পরিচালনাধীন বা নেতৃত্বাধীন ছিল। কিছু সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ থাকলেও তখনকার ভাষা আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ততার দিকটি ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য,

www.pathagar.com

তাৎপর্যপূর্ণ ও শক্তিশালী। একথা বলার অর্থ, সেই আন্দোলনে সব কিছু ছাড়িয়ে জনগণের ভূমিকা শহর থেকে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্রই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাঙলার জনগণই ছিলেন ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত নায়ক। [এ কারণেই আমি নিজে তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' তাঁদের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করেছি]

'পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ' সাংগঠনিকভাবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার কারণেই সেই সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের সক্রিয়তা ছিল সব থেকে বেশী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন যুবলীগের দুই সহ-সভাপতি মহম্মদ তোয়াহা ও নারায়ণগঞ্জের শামসুজ্জোহা, সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ, দুই যুগ্ম সম্পাদক ইমাদুল্লাহ ও মহম্মদ সুলতান প্রভৃতি। পাবনার আবদুল মতিনের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে আবার যদি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে একজনের নাম করতে হয় তাহলে তিনি হলেন, অলি আহাদ। বর্তমানে তাঁর নাম এখন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ 'ভাষা সৈনিক' হিসেবে কেউ করে না। কিন্তু একজনের বর্তমান অবস্থান দেখে তার অতীত ভূমিকার বিচার কোনও যোগ্য ঐতিহাসিক এবং ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিই করবেন না। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আমাকে যে চিঠি দেন সেই চিঠির লিখিত বক্তব্য থেকে আমি একটা অংশ উদ্ধৃত করছি। চিঠিটি তিনি আমাকে লিখেছিলেন অলি আহাদ তাঁর এক রাজনৈতিক আত্মজীবনীমূলক বইয়ে তাঁর সম্পর্কে একটি ব্যাপারে অন্যায়ভাবে দোষারোপ করার পর প্রকৃত ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে। তিনি তাতে লেখেন, "জেল থেকে বেরিয়ে অলি আহাদ আমাকে বলেন যে, গোলাম মাহবুবের কথায় তাঁর আমার সম্পর্কে সন্দেহ হয়েছিল এবং এই মিথ্যে সন্দেহের জন্য তিনি আমার কাছে মাফও চান। এখন শুনছি, তাঁর স্মৃতিকথায় আমার সম্পর্কে একটা বক্রোক্তি আছে। অলি আহাদদের পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মপন্থা সম্পর্কে আমার তীব্র বিরাগ থাকলেও ভাষা আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্বের জন্য আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। প্রকাশ্যে তাঁর নাম বহু সভায় বলেছি- যখন তাঁর কথা ভুলে সবাই শেখ মুজিবের নাম বলছিলেন।"

আনিসুজ্জামান শেখ মুজিবের প্রতি "শত্রুভাবাপন্ন" নন। শেখ মুজিব বরং তাঁর একজন শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু আনিসুজ্জামানের এই বক্তব্য থেকেও বোঝা যায়, অলি আহাদ ও শেখ মুজিবের মধ্যে প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রাহ্য ভূমিকা কার ছিল। কাজেই শেখ মুজিবর রহমান পরবর্তী সময়ে এদেশের রাজনীতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বলেই তিনি মাতৃজঠর থেকেই "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"ঃ "পূর্ব বাঙলা স্বাধীন করো" বলে কোন হুঙ্কার ছাড়েননি। কিন্তু এই হুঙ্কারই এখন তাঁর দলের লোকজন এবং তাঁদের সমর্থক এবং অনুগৃহীত বুদ্ধিজীবীর দল ছাড়ছেন। এই কাণ্ডকারখানার তুফানে এ ক্ষেত্রে যা কিছু সত্য সবই খড়কুটোর মতো উড়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত গল্পে পাশ্ববর্তী দুই গ্রামের মাষ্টারদের বিদ্যার লড়াইয়ের কথা। মিথ্যার ডাক-ঢোল, কাড়ানাকাড়া কীভাবে মিথ্যাকে সাধারণ অশিক্ষিত অথবা তথ্য সম্পর্কে অনবহিত লোকদের সামনে সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সেটাই হল, সেই গল্পের মর্মার্থ। প্রভাত মুখোপাধ্যায় দুই গ্রামের অশিক্ষিত লোকদের বৌদ্ধিক ও বিদ্যাগত দুরবস্থার যে কাহিনী সেখানে বর্ণনা করেছেন তার থেকেও করুণ দুরাবস্থা আজ সারা বিশ্বের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে সব থেকে গৌরবোজ্জ্বল ভূখণ্ড এই পূর্ব বাঙলার জনগণের।

[বদরুদ্দীন উমরঃ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, স্বনামধন্য লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক। লেখাটি লেখক সম্পাদিত মাসিক "সংস্কৃতি" সপ্তম বর্ষ সপ্তম সংখ্যা, মার্চ, ১৯৯৮ প্রকাশিত। এখানে নিবন্ধটির ভাষা আন্দোলনের অংশটি ছাপা হয়েছে]

www.pathagar.com

ভাষা সৈনিক সুলতানের মতো অলি আহাদের মৃত্যু যেন ঢাকা মেডিকেলের বারান্দায় না হয়

বখ্‌তিয়ার উদ্দীন চৌধুরী

ছোট পার্টির পক্ষে বেমানান বিরাট বড় এক নেতা হয়ে রইলেন তিনি তিন দশক ব্যাপি। প্রথম জীবনে নাকি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন কিন্তু ছয় দশক থেকে তাকে দেখেছি সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলতে। বেসামরিক স্বৈরশাসককেও তিনি কখনও মেনে নেননি। তার ছাত্রজীবনের গৌরবময় অধ্যায় ছিল বিপিসি রিপোর্ট এবং ভাষা আন্দোলনে তার বিপ্লবী ভূমিকা। সমগ্র আন্দোলনে তার তেজোদ্দীপ্ত ভূমিকা অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। অলি আহাদের অনমনীয় ভূমিকার কারণে সেদিন ভাষা আন্দোলন থিতিয়ে পড়েনি বা সমঝোতার চোরাপথে হারিয়ে যাওয়াও সম্ভব হয়নি। অবশ্য অনমনীয় ভূমিকায় অলি আহাদ একক ছিলেন একথা বলছি না তবে তিনি তার ভূমিকায় সোচ্চার ছিলেন। পেশা হিসেবে রাজনীতি এদেশে অত্যন্ত কঠিন। ন্যায় অন্যায়ের সাথে হাত ধরাধরি করে চলতে হয় যেন সুযোগ সুবিধা ভোগ করার পথ উন্মুক্ত থাকে আর না হয় নিতান্ত কন্টকপূর্ণ পথে জীবন চলার পথ শেষ করে অসহায়ভাবে জীবনের পরিসমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। আমাদের দেশের রাজনীতিতে এমন দু'একজন ট্র্যাজেডির নায়কের সাক্ষাত মেলে যারা ক্ষমতার লোভ আর কামিনীকাঞ্চনের মোহকে উপেক্ষা করেছেন চিরদিন, অলি আহাদ তাদের মাঝে অন্যতম। অলি আহাদের জীবনে নৈতিক বিচার সার্বত্রিক; সেখানে "যদি" বা "তবে"র স্থান নেই। সম্ভবতো মরালিটির ব্যাপারে তিনি ইমানুয়েল কান্ট এর অনুসারী। তার জীবনে মনে হয় ম্যাকিয়াভ্যালির পাঠ নেওয়া সম্ভব হয়নি। অত্যাচার, উৎপীড়ন ইত্যাদির ভীতি অথবা সাময়িক লাভালাভের প্রশ্ন তাকে কোনো দিন প্রভাবিত করতে পারেনি। তিনি যেটাকে নীতিগতভাবে সঠিক মনে করেছেন তাকেই অবলম্বন করে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছেন। তাই রাজনৈতিক মহলে তাকে নিয়ে কখনও অস্চিয়তা, সন্দেহ ইত্যাদির প্রশ্ন দেখা দেয়নি। অলি আহাদকে অনেকে কর্কশভাষী এবং দাম্ভিক বলে মনে করে থাকেন। মহৎ কাজে ফাঁকি চলে না একথায় যারা বিশ্বাস করেন তারা অনিয়ম দেখলেই গর্জে উঠেন। এটা দাম্ভিকতা নয়। ১৯৪৮ সালে কায়দে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে (২৪ মার্চ) রাষ্ট্র ভাষা কমিটির যে বৈঠক হয় সে বৈঠকে জিন্নাহর সাথে শামসুল হক ও অলি আহাদের কথা কাটাকাটি হয়েছিলো। জিন্নাহ যখন অলি আহাদকে আঙ্গুল উঁচু করে বলেছিলেন, I know you. তার প্রত্যুত্তরে অলি আহাদও বলেছিলেন। I know you are the governor general whom the queen of England can remove on our appeal. এটা ছিল অলি আহাদের এক রকম সাহস এবং নির্ভীকতা। এটা কোন অশালীন ঔদ্ধত্য নয় কিংবা মস্তানিভাবের প্রকাশও নয়। এটা ছিলো তার আত্মবিশ্বাস প্রসূত সাহস এবং যে কোন পরিস্থিতিতে মেরুদন্ড খাড়া করে দাঁড়াবার শক্তি।

www.pathagar.com

ছাপ্পান্ন সালে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আর অলি আহাদ ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক। এ দু'মহান ত্যাগী পুরুষের কর্ম প্রচেষ্টায় আওয়ামী লীগ বাংলার মাটিতে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। মওলানা ভাসানী ছিলেন তখন সংগঠনের সভাপতি। সম্ভবত সেটা ছিলো আওয়ামী লীগের স্বর্ণযুগ। তিন মহান জাতীয়তাবাদীর কর্মকৌশলে আওয়ামী লীগ তখন থেকেই তার কর্মীবাহিনীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের পাঠ দেয়া আরম্ভ করেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের মানসিক প্রস্তুতির কাল মূলতঃ তখন থেকেই শুরু। বঙ্গবন্ধু এবং অলি আহাদের মাঝে বিরোধ ছিলো। অথচ এ দু'ত্যাগী পুরুষের ভিতর কোথাও যেন একটা গভীর মিল ছিল যা বারবার ঢাকা পড়ে গেছে খন্ডখন্ড বিরোধের কোলাহলে। সত্তরের নির্বাচনে যখন মওলানা ভাসানী এবং অলি আহাদ অনুধাবন করলেন জাতীয়তাবাদী ভোট ভাগাভাগি হয়ে যাওয়া কখনও ঠিক হবে না তখন আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়কে নিশ্চিত করার জন্য তারা তাদের স্ব স্ব দলের সব প্রার্থীর প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেছিলেন। জলোচ্ছ্বাসের কথা বলা ছিল বাহানা মাত্র। সত্তরের নির্বাচনের পরে যখন আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে আসলো তখন মওলানা এবং অলি আহাদ সারাদেশে স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য মিটিং মিছিল আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। যতটুকু মনে পড়ে স্বাধীনতার পক্ষে একা মওলানা ভাসানীই ২৫ মার্চের পূর্ব পর্যন্ত ৮৬টি জনসভা সমগ্র দেশে ঘুরে ঘুরে করেছিলেন। অলি আহাদও স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনে তার সীমিত সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে সক্রিয় ছিলেন। অনেকের ধারণা, বঙ্গবন্ধুর পরামর্শেই মওলানা আর অলি আহাদ স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনের কাজ আরম্ভ করেছিলেন। ১ মার্চ থেকে যখন বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন তখন অলি আহাদ পল্টনে জনসভা করে বঙ্গবন্ধুকে রেসকোর্সের খোলা আকাশের নিচে পার্লামেন্টের অধিবেশন ডেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যের সম্মতিক্রমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা দেয়ার আহবান জানিয়েছিলেন। সে সভাটির কথা টিভিতে সেদিন খুবই গুরুত্ব সহকারে সচিত্র প্রচার করেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে আওয়ামী লীগ ছাড়া আর যে কয়জন নেতা ও দল সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল তার মাঝে অলি আহাদ এবং তার দল বাংলা জাতীয় লীগ অন্যতম। তার দলের ছাত্র সংগঠন ফরওয়ার্ড স্টুডেন্ট ব্লক এর কেন্দ্রীয় সভাপতি লুৎফর রহমানসহ বহু কর্মী স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে জামায়াতের নেতা গোলাম আজম বায়তুল মোকাররমের এক সমাবেশে অলি আহাদকে বঙ্গবন্ধুর চেয়েও জাতির জঘন্যতম শত্রু বলে আখ্যায়িত করে তার খতনা করা হয়েছিল কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, পাঁচ দশকে অলি আহাদ যখন ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে যুবলীগ নিয়ে কাজ করছিলেন তাঁতী বাজারে মুসলীম লীগের গুন্ডারাও তার খত্না নিয়ে একই প্রশ্ন তুলেছিল।

অলি আহাদ ছাত্র হিসেবেও মেধাবী ছিলেন। কিন্তু বি কম পাশ করার পর উচ্চশিক্ষা লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে এম কম ক্লাশে ভর্তি হতে সুযোগই দেয়নি। তার ভর্তি হওয়ার আবেদন প্রত্যাখান করার পর পাকিস্তান অবজারভার সম্পাদকীয় লিখেছিলো। নাতিদীর্ঘ সম্পাদকীয়ের শেষাংশে বলা হয়েছিলো।

"A student who has taken a rather prominent part in the battle of the scripts and also in theB.P.C. movement has been denied admision into the University. That is tantamount to denying the possibility of acquiring

www.pathagar.com

high academic distinction to this boy who stood first in the examination leading to his graduation".

অনাড়ম্বর জীবনে বিশ্বাসী অলি আহাদ চিরদিন রাজনীতিকে মিশনারী ওয়ার্ক বলে মনে করেছেন। তাই কখনও তিনি ক্ষমতার জন্য কোথাও আত্মবিক্রি করে বসেননি বা ক্ষমতার জন্য চোরাগলিতে ঘুরে বেড়ানোও তার স্বভাব ছিলো না। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সম্ভবত তিনি স্পষ্টবাদিতার ও স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন কথা বলে রাজনীতি করার শেষ ব্যক্তিত্ব। তার তিরোধানের পর বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে শেষ পরিচ্ছন্ন মানুষটিরই অবসান হবে বলে আংশকা করি। অলি আহাদ তার দীর্ঘ জীবনের রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে লিপিবদ্ধ করে যাবার তাগিদে "জাতীয় রাজনীতি ৪৫ থেকে ৭৫" নামে একটি বই লিখেছেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক এ গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে তার স্পষ্টবাদিতার ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে তার মতামত প্রকাশ করেছেন সরাসরি যার সঙ্গে পাঠক একমত হতে পারেন নাও পারেন কিন্তু পাঠককে স্বীকার করতেই হবে যে তিনি ঘটনা বিশ্লেষণে নির্লিপ্ত ও নৈর্ব্যক্তিকতার পরিচয় দিতে পেরেছেন খুবই দক্ষতার সাথে। ভাষা আন্দোলনে অলি আহাদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা সর্বজনবিধিত ঘটনা সে ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকাকে নিয়ে কতিপয় বামপন্থী বিতর্ক সৃষ্টি করেছে বারবার। অথচ অলি আহাদ তার গ্রন্থে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। ঘটনাকে বাড়িয়ে বলা বা কাউকে ছোট করার জন্য ঘটনাকে অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার মতো কোনো হীনমন্যতাই তার গ্রন্থে প্রকাশ পায়নি। অথচ তিনি বইটা রচনা করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলে জেলখানায় বসে। শুধু গুণের সামর্থ্যে গুণীজনের পক্ষে সমাজে স্বীকৃতি পাওয়া ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। যারা সৎ এবং স্পষ্টভাষী তারা জীবন কাটান অবহেলার অন্ধকারে। দুনিয়া থেকে বিদায় নেন রিক্ত হস্তে।

অলি আহাদ দীর্ঘ ১০/১১ বছর জেলখানায় ছিলেন। জিন্নাহ থেকে এরশাদ প্রত্যেকের কারাগারে থাকার সৌভাগ্য তার হয়েছে। মূলতঃ তার যৌবনের স্বর্ণদিনগুলো কেটেছে কারাগারের অন্ধপ্রকোষ্ঠে। আইয়ুবের জেলে থেকে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে তিনি তার বাবার শেষ কৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন আর এরশাদের জেলখানা থেকে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে তার গর্ভধারিনী জননীর শবযাত্রায় শরিক হয়েছিলেন। এ রকম বহু নির্মতার শিকার হওয়াই ছিল অলি আহাদের রাজনৈতিক জীবনের বাস্তবতা। জীবনের মধ্যপথে এসে বিয়ে করেছেন। একটি মাত্র কন্যা সন্তান। কোনো ঘর বাড়িও নেই এ শহরে।

বর্তমানে অলি আহাদের বয়স সত্তর বছর। রোগে শোকে কাতর হয়ে পড়ে আছেন এলিফ্যান্ট রোডের বাসায়। দীর্ঘদিন ব্যাপি দূরারোগ্য রোগে ভুগছেন। বিদেশে চিকিৎসার প্রয়োজন। একবার আলাপ প্রসঙ্গে বললেন, অর্থের সংকুলান হলে রিয়াদ হাসপাতালে যেতেন। আত্ম-সম্মানবোধ প্রকট সম্ভবত সে কারণে তার শেষ আকাঙ্খার কথা কাউকে বলতেও পারছেন না। একবার বললেন, মানুষের চিন্তার বিষয় মৃত্যু নয়। মানুষের চিন্তার বিষয় হচ্ছে অসম্মান। সুতরাং বুঝলাম এখনও আত্ম-সম্মানবোধ সম্পর্কে প্রচন্ডভাবে সতর্ক তিনি। রিয়াদ হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যাপারে নিজে উৎসুক হলেও সে কথা হয়তো তিনি কাউকেও বলবেন না।

ভাষা সৈনিক সুলতান দীর্ঘদিন রোগশোকে ভুগে অবশেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বারান্দায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। অলি আহাদকে দেখে সে কথাই মনে পড়লো। অর্থ সম্বলহীন এ সংগ্রামী সিংহ শাবকটিরও কি শেষ পরিণতি ভাষা সৈনিক

www.pathagar.com

সুলতানের মতো হবে। এ জাতি গুণীজনের মর্যাদাদানে প্রচন্ডভাবে উদাসীন। মহাকবি আলাউল খুবই আক্ষেপ করে লিখে গেছেন "মন্দকৃর্তি ভিক্ষাবৃত্তি হইল পরবশ"। শেষ বয়সে আলাউল ভিক্ষা করেই জীবন নির্বাহ করেছিলেন। বীর সমাদৃত না হলে বীর জন্ম নেয় না। সুতরাং মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী সবার প্রতি আবেদন-আপনারা অলি আহাদের চিকিৎসার ব্যাপারে উদ্যোগী হউন। মৃত্যুর পরে আর মরণ নেই। হয়তো অলি আহাদ মৃত্যুকে পার হয়ে অমরত্বের দিকে চলে যাবেন তবে জাতির ললাটে এ দুভার্গ্যের কথা লেখা থাকবে যে তার এক বীর সন্তান বিনা চিকিৎসায় মরে গেছে।

[বখতিয়ার উদ্দীন চৌধুরীঃ বিশিষ্ট রাজনীতিক ও কলামিষ্ট। নিবন্ধটি সাপ্তাহিক সুগন্ধা কাগজ-এর ৬ নভেম্বর, ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয়।]

৩০ জুলাই ১৯৯৬ সালে জেনারেল আবুল মঞ্জুর, চট্টগ্রামে নিঃশংসভাবে নিহত শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হত্যার বিচারের দাবীতে রাজপথে মশাল মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন জননেতা অলি আহাদ এবং ডেমোক্রেটিক লীগ নেতৃবৃন্দ।

www.pathagar.com

তৃতীয় মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে অলি আহাদ

কবিন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হতে শুরু করে ব্রাহ্মন্যবাদী নেতা ও তাদের অনুচর যারাই বাংলার জমিদার ছিল তারাই বাংলার কৃষক প্রজাদের রক্ত শোষণ করে কোলকাতা তথা পশ্চিম বঙ্গের ধনাঢ্য শ্রেণীতে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠে এবং সেই সুবাদে ইংরেজদের পদলেহনকারী হিসেবে বঙ্গের প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থল "রাইটার্স বিল্ডিং" এককভাবে সাম্প্রদায়িক কবজা করে যাতে বঙ্গীয় মুসলমানদের কোন স্থান ছিল না। শুধুমাত্র কয়েকটা ছিঁটে ফোটা কেরানী ও পিয়ন ছাড়া। প্রশাসনিক কর্তা ব্রাহ্মণ হিন্দুদের ঐকান্তিক প্রচার প্ররোচনা ও উৎসাহে বাংলার কাঁচা পাটের ব্যবসা হিন্দীভাষী ব্রাহ্মণ মাড়োয়ারী সম্প্রদায় কুক্ষিগত করে। ফলশ্রুতিতে কোলকাতা-হুগলীতে শত শত পাটকল (Jute Mills) গড়ে উঠে। আর এই পাটকল মালিকদের সহায়তায় নব্য ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় পশ্চিম বঙ্গে নানা শিল্প কারখানা গড়ে তুলে। পূর্ব বাংলায় একটিও পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই- অথচ কাঁচা পাট ছিল বাংলার মাটির। ফলে ইংরেজ ও ইংরেজী শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আরাম আয়েসে বসবাসের জন্য সুরম্য আধুনিক কোলকাতা ও তার আশপাশ গড়ে তুলে।

বাংলার মুসলমান কৃষক প্রজা ও অচ্ছ্যুত হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্মানজনক জীবন যাপনের কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের প্রতিভূ অর্থাৎ স্যার আশুতোষ মুখার্জী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম বড় বড় ব্রাহ্মণ হিন্দু কর্তারা ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করে বঙ্গ-আসাম প্রদেশ প্রতিষ্ঠা বাতিলের দাবীতে হিন্দু পরিচালিত প্রবল গণ-আন্দোলন গড়ে তুলে এবং ইংরেজ সরকারের কৃপা আকর্ষণ করে বঙ্গ-আসাম প্রদেশ রদ করতে সফল হয়। যার মুল কারণ যাতে মুসলমান আর অচ্ছ্যুত হিন্দুরা স্বাবলম্বী এবং অগ্রসর সম্প্রদায়ে পরিণত হতে না পারে। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় স্যার আশুতোষ মুখার্জী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত উচ্চ বর্ণের হিন্দু শ্রেণী আদাজল খেয়ে বাধা দেয় উদ্দেশ্য মুসলমান ও অচ্ছ্যুত সম্প্রদায় যেন জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হতে না পারে। অভিজাত ধনাঢ্য উচ্চ হিন্দু সম্প্রদায়ের কুচক্রান্ত বাংলার নয়নমনি টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীর জমিদার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ঠিকই ধরে ফেলেন। তিনি তার সউদ্যোগে দিল্লী- কোলকাতা ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সাথে দেন-দরবার করে রবীন্দ্রনাথ-আশুতোষ মুখার্জীর মত মুসলমান ও অচ্ছ্যুত হিন্দু সম্প্রদায় বিদ্বেষীদের সর্ব প্রকার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বাধা বিপত্তিকে পরাজিত করে স্বীয় জমিদারী বন্ধক রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাই আজ আমরা যত সামান্যই হউক না কেন জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাই। সুযোগ পাই স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করার, প্রশাসক হওয়ার। ১৯৪৭ সালে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নার ডাকে সমগ্র বঙ্গদেশের মুসলমানরা পৃথক আবাস ভূমির দাবীতে একচেটিয়া ভোট দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবীকে শক্তিশালী করে। ফলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বঙ্গীয় প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। হিন্দু কংগ্রেস

www.pathagar.com

নেতা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী গান্ধী মহারাজ গোষ্ঠী ও গান্ধী মহারাজ পদলেহী গাদ্দার মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, দেওবন্দের হোসেন আহমদ মাদানী, পাঠান কোটের মাওলানা মওদুদী গোষ্ঠীকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টায় কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র সমর্থনে তদানীন্তন বঙ্গীয় ইংরেজ গভর্ণর বারোজ এর প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সহ্‌রাওয়ার্দী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ জেনারেল সেক্রেটারী আবুল হাশিম, আজাদ হিন্দ-আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের অগ্রজ শরৎ চন্দ্র বোস, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদ কংগ্রেস দলীয় নেতা মানিকগঞ্জের জমিদার কিরণ শংকর রায় ও অচ্ছ্যুৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র নেতা তদানীন্তন মন্ত্রী যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল হিন্দুস্থানের গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে 'স্বাধীন বঙ্গ রাষ্ট্র' (Free state of Bengal) প্রতিষ্ঠার দাবীতে গণভোটের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু গান্ধী মহারাজ ও তদীয় চেলা নেহেরু-প্যাটেল গণভোট হতে দেয় নাই। এত বিশ্বাসঘাতকতা ও গাদ্দারী সত্ত্বেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমরা বিজয়ী হই। ইহাই আমাদের প্রথম মুক্তিযুদ্ধ —

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর একই লুণ্ঠন শোষণ ও শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে পাঞ্জাবী স্বার্থান্বেষী মহাচক্রের নেতৃত্ব সামরিক-বেসামরিক চাকুরী, ব্যবসা বাণিজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। প্রথম আঘাত আসে মায়ের ভাষার উপর। মায়ের ভাষা বাংলা লিখতে হবে আরবী হরফে। এ প্রস্তাব করে বাঙ্গালী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমান, তার সমর্থনে আসে মাওলানা মাদানীর চেলা কিশোরগঞ্জের মাওলানা আতাহার আলী। বাধ্য হয়ে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ছাত্রযুব সম্প্রদায় মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে গর্জে উঠলো। যেই পাটের অর্থে গড়ে উঠেছিল কোলকাতা ও তার আশপাশ সেই পাটের টাকায় করাচী-লাহোর-পেশোয়ার, গড়ে উঠলো সুরম্য হয়ে।

পূর্ববঙ্গেও ব্যবসা বাণিজ্যে চাকুরীতে একচ্ছত্র রাজত্ব কায়েম হলো উর্দু ভাষীদের। গর্জে উঠে বাংলা। ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ হক-ভাসানী যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার পক্ষে একচেটিয়া রায় দেন। ১৯৪৮-৫২ সালে মাতৃভাষা বাংলার দাবীতে খাজা নাজিমুদ্দিন ও মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনের বুলেটের সামনে ছাত্র যুবক বুক চিতিয়ে দেয়। রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হয়। পাঞ্জাবী গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, ইসকান্দর মির্জা, আইয়ুব-মোনায়েম খাঁ বাঙ্গালীদের দাবিয়ে রাখতে দানবীয় শক্তি ব্যবহার করে অত্যাচার-নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালায়। ১৯৬৬ সালে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে ৬ দফার প্রবল আন্দোলন মুজিব-কমোডর মোয়াজ্জেম হোসেন-সার্জেন্ট জহুরুল হক সহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। গর্জে উঠে ছাত্র-জনতা, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর গণবিদ্রোহ গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক ১১ দফা আন্দোলন কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র জনতার মিলিত গর্জনে ভেসে যায় আইয়ুব-মোনায়েমের ষড়যন্ত্র, মুক্তি পায় সবাই কিন্তু মুক্তি পায়নি সার্জেন্ট জহুরুল হক। ঢাকা ক্যান্টেমেনন্টে বন্দী অবস্থায় পাক বাহিনী তাকে গুলি করে হত্যা করে। জনতার রুদ্ররোষে খড়কুটার মতো ভেসে যায় আইয়ুবের শাসন। আইয়ুবের পতনের পর জেনারেল ইয়াহিয়ার মসনদে আরোহন-১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে ৬ দফার প্রবক্তা শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ একচেটিয়া বিজয় পায়। আর বাঙ্গালীকে চিরদাসে পরিণত করতে শুরু হয় ইয়াহিয়া-ভূট্টো চক্রের মরণ কামড় ষড়যন্ত্র। নরখাদক ইয়াহিয়া-ভুট্টো জাতীয় লোকদের পরিকল্পনায়

www.pathagar.com

২৫শে মার্চ কালরাত্রিতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মূল আসামী কমডোর মোয়াজ্জেম হোসেনকে পাক হানাদার বাহিনী এলিফ্যান্ট রোডে হত্যা করে এবং বাঙ্গালী নিধন পর্বে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ৬ দফা অন্দোলনের একচ্ছত্র নেতা শেখ মুজিব পাক বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। অন্যদিকে মজলুম নেতা মওলানা ভাসানী জাতীয় মুক্তির উদগ্র বাসনায় স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার মানসে তার চির বৈরী ভারতে গমন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। জয়ী হয় বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ। ইহাই আমাদের দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ-

১৯৯২ সালে ৬ই ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ ধ্বংসের উদ্যোক্তা ও তদস্থলে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠায় অতি সম্প্রতি অগ্রনী ভূমিকায় ব্রাহ্মণ্যবাদী বাজপায়ী- আদভানী সরকারের একান্ত প্রত্যক্ষ সমর্থক বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের উগ্র নেতৃত্বে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাক্কা গুজরাটে মুসলিম অধিবাসীদের উপর গণহত্যা আবার থেমে থেমে মুসলমানদের রক্তে গোসল আজও চলছে। শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী ও জ্যোতি বসুর অনুসারীরা হিন্দু বাংলা কায়েম করে দিল্লীর বশংবদ প্রদেশে পরিণত করার লক্ষ্যে আদাজল খেয়ে ১৯৪৭ সালে মাঠে নামে। অধুনা তাদেরই তলপী বাহক গোষ্ঠী বঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠার আওয়াজের সহিত মওদুদী, হোসেন আহম্মদ মাদানী, মাওলানা আজাদের বশংবদ গোষ্ঠী বাংলায় নানা ষড়যন্ত্রে দেশকে টালমাটাল অস্থিতিশীল করার হীন প্রচেষ্টায় লিপ্ত- সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দেশে নৈরাজ্য অরাজকতা সৃষ্টিতে ষোলকলা পূর্ণ করবে।

মুক্তিযুদ্ধের পর লুটেরা গাদ্দার হায়েনারা ব্যক্তি ও পারিবারিক স্বার্থে ৩১ বৎসরে দেশটিকে ধ্বংসের দ্বারে পৌছে দিয়েছে। তাই আজ মোনাফেক গাদ্দারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে- রক্ত দিয়েছি আরো দেব-অর্থগৃধনু অশিক্ষিত আর অর্ধশিক্ষিত দুর্নীতি পরায়ণ মন্ত্রীদের 'গড় ফাদার' রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবসান করবো। তাই তৃতীয় মুক্তিযুদ্ধের ডাক-

সন্ত্রাস-দূর্নীতির বিরুদ্ধে-সৎ শিক্ষিত জ্ঞানী-বিজ্ঞানী নির্লোভ দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব কায়েম করবই।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের ভাষায়-

"সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের
দেশের তরে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের"

বাংলাদশ জিন্দাবাদ-সন্ত্রাস দূর্নীতি নিপাত যাক।

[লেখাটি ৭ই এপ্রিল , ২০০২ তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়।]

www.pathagar.com

সামরিক আদালতে অলি আহাদের জবানবন্দি

[২২ নভেম্বর, ১৯৮৩ সালে সামরিক শাসক এরশাদ জননেতা অলি আহাদকে গ্রেফতার করে। ৮ অক্টোবর, ১৯৮৪ সালে ৭ নং সামরিক আদালতে জনাব অলি আহাদ নিম্নোক্ত জবানবন্দী প্রদান করেন]

মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়,
আমি নির্দোষ,

আক্রোশ চরিতার্থ করার হীন উদ্দেশ্যেই এ মিথ্যা মামলা আমার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে। ভারত সরকারের সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনাকে তরান্বিত করার স্বপক্ষে বর্তমান সরকারের নতজানু নীতির বিরুদ্ধে আমার আপোষহীন ভূমিকা এবং আমার সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ পত্রিকার মাধ্যমে প্রশাসনের উঁচু তলার দূর্নীতি সম্পর্কিত লেখনীই এ মিথ্যা মামলা সাজানোর মূল কারণ। আমার পত্রিকায় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের গুলশানের বাড়ীর ছবি ছাপানো হয়েছিল। ছবি সম্বলিত সে সংখ্যা এবং মামলায় পেশকৃত পত্রিকার অন্যান্য সংখ্যার মধ্য দিয়ে পত্রিকার ভুমিকাও অত্যন্ত পরিস্ফুট।

বেআইনীভাবে মামলাটিকে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট থেকে এ বিশেষ সামরিক আইন আদালতে আনা হয়েছে। এমন কি রেকর্ডকৃত তথ্য থেকেই এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে মামলাটি মিথ্যা ও বানোয়াট; সর্বোপরি গত ৩রা অক্টোবর (৮৪) এক সরকারী আদেশে সাপ্তাহিক ইত্তেহাদের প্রকাশনাও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

উপরোক্ত বক্তব্য ছাড়াও আপনার অনুমতিক্রমে আরও কিছু বলতে চাই। শুনেছি, এক আদেশ বলে স্থির করা হয়েছে যে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের বিশেষ নির্দেশ ছাড়া সামরিক আইন বিধির অধীনে কাউকেই ২৪শে এপ্রিলের (৮৪) পরে গ্রেপ্তার করা হবে না; কিংবা ২৪শে এপ্রিলের (৮৪) পরে চার্জশীট করা হলে সামরিক আইন বিধির অধীনে বিচার অনুষ্ঠিত হবে না। মনে হয়, আমার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা ক্রোধ ও আক্রোশমূলক এক ব্যতিক্রম। কিন্তু এ ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবস্থা আমাকে বিস্মিত করেনি। একদিকে স্বৈরশাসকের উৎপীড়ন অন্যদিকে অগণিত মহৎ ব্যক্তিত্বের অবর্ণনীয় আত্মত্যাগের ভুরি ভুরি নজীর ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে। অত্যাচারের বেদীতে নিঃশংক আত্মত্যাগের ভিত্তিভূমিতেই গড়ে উঠেছে মানবীয় মূল্যবোধ ও সভ্যতার সুরম্য প্রাসাদ। মানবতার সেবার পথ চিরদিনই কন্টকাকীর্ণ। সৃষ্টির আদি প্রত্যুষ থেকেই শুরু হয়েছে ক্রুসেডারদের বিঘ্নসংকুল অভিযাত্রা। সভ্যতার অগ্রযাত্রার বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত হয়েছেন অগণিত মহৎ প্রাণ। অনেকের ভাগ্যে নেমে এসেছে উৎপীড়ন, আক্রোশ আর নির্যাতন কিন্তু কাফেলার অব্যাহত অগ্রযাত্রা বিঘ্নিত হয়নি; ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে তাঁরা উপহার দিয়ে গেছেন সভ্যতার মূল্যবান স্তম্ভসমূহ। অনাগত সভ্যতার জন্য তাঁরা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। এটা এক

www.pathagar.com

সদাপ্রবাহমান চিরন্তন ধারা, আত্মত্যাগের অনির্বান আদর্শ পরবর্তী বংশধরদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। ঘৃণ্য ও নীচ মানসিকতাসম্পন্ন ইতিহাসের খলনায়করা এ অভিযাত্রাকে স্তব্ধ করতে পারেনি। মহান প্রচারক, রাজনীতিক কিংবা মূল্যবোধের প্রবক্তরা তাঁদের বিশ্বাসের বিনিময়ে পার্থিব খ্যাতি ও স্বাচ্ছন্দ্যকে বরণ করে নেন নি। ইতিহাসের এই গৌরবময় ধারার প্রেক্ষিতে আমি অতি নগণ্য। কিন্তু সভ্যতা ও মূল্যবোধের সেই প্রার্থিত মান ও গুণগত মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে যে মহান অভিযাত্রীরা আজও এই রৌদ্রস্নাত পৃথিবীতে বেঁচে আছে, আমি তাঁদের সেই অভিযাত্রার একজন অংশীদার। আমার কাছে ন্যায়ের সপক্ষে আত্মত্যাগের দূর্নিবার প্রেরণা এক অতীন্দ্রিয় সুষমায় অভিষিক্ত।

এখানে আমার সাথে আরও চারজন আছে, যারা তারুণ্যের প্রদীপ্ত চেতনায় উজ্জীবিত। মৌল প্রশ্ন হচ্ছে, আমাকে সামরিক আইন বিধির অধীনে গ্রেপ্তার ও বিচার করার জন্য প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের এতটা আক্রোশের কারণ কি? ক্ষমতার শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত গুটিকতক ব্যক্তি বোধ হয় এই নিরেট সত্য বিস্মৃত হয়েছেন যে, তাদের চাকুরী প্রাপ্তি, প্রমোশন কিংবা বর্তমান অবস্থানের জন্য তারা আমাদের মত রাজনীতিকদের কাছেই ঋণী, যে রাজনীতিকরা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছেন। '৪৭ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের ফলেই লেঃ কর্ণেল আইয়ুব খান ত্বরিত প্রমোশন পেয়ে রাতারাতি জেনারেল হতে পেরেছিলেন।

অকৃতজ্ঞ আইয়ুব খাঁন তাঁর হাতে ন্যস্ত বন্দুক-ক্ষমতার মাধ্যমে সাংবিধানিক সরকারকে উৎখাত করে, সংবিধান বাতিল করে, এমনকি পাকিস্তানের স্রষ্টাদের উপর চাপিয়ে দেয় নির্যাতনের ষ্টীমরোলার এবং এর মধ্যদিয়ে পাকিস্তান বিভাজনের বীজও বপন করে। যদি কায়দে আজমের নেতৃত্বে রাজনীতিকরা পাকিস্তানের জন্ম না দিত, যদি দিল্লী সরকারই থাকত অখন্ড ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা তাহলে লেঃ জেঃ এরশাদ তো দূরের কথা জেনারেল আইয়ুবের মত ব্যক্তিবর্গও যে ঐশ্বর্য ও মর্যাদা ভোগ করেছেন বা করছেন তা তাদের ভাগ্যে জুটত না। ভারতীয় দেশরক্ষাবাহিনী রাজনীতিকদের ভূমিকা যেভাবে অনুধাবন করতে পেরেছেন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জেনারেলরা তা পারেননি, ফলে সবকিছুকেই তারা লন্ডভন্ড করে ফেলেছেন। সে কারণেই শত বিচ্যুতি সত্বেও ভারত আজকের দিন পর্যন্ত সুয়েজের পূর্বপ্রান্তে গণতন্ত্রের এক সুরক্ষিত দূর্গ।

প্রাক'৪৭ থেকেই রাজনীতিকদের অবর্ণনীয় ত্যাগ স্বীকারের ফলশ্রুতিতেই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এইচ, এম, এরশাদ ছিলেন একজন লেফটেনন্ট কর্ণেল। বাংলাদেশ সৃষ্টিতে তাঁর কোন অবদান নেই। এমন কি '৭১ সনের ভয়াল ও রক্তক্ষরা মুক্তিযুদ্ধের সময় অত্যন্ত চতুরতার সাথে তিনি সৈয়দপুর (রংপুর) থেকে তদানিন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে বদলীর ব্যবস্থা করেছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল ঝুঁকিপূর্ণ রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করা। কিন্তু বাংলাদেশের জন্মের পর, অবাঞ্ছিতভাবে ত্বরিত প্রমোশন পেয়ে তিনি লেফটেনান্ট জেনারেল পদে উন্নীত হন, পরে তাঁকে সেনাবাহিনী প্রধান নিয়োগ করা হয়। জনশ্রুতি আছে, '৭১ সালের ১৫ই এপ্রিল তিনি তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন, আবার ৩০শে এপ্রিল (৭১) করাচী ফিরে যান। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তা করেন নি। ঘটনার সত্যতা পারলে তিনি অস্বীকার করুন।

সেনাবাহিনীর চেইন অব কম্যান্ডের প্রধান থাকার সুযোগে এবং তাঁর হাতে ন্যস্ত অস্ত্র

www.pathagar.com

ক্ষমতার পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করে তিনি ১৯৮২ সনের ২৪শে মার্চ সাংবিধানিক সরকারকে পদদলিত করে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান, নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে উৎখাত করেন, সামরিক আইন জারী করে দেশ ও জাতির উপর চাপিয়ে দেন তাঁর স্বৈরশাসন।

জনাব চেয়ারম্যান,

করাচী ও রাওয়ালপিন্ডির শাসকদের সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা রয়েছে; সুতরাং এ সম্পর্কিত কোন উল্লেখ বা মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এখানে একটি তথ্যের অবতারণা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। '৮১ সনের নভেম্বরে তাঁর ষ্টাফের একজন কর্ণেলের মাধ্যমে সেনাভবনে আহুত সম্পাদকদের এক সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য আমাকে আহবান জানিয়েছিলেন। বিনম্রভাবে অথচ দৃঢ়তার সাথে সে আমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করি। কারণ দেখিয়ে বলেছিলাম যে, একজন সরকারী চাকুরে হিসেবে দেশের প্রেসিডেন্টের অনুমতি ব্যতিরেকে শান্তিকালীন সময়ে (Peace time) পত্রিকার সম্পাদকদের সম্মেলন ডাকার সাংবিধানিক অধিকার তাঁর নেই। সার্ভিস কোডকে নিদারুণভাবে লংঘন করে তিনি '৮১ সনের শরৎকালে (২০-১১-৮১ এবং ২৭-১১-৮২) ভারতীয় সাংবাদিক ও দেশীয় পত্রিকার সম্পাদকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করেন। একাধিকবার অনুরোধ সত্বেও আমি এতে যোগ দেইনি।

১৯৮১ সনের ১৬ই নভেম্বর বিচারপতি আবদুস সাত্তার দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই লেঃ জেঃ এরশাদের আচরণ দেশপ্রেমিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও তথ্যভিজ্ঞ মহলের কাছে সন্দেহের বিষয় ছিল। নির্বাচিত সরকার উৎখাত ও সংবিধানকে পদদলিত করার জন্য যেন তিনি প্রয়াসী না হন সেজন্য পরোক্ষভাবে তাঁকে সতর্ক করে দেয়া আমার কর্তব্য বলেই মনে করেছি। সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছি, এই প্রয়াসে হয়ত তাঁর সাময়িক ব্যক্তিগত সুবিধা হবে কিন্তু সমগ্র জাতির ভাগ্যে নেমে আসবে বিপর্যয়; পরিণতিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংবিধানিক কাঠামো হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত। সেটাই আজ ঘটেছে।

সংবিধান বহির্ভূত পন্থায় ক্ষমতা দখলের পর থেকেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আমার বিরুদ্ধে তাঁর আক্রোশ চরিতার্থ করার আয়োজন শুরু করেন। স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্টের অধীনে আমাকে গ্রেপ্তার করে মাননীয় সেশনস জজের স্পেশাল টাইবুনালের সামনে বিচারের জনা নেয়া হয় কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য স্পেশাল ট্রাইবুনাল মুক্তি দেন। তারপর আমাকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ে (সাবেক পার্লামেন্ট হাউজ, তেজগাঁ, ঢাকা) লেঃ কর্নেল ফকির সালাহউদ্দিনের সমীপে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। আমার পরবর্তী পরীক্ষা ছিল স্বরাষ্ট্র সচিব এম, কে, আনোয়ারের সামনে উপস্থিত হয়ে আমার আচরণ ব্যাখ্যা করা। লক্ষ্য করুন, কি ধরনের হয়রানির শিকারে আমাকে পরিণত করা হয়েছে। আমি খোদাভীরু, কিসের পরোয়া আমার?

'৮২ সনের সেপ্টেম্বরে আমার সাপ্তাহিক 'ইত্তেহাদের' প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়, '৮৩ সনের নভেম্বরে গ্রেপ্তার করে আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং আমার ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করে, গণ আন্দোলনের চাপের মুখে স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট আমাদের মুক্তির আদেশ দিতে এবং আনীত মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন

রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে সংলাপ শুরু হয়। ক্ষমতাসীন জেনারেলদের সাথে প্রাক-

www.pathagar.com

সংলাপ আলোচনার এক পর্যায়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে আমাকে বলতে হয়েছিল, "যেহেতু ক্ষমতা লিপ্সায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে আপনারা সবকিছু বিপর্য্যস্ত করে ফেলেছেন সেহেতু আপনাদেরকেই সাংবিধানিক নীতিমালার মধ্যে ফিরে আসতে হবে অন্যথায় দেশের সংবিধানকে নিদারুণভাবে লঙ্ঘন করার অভিযোগে আপনাদেরকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। প্রশাসনের সাথে জনসাধারণের সহজাত আবেগমথিত সম্পৃক্ততা কেবলমাত্র '৭২'র সংবিধানের পুনরুজ্জীবন ও নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা প্রত্যর্পনের মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব অন্যথায় দেশের ভাগ্যে থাকবে নৈরাজ্য ও উচ্ছৃংখলতা যা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কেনো দেশপ্রেমিকের কাছে কাম্য হতে পারে না।"

উপরোক্ত ঘটনাবলীই সরকার পক্ষের বিভিন্ন দলিলপত্রে বর্ণিত মিথ্যা বানোয়াট, আক্রোশজনিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অমর্যাদাকর অভিযোগ নামক কাহিনীর ভিত্তিতে আমাকে গ্রেপ্তার করা ও বিচার অনুষ্ঠানের পটভূমি। আত্ম-প্রবঞ্চনায় বিমোহিত একজন প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করা যায় না। কামনা করি, আল্লাহ তাঁর সহায় হোন ও আলোর পথ দেখান। যে ভদ্রলোক লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দেশরক্ষা বাহিনীকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবমাননা করেছে তাঁকে কে বোঝাবে? কোয়েটার অফিসার্স ট্রেনিং স্কুলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তিনি, লেঃ কর্ণেল র‍্যাংকের উর্ধ্বে উন্নীত হওয়ার কোন যোগ্যতা তাঁর ছিল না। কিন্তু নির্মম পরিহাস। তিনি আজ লেফটেন্যান্ট জেনারেল।

মাননীয় চেয়ারম্যান,

আপনার সামনে উপস্থিত করানোর পটভূমি যাতে আপনি অনুধাবন করতে পারেন সে জন্য আমি আরও কিছু বলতে চাই। '৮২ সনের জুনে ঢাকা টেলিভিশনের সাথে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দেয়া সাক্ষাতকারের কতিপয় বিবৃতি সম্পর্কে আমি আমার পত্রিকায় প্রশ্ন তুলেছিলাম, আমি তাঁর গুলশানের বাড়ী নির্মাণ সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলছিলাম, সমস্ত রাজনৈতিক জীবন ধরে আমি বিভিন্ন সরকারের বিরুদ্ধে নীতি ও নীতিআশ্রয়ী রাজনীতির ভিত্তিতেই সংগ্রাম করেছি, কখনই ব্যক্তিগত কারণে কিংবা ব্যক্তি স্বার্থে বিরোধিতা করিনি। এটা আমার মর্যাদাবোধ, সততা ও সম্মানের পরিপন্থী।

নীতিগত প্রশ্নে আমার দৃঢ় ভূমিকা আমার সহোদরদের জন্যও ডেকে এনেছে ভোগান্তি। ভারতের সেবাদাস শেখ মুজিবর রহমান সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি আমার অনুজকে (উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত, সাবেক সি,এস,পি) জুলুমের শিকারে পরিণত করার পদক্ষেপ নিয়েছেন। এমনকি সংস্থাপন বিভাগ ও জেনারেল এরশাদ নিয়োগকৃত ক্যাবিনেট সাব-কমিটির তাঁর প্রাপ্যপদে নিয়োগের সুপারিশ সত্ত্বেও। সত্য ঘটনা উপস্থাপনের স্বার্থে আমাকে বলতেই হয়, যদিও ১৯৭৬ সনে তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ, এস, এম, সায়েম আমার কথিত অনুজকে এডিশনাল সেক্রেটারী পদে নিয়োগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে স্বাক্ষর করে দিয়েছিলেন, তবুও জেনারেল জিয়াউর রহমান তাঁর প্রবর্তিত মার্শাল ডেমোক্রেসির প্রতি আমার নীতিগত বিরোধিতার কারণে তাঁর নিয়োগ গেজেট না করার সিদ্ধান্ত নেন, এমনকি ১৯৮০ সনে ২৯-৩০ মে রাত্রে নিহত হওয়া পর্যন্ত এ নিয়োগ গেজেট করা হয়নি। বিনা অপরাধে অযোগ্য চক্রান্তকারী শাসক ও প্রশাসকদের হাতে নির্যাতন ভোগের কি নির্মম পরিহাস।

দিল্লী সরকারের কাছে বাংলাদেশকে বিকিয়ে দেয়ার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আমার কঠোর

www.pathagar.com

ও আপোষহীন ভূমিকার জন্য আমার উপর নির্যাতনের ষ্টিমরোলার চাপিয়ে দেয়া ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের আক্রোশ আমার নিম্নোক্ত সহোদরদের উপর নিপতিত হয়;

ক) জৈষ্ঠ ভ্রাতা একে এম এ সাত্তার, সাবেক পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারী। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অপট করেন।

খ) দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আজিজুর রহমান, সাবেক পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অপট করেন।

গ) অগ্রজ মরহুম ডঃ আবদুল করিম ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অব ফ্যাকাল্টি অব এগ্রিকালচার একজন পোস্ট ডক্টরেট নাফিল্ড স্কলার।

ঘ) অনুজ আমিরুজ্জামান সাবেক সি এস পি তিনিও বাংলাদেশের পক্ষে অপট করেন।

ক্ষমতাসীন ব্যক্তির প্রতি সহোদরদের মধ্যে কেউ নীতিগত কারণে বিরোধী, সেজন্য সরকারী চাকুরী জীবনে এমন নিষ্ঠুর নির্যাতনের ঘটনা টোটালিটারিয়ান, কমিউনিষ্ট, নাজী বা ফ্যাসিষ্ট সমাজ ছাড়া অন্য যে কোন সমাজে অকল্পনীয়। অথচ প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের ভগ্নিপতি সৈয়দ হোসেন সাবেক পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের একজন সেকশন অফিসার থেকে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সরকারের এডিশনাল সেক্রেটারী পদে উন্নীত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর 'বোন জামাইর' জন্য কি ত্বরিত প্রমোশন।

উল্লেখ্য, '৪৮ সাল থেকে প্রায় সব ক'টি সরকার আমাকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে কিন্তু কখনই আমি বিবেক বিক্রি করিনি; সে কারণেই আমাকে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হতে হয়েছে বহিস্কৃত, বার বার হতে হয়েছে কারারুদ্ধ। আবারও বলছি, আমি খোদাভীরু, সর্বশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে মাথা নত করিনা। আমার পরিবারের বা শিক্ষায়তনের কিংবা রাজনৈতিক ইনষ্টিটিউশনের কেউ তরুণ বয়সে আমাকে কারও কাছে মাথা নত করার শিক্ষা দেননি, যদিও বা তিনি দৈহিক বা আর্থিক শক্তির একচ্ছত্র অধিপতি হন। আকর্ষণীয় বা অভিশপ্ত কোন প্রকার প্রলোভনের কাছেই আত্মসমর্পন করতে আমি শিখি নি।

আমার বিবেক আর আজীবন রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের কাছে বিশ্বস্ত থেকে আমি বলতে চাই যে, তাত্ত্বিক কিংবা আদর্শগত কোন দৃষ্টিকোন থেকেই সামরিক আইন প্রশাসন আমার কাছে গ্রহনীয় নয়, যিনিই এটা জারী করুন না কেন-হোন তিনি জেনারেল আইয়ুব, অথবা জেনারেল ইয়াহিয়া অথবা লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান অথবা মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুর কিংবা লেঃ জেঃ এইচ এম, এরশাদ। বিচারাসনে উপবিষ্ট হওয়ার মাননীয় আদালতের ক্ষমতার উৎস হচ্ছে ১৯৮২ সনের ২৪শে মার্চের মার্শাল 'ল প্রক্লাম্যাশন। যেহেতু সামরিক আইন একটি বাস্তবতা, সেহেতু আমাকে মাননীয় আদালতকে মানতে হয়।

আধুনিক ইতিহাস রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে জেনারেলদের অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছে। তাঁদের শাসন তাঁদের স্ব স্ব দেশ ও জনগণের জন্যে বয়ে এনেছে বিপর্যয়, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, নবাব সিরাজুদ্দৌলার সেনাপতি মীরজাফর আলী খান বাংলাকে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করার জন্য দায়ী এই শৃংখলের পথ ধরেই ভারত ১৯০ বছর ধরে পরাধীনতার শৃংখলে শৃংখলিত হয়। নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ফ্রান্সের বিপর্যয় ডেকে আনে। জার্মানীর হিটলার সভ্যতাকে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করে। গণতান্ত্রিক সিষ্টেমেও জেনারেলদের শাসন আকর্ষণীয় কিছু নয়।

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল আইসেনহাওয়ার (আইখ) সোভিয়েত রাশিয়ার আকাশে ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান পাঠিয়ে '৬০ সনে প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্র প্রধানদের শান্তি সম্মেলন বিপর্যস্ত করে ফেলেন, জাপানের জেনারেল তোজো তাঁর দেশকে উপহার দিয়েছেন পরাজয় আর বিপর্যয়। সাম্প্রতিক কালের সমরনায়কদের শাসনের ইতিহাস চরম ব্যর্থতার আলেখ্য। জেনারেল আইয়ুব, আর্জেন্টিনার জেনারেল গলতিয়ারী, বার্মার জেনারেল নে উইনের শাসন এই নির্মম বাস্তবতারই প্রমাণ বহন করে। আধুনিক মানব-সম্পর্কের (human relationship) জটিল আবর্তে মানবসম্পর্কীয় বিষয়াবলী পরিচালনার গুণ বা বৈশিষ্ট্য একজন সমর বিশারদের নেই। এর জন্যে প্রয়োজন মানব-সম্পর্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও ধ্যানধারণায় সমৃদ্ধ রাষ্ট্রনায়ক (statesman) অথবা দার্শনিক রাজা (philosopher king)। দমন করার ধারণা ও প্রশিক্ষণ কখনই বৈদগ্ধ্য ও সেবার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে ক্ষমতা দখলকারী জেনারেলরা অনিবার্যভাবেই রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ হবেন; সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার সরব বর্ণনা ভূরি ভূরি।

আমার শিক্ষা, জ্ঞান ও বিশ্বাসের নির্দেশ হচ্ছে যে, কেবলমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরই জনপ্রতিনিধি রচিত সংবিধান মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার রয়েছে এবং সংবিধান প্রসূত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ যদি সংবিধানের অংশ বিশেষও লঙ্ঘন করে তবে তাকে আইনানুগ বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

সামরিক আইন প্রশাসনকে মেনে নেয়ার অর্থ হবে উপরোক্ত বিশ্বাসের সরাসরি পরিপন্থি। উপরোক্ত অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে; জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট, ৭ দলীয় জোট, ১৫ দলীয় জোট এ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞ আইনজীবিবৃন্দ ও '৭২'র সংবিধান মোতাবেক বিচার বিভাগের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামে লিপ্ত।

রাষ্ট্র পরিচালনায় সাংবিধানিক আইন পুনঃপ্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামের আমি একজন কর্মী মাত্র। আমি নিজেকে বিপুলভাবে পুরস্কৃত বোধ করব যদি আমার ক্ষুদ্র ও বিনীত প্রচেষ্টা দেশে সাংবিধানিক আইন পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সামান্যতম অবদানও রেখে থাকে।

আমি আবারও জোর দিয়ে বলছি আমি নির্দোষ এবং আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সাথে কোনভাবেই জড়িত নই।

[সামরিক আদালতে ইংরেজীতে প্রদত্ত জবানবন্দীটির বাংলা অনুবাদ]

www.pathagar.com

চির বিদ্রোহী অলি আহাদের মুখোমুখি

আমাদের রাজনৈতিক গগনের প্রবীণ নক্ষত্র, এই মুহূর্তে জাতির অভিভাবক হিসেবে, বিবেক হিসেবে সবাই যাকে মনে করছি, জাতীয় নেতা অলি আহাদ সত্যিকার অর্থে এখন আর কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। অলি আহাদ একটি বিশেষণ। একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের চিরকালের আপোষহীন বিদ্রোহের একটি বিশেষ ধারা। এজন্য নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের একজন হয়েও তিনি সার্বজনীন। তাঁর নাম উচ্চারণ মাত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে এমন একটি প্রতিকৃতি যিনি আজীবন ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন জাতীয় স্বার্থকে। কে কি ভাববে, কে কি বলবে, এ নিয়ে অলি আহাদের তেমন একটা মাথাব্যাথা কোন কালেই ছিলো বলে মনে হয় না। যা তিনি বোঝেন, যা তার বক্তব্য, তা তিনি অকপটে, সরবে, সহজ সরলভাবে উচ্চারণ করেছেন অকম্পিত কণ্ঠে। আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা অনেকটা নায়কের মতো। তিনি '৬৯ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য মুক্তিবাহিনী গঠনের চিন্তা করেছিলেন। '৭১ -এ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন আগরতলায়। কাগমারী সম্মেলন থেকে অলি আহাদকে বাদ দিলে লাবণ্য হারিয়ে যায়। আওয়ামী লীগের জনকদেরও একজন তিনি। জন্ম ১৯২৮ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। '৪৮-এ প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ। আওয়ামী লীগের প্রথম সাংগঠনিক সম্পাদক, ন্যাপের প্রথম যুগ্মসম্পাদক, এরপর জাতীয় লীগের সাধারণ সম্পাদক, ডিএল-এর সহসভাপতি। তাঁর সর্বশেষ রাজনৈতিক অবস্থান ডিএল-এর সভাপতি পদে। দেশের বর্তমান ক্রান্তিকালে এই টালমাটাল রাজনৈতিক সংকটে তিনি আমাদের সেই আগের মতোই অনুপ্রাণিত করছেন। দিচ্ছেন নির্দেশনা। বয়সের ভারে হয়তো তিনি কিছুটা ক্লান্ত। কিন্তু অন্তরে আজও রয়ে গেছে সেই অনির্বাণ তারুণ্য। অলি আহাদ ইতিহাস। অলি আহাদ ইতিহাসের সাক্ষী। সেই সাক্ষীর সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের অতীত ও বর্তমান। যার উপর দাঁড়াবে ভবিষ্যৎ। আজকের ও আগামীকালের জানা, অজানা, অনাগত পাঠকের স্বার্থে দেশপ্রেমিক মানুষদের স্বার্থে যারা সতত সন্ধান করে ফেরেন শিকড়, তাদের স্বার্থে তাঁর সকল প্রিয়-অপ্রিয় উচ্চারণ ধারণ করার জন্য দৈনিক ইনকিলাব থেকে তাঁর বাস ভবনে গিয়েছিলাম গত ১৬ ফেব্রুয়ারী'১৯৯৮। এই সাক্ষাতকারটির ঐতিহাসিক মর্যাদা বিবেচনা করে আমরা প্রায় হুবহু পত্রস্থ করলাম। সাক্ষাতকার গ্রহণ ও গ্রন্থনা করেছেন ভাষা সৈনিক, ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র আধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক সৈনিকের সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল গফুর ও বিটিভির 'কথামালা'র উপস্থাপক কবি আবদুল হাই শিকদার। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ফাহিম ফিরোজ, লুৎফুল খবীর, সৈয়দ মুজাম্মেল হোসেন, ওবায়দুল হক

www.pathagar.com

মাশকুর, মুন্সী আবদুল মজিদ, সাইফুদ্দীন মনি ও অধ্যাপক মোমেনুল হক।

আবদুল গফুর ঃ জনাব অলি আহাদ যে শুধু ভাষা আন্দোলনের সৈনিক বা সেনাপতি ছিলেন, তা নয়, তার একটা রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসও উজ্জ্বল অতীত রয়েছে। আমার মনে হয় যে, আমরা প্রথমে তার উজ্জ্বল অতীত সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি। আপনি রাজনীতিতে আসলেন কিভাবে? এবং কি লক্ষ্যে?

অলি আহাদঃ আমার যখন কিশোর বয়স, বা কিশোর বয়সের চেয়েও বেশী বা কম। সেই বয়সে বাসায় আব্বা কয়েকটি পত্রিকা রাখতেন। এর মধ্যে সওগাত, মোহাম্মদী, আজাদ, স্টার অব ইন্ডিয়া। ঐ সব পত্রিকায় মাঝে মাঝে মোহামেডান স্পোর্টিং এর খবর পড়তাম। এবং তার খেলা যেদিনই দেখেছি সেদিনই মনটা উৎফুল্ল থাকত যে জিতেছে। এবং জেতার পর তারা কাপ নিয়ে গেল এবং কয়েক বছর ধরে একাধারে মোহামেডানের জয় হতে লাগল। এটা আমার মনের মধ্যে আস্তে আস্তে রেখাপাত করতে লাগল। আবার আব্বাস উদ্দিন সাহেব গায়ক। উনি কবি নজরুল ইসলামের গান বিভিন্ন সময়ে রেকর্ড করেন। ঐ সময় গ্রামোফোন চলত, গ্রামোফোনে তাঁর গান শুনতাম। নৌকা যাচ্ছে কলের গান বাজছে। তখনকার দিনে গ্রামোফোনকে বলতো কলের গান তা আমরা শুনতাম যে নৌকা যাইতেছে, গান হইতেছে। উদ্বুদ্ধ হইতাম যে আমরা মুসলমান, মুসলমানদের কথা সেখানে আসতেছে, ইসলামের কথা আসতেছে। নামাজ রোজার কথা আসতেছে, ঈদের কথা, রমজানের কথা আসতেছে। এর ফলে আমার মনের একটা পরিবর্তন হতে লাগল। পাশাপাশি আমি যখন স্কুলে পড়ি, আমার সাথে যে ছাত্রটি ছিল, কোন সময় সে ফার্স্ট হত কোন সময়ে আমি। কিন্তু যে বছর আমি সেকেন্ড হয়েছি সে বছর আমি দেখেছি যে আমার নম্বরটা কোথায় যেন গোলমাল হয়েছে। এটা আমার কিশোর মনের বিশ্বাস এর আমি কোন প্রমাণ দিতে পারব না। কিন্তু প্রমাণ না দিতে পারলেও বোঝার মত সেই শক্তিটুকু ছিল যে, এখানে হয়তো অংকে আমার এই নম্বরটুকু পাওয়া উচিত ছিল। বাংলায় হয়তো এ নম্বর পাওয়া উচিত ছিল, সেটা পাই নাই। সেকেন্ড হয়েছি। আবার কোন কোন বছর ফার্স্ট হয়েছি। এগুলো আমার মনে কাজ করত যে আমার শিক্ষকবৃন্দ যখন এইরকম, তার মধ্যে সামাজিক অবস্থা যে, আজান দিতে গেলে পাশে হিন্দু বাড়ী থাকলে, উলু ধ্বনি হলে পরে, আবার মোরগ রাখলে মোরগ তাদের বাড়ী গেলে, সেখানে মোরগটাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করত। কারণ, তাদের নাকি এতে শূচি থাকত না। এসব কারণে আমার মনের মধ্যে আস্তে আস্তে গভীর রেখাপাত করতে লাগল যে, মুসলমানদের এখন বোধ হয় আলাদাভাবে চলতে হবে। এছাড়া অন্য কোন পথ নাই। আবার গ্রামে যেহেতু থাকতাম। কোন কোন সময় গ্রামে দেখতাম যে, মহাজন, তারা আইসা বাড়ীর মধ্যে জমিজমা কেড়ে নিয়া গেছে। জমি বন্ধক রেখে তারা টাকা এনেছিল এবং সেই টাকা ফেরত পাবার জন্য তারা নানারকম অত্যাচার করত। জমিদারদের অত্যাচারের কোন সীমা ছিল না। কারণ, বাঙালী মুসলমানরা জমিদার ছিল না, জমিদার ছিল হিন্দুরা। এগুলো সামগ্রিকভাবে আমার ছোট্ট মনের মধ্যে কাজ করেছে এবং তার ফলে আমি আস্তে আস্তে চিন্তা করতে লাগলাম যে, আমরা কিভাবে আমাদের দাবী দাওয়াগুলো প্রতিষ্ঠা করতে পারি। কিভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ হবে মুসলমান জাতি হিসাবে। আমার আব্বা চাকরি করতেন। ওনার মতো আরো যারা চাকরি করতেন তাদের মধ্যে বোঝা যেত কোথায় যেন কি একটা গণ্ডগোল। তারও মূলে দেখা গেছে যেহেতু সে মুসলমান সেহেতু তার প্রমোশন

www.pathagar.com

হবে না। যেহেতু সে মুসলমান সেহেতু তার ট্রান্সফার ভাল জায়গায় হবে না। এই কথাগুলো আমাদের মনের মধ্যে কাজ করত। মিডল ক্লাস। লোয়ার মিডল ক্লাস তাদের মধ্যেই পিয়ন থেকে আরম্ভ করে বড় সাহেব পর্যন্ত। এমনই সময় মুসলিম লীগের ডাক আসল। আমার মনে হয় ১৯৪০-৪২, হ্যাঁ এরকমই বিয়াল্লিশেই শ্যামা- হক মন্ত্রিসভা-গঠিত হল। তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি, আমি কুমিল্লা জেলা স্কুলের ছাত্র। তখন শফিউল ইসলাম নামের একজন ছাত্র ছিলেন, তিনি ইন্টারমিডিয়েটে পড়তেন। তিনি আসতেন, উনার মুখে শুনতাম অনেক কথা। শোনার মধ্যে উনি মাঝে মাঝে আমাকে বলতেন-শোন অলি আহাদ, আজকে নাজিমুদ্দিন সাহেবের মন্ত্রিত্ব হবে। আজকে শ্যামা-হক মিনিস্ট্রি ফল করবে। আজকে শ্যামা-হক মিনিষ্ট্রি অমুক জায়গায় গিয়েছিল। অপমানিত হয়ে এসেছে এবং বিশেষ করে শেরে বাংলার মতো লোক যখন ফেনী গেলেন। তার সাথে গিয়েছিল হাসানুজ্জামান। লাকসামের রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন, এমএলএ ছিলেন। তো তার কান কেটে দিল এবং কান কেটে দেয়ার পর ফজলুল হক সাহেব আর সেখানে নামতে পারেন নি। অর্থাৎ তিনি তার ইচ্ছামত তার বিশাল যে দেহ, বিশাল যে পপুলারিটি, বিশাল যে নেতৃত্ব- সব কিছু কয়েকটি ছাত্রের কাছে হার মেনে গেল। এতে আমাদের মন আরো উদ্বুদ্ধ হতে লাগল। তখন আমরা ধীরে ধীরে মুসলিম লীগ করার দিকে অর্থাৎ ছাত্রলীগ, মুসলিম ছাত্রলীগ করা আরম্ভ করলাম। মুসলিম ছাত্র লীগ করতে গিয়ে দেখা গেল, ইন দি মিন টাইম নাজিম উদ্দিন সরকার গঠন করেছেন। মুসলমানদের এখন দাবী দাওয়া প্রতিষ্ঠিত হবে। এটা আমাদের খুব উদ্বুদ্ধ করল এবং উদ্বুদ্ধ হয়েছি এতে কোন সন্দেহ নেই। ইতমধ্যে খান সাহেব মফিজউদ্দিন আহমেদ সাহেব, তিনি তখন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নাজিমউদ্দিন সাহেবের মন্ত্রিসভায়। তিনি আসবেন কুমিল্লা সফরে। দাউদকান্দি যাবেন, বরকান্দা যাবেন, চান্দিনা যাবেন। আমরাও তাকে রিসিভ করার জন্য যে মুসলিম মন্ত্রীসভা হয়েছে, অর্থাৎ অত্যাচার থেকে বাঁচা গেছে এবং তার মন্ত্রীত্বের একজন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী (পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী বুঝতামই কি, বুঝতাম মন্ত্রীদের সাথে আছেন)। তিনি আসলে আমরা তাঁকে রিসিভ করলাম 'আল্লাহু আকবর', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' প্রভৃতি ধ্বনি দিয়ে। এটাই আস্তে আস্তে আমার মধ্যে, কাজ করতে লাগল। এই কারণেই আমি রাজনীতিতে ঢুকে পড়লাম এবং সেই ঢুকে পড়ার মূল কারণ ছিল মুসলমানদের দাবী দাওয়া প্রতিষ্ঠা করা।

আবদুল হাই শিকদারঃ অর্থাৎ সেই সময়কার সামাজিক পরিস্থিতি আপনাকে কিছুটা অনুপ্রাণিত করেছিল রাজনীতিতে অংশ নেয়ার জন্য।

অলি আহাদঃ অবশ্যই এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।

আবদুল হাই শিকদারঃ তো আপনার জন্ম তো ১৯২৮ সালে?

অলি আহাদঃ ১৯২৮ সালে।

আবদুল হাই শিকদারঃ এটা আপনার কুমিল্লা?

অলি আহাদঃ এটা কুমিল্লা ১৯২৮ সাল।

আবদুল হাই শিকদারঃ না, আপনার হোমনা থানা।

অলি আহাদঃ ১৯৩৯ সালে আব্বা ট্রান্সফার হয়ে দাউদকান্দিতে আসেন এবং সেখানে আমরা ছিলাম দাউদকান্দি স্কুল থেকেই আমি ১৯৪২ সালে কুমিল্লা জেলা স্কুলে চলে গেলাম। তখন ক্লাস নাইনে পড়ি।

www.pathagar.com

তখন ২য় মহাযুদ্ধ চলছে। ২য় মহাযুদ্ধের কারণে ফেনীতে বোম্বিং হয়। ফেনীর উপরে জাপানী বোমাবর্ষণ হওয়ার পরে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, আমাদের স্কুলকে সরিয়ে নেবে। আমি সেখানে থেকে সরে গিয়ে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অন্নদা হাই স্কুলে ভর্তি হলাম। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অন্নদা হাই স্কুলেও আবার সেই গণ্ডগোল দেখা দিল। থাকা খাওয়া নানা কষ্ট। সেখানে থেকে আবার ফিরে আসলাম দাউদকান্দি হাই স্কুলে এবং দাউদকান্দি হাই স্কুল থেকেই আমি মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিলাম ১৯৪৪ সালে।

আবদুল হাই শিকদারঃ তারপর আপনি ঢাকা চলে এলেন?

অলি আহাদঃ তারপর ওখান থেকে আমি ঢাকায় চলে এসে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হই, বিজ্ঞান বিভাগে।

আবদুল হাই শিকদারঃ ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ মানে এখন যেটি ঢাকা কলেজ ?

অলি আহাদঃ হ্যাঁ, এখন যেটি ঢাকা কলেজ। তখন ফুলবাড়ীয়া স্টেশনের দক্ষিণদিকে ছিল এটা। ঢাকা কলেজ আগে ছিল হাইকোর্টে। এই হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্টের পুরানো বিল্ডিং যেটা, সেই বিল্ডিংএ ঢাকা কলেজ ছিল। ঢাকা কলেজ যুদ্ধের কারণে সেখান থেকে সরিয়ে ফুলবাড়ীয়া স্টেশনের দক্ষিণ দিকে দু'টি বাড়ী ভাড়া নেয়া হয়। ঐ দু'টি বাড়ীতে আমাদের ক্লাস হত।

আবদুল হাই শিকদারঃ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আপনি পাস করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে এলেন?

অলি আহাদঃ ইন্টারমিডিয়েট কলেজে থাকার সময়েই আমি মুসলিম ছাত্রলীগের সাথে জড়িত ছিলাম। বিশেষ করে ১৫০ নং মোগলটুলিতে মুসলিম লীগের ওয়াকার্স ক্যাম্প ছিল এবং মুসলিম লীগ ওয়ার্কাস ক্যাম্পের নেতা ছিলেন জনাব শামছুল হক সাহেব।

আবদুল হাই শিকদারঃ শামসুল হক মানে আমাদের টাঙ্গাইলের শামছুল হক ?

অলি আহাদঃ টাঙ্গাইলের শামছুল হক যিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের ফাউন্ডার জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। ওখানে আবুল হাশিম সাহেব, তদানীন্তন মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী, তিনি আসতেন এবং আমরা তাকে বিপ্লবী চিন্তাবিদ বলেই মনে করতাম। তার সময়ে প্রথম কথা আসে যে, খোলাফায়ে রাশেদিনের সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এর আগে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হউক একথা হয়েছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক এ কথা হয়েছে কিন্তু তার রূপরেখা কি? অর্থনীতির কি রূপ? সমাজের কি রূপ? তারপর রাষ্ট্রীয় কি রূপ? এ সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা দেয়া হত না। আমরা জানতামও না। তিনি আসার পরে এ বিপ্লবী চিন্তা আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। আমরাও তার অনুসারী হয়ে গেলাম। এখানেই ঢাকা কলেজে তিনি আমাকে ছাত্রলীগ করতে বললেন এবং আমি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের মুসলিম ছাত্র লীগের প্রেসিডেন্ট হই। ১৯৪৫ সালেও আমি প্রেসিডেন্ট ছিলাম। তো, আমার পরে, জিল্লুর রহমান সাহেব আসেন। এই জিল্লুর রহমান, যিনি আজকে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী তিনি আসার পর তাকে আমি আমার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাই কলিকাতা। তখন নির্বাচনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ১৯৪৫ সালে।

আবদুল হাই শিকদারঃ অতঃপর ?

অলি আহাদঃ ১৯৪৫-এ ঘোষণা দেয়। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে নির্বাচন হয়। সেই

www.pathagar.com

নির্বাচনে আমি, আমার বড় ভাই, উনি তখন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্র ছিলেন, আমরা ৬ ভাই। সবচে বড় ভাই যিনি, তিনি আমার রাজনীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। মাঝারো ভাই যিনি তিনিও রাজনীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র আব্বা ...আম্মা, এখন আর কি করব ..... ছেলে যখন করে, কি করব। কিছুতো আর বলা যায় না .... এ পর্যন্তই। আব্বা চান যে আমি ভাল ছাত্র হিসেবে বেরিয়ে আসি। তো এটা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। যে কোন কারণেই তারপরে আমার করিম ভাই-এর কাছে, যিনি নাকি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন, সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র, উনার কাছে গেলাম যে আমি পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্য নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানের একটা ঘোষণা এসেছে। সে ঘোষণায় আমি মনে করি আমি এ বছর পরীক্ষা দেব না আগামী বছর আমি পরীক্ষা দেব। তো করিম ভাই বলল যে, এখন আব্বাকে কি দিয়ে বুঝ দেই? বড় ভাইকে মাঝারো ভাইকে কি দিয়ে বুঝ দেই? আব্বা মানলেও তো, ওরা মানবে না। আমি বলি, সেটা আপনি পারবেন কিনা। কিন্তু আমি পরীক্ষা দিতে চাই না। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি পরবর্তীকালে আমার রেজাল্ট দিয়ে খুশি করব। পরে করিম ভাই বললেন- ঠিক আছে তুই যা, দেখি আমি কি করতে পারি। তো পরে আমি কথা অনুযায়ী কলিকাতা চলে গেলাম। কলিকাতা গিয়া ওখানে নূরুদ্দিন ভাইয়ের সাথে মুজিব ভাইয়ের সাথে আমার দেখা হল।

আবদুল হাই শিকদার ঃ মুজিব ভাই মানে ..... শেখ মুজিবুর রহমান ?

অলি আহাদ ঃ হ্যাঁ, শেখ মুজিবুর রহমান। তখন নেতা ছিলেন নূরুদ্দিন ভাই। নূরুদ্দিন ভাই ছিলেন অল বেঙ্গল মুসলিম লীগের একটিং জেনারেল সেক্রেটারী। আমরা তার সাথে দেখা করলাম। কথাবার্তার পর আমাকে বললেন এক কাজ কর। আমরা ওয়ার্কার্স ক্যাম্প প্রতি জেলায় জেলায় করতেছি, তোমাকেও আমরা সেখানে নিয়ে যেতে চাই। চারজন করে ওয়াকার্স ক্যাম্পে নেতা থাকবে, প্রত্যেক জেলায়। ত্রিপুরা জেলায় তোমার বাড়ী।

আবদুল হাই শিকদার ঃ তখন কুমিল্লার নাম তো আসলে ত্রিপুরা জেলা ছিল।

অলি আহাদঃ তখন ত্রিপুরা জেলা ছিল। কুমিল্লা জেলা না। আর ওটাই বৃহত্তর জেলা ছিল। কুমিল্লাতে আমাদের হেড অফিস। ডিস্ট্রিক্ট অফিস। সেই অনুপাতে আমাকে বলল যে, তুমি, খন্দকার মোশতাক আহমদ, সিরাজুল ইসলাম চাঁদপুরের আর রফিকুল হোসেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার।

আবদুল হাই শিকদার ঃ খন্দকার মোশতাক, যিনি আমাদের এক্স প্রেসিডেন্ট ?

অলি আহাদঃ আমাদের এক্স প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক। তোমরা চারজন, খন্দকার মোশতাক হবে ওয়ার্কার্স ইন চীফ, রাজি আছ? তো আমি বল্লাম হ্যাঁ আমি রাজি।

আমি তো পরীক্ষা দেব না এটা ডিসাইড করেই আসছি। প্রথম কাজ হল আমার পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত করা। তারপর পরীক্ষা দেয়া। এটা ১৯৪৫-এর কথা। ১৯৪৫ সালেই নির্বাচন ঘোষণা করা হল। '৪৫-এ লিয়াকত আলী খান আবেদন জানাইল যে, তোমরা সবাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য বেরিয়ে আসো, স্কুল ছাড়ো, কলেজ ছাড়ো। আমরাও সে আহবানে সাড়া দিয়ে কলেজ ছেড়ে দিয়ে ওনাদের কথা অনুযায়ী কুমিল্লাতে ওয়ার্কার্স ক্যাম্পে যোগ দিলাম। আমরা সেখানে সেই মফস্বলে নির্বাচন ১৯৪৬ সালের শেষ পর্যন্ত পরিচালিত করলাম। ঠিক আমরা পরিচালিত করিনি। যেহেতু কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ডাক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা, মুসলমানদের সেই স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবী ওঠার

www.pathagar.com

পরেই দেখা গেল সমগ্র বাংলাদেশে, তখনকার বেঙ্গল-অল বেঙ্গলে অসম্ভব রকম সাড়া পড়ে গেল। আমাদের বেশি খাটা-খাটনি করতে হয়নি। আমাদের যেতে হয়েছে। বলতে হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় ওয়াকার্স হিসেবে ওয়ার্কার্স আনতে হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় আমাদের ডাকে নির্বাচন হয়েছে। ডাক কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর। তিনি যা বলেছিলেন মানুষ তাই মেনে নিয়েছিল। কলাগাছকে ভোট দাও, কলাগাছকে ভোট দেয়ার জন্য মানুষ তৈরী হয়ে গিয়েছিল। যাকেই নমিনেশন দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন করা হয়নি। এই ভাবে আমরা সেই নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসি।

এভাবে আমি মুসলিম লীগের সাথে পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ি। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়ার মূল দৃষ্টিভঙ্গিটাই ছিল-আমরা চেয়েছিলাম যে, খোলাফায়ে রাশেদিনের সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু দুঃখের বিষয় যা অবশ্য পরবর্তীকালের কথা-খোলাফায়ে রাশেদিনের সমাজ প্রতিষ্ঠা করব এই স্বপ্ন নিয়ে পাকিস্তান যখন প্রতিষ্ঠিত করলাম তারপর দেখা গেল আর সেখানে খোলাফায়ে রাশেদিনের সমাজ ব্যবস্থা হয় না, হয় ঢাকা ক্লাবের সমাজ ব্যবস্থা। মদ খাওয়া, মাগীবাজি করা। ইসলামকে বাদ দিয়ে দেয়া, মুখে ইসলাম থাকা এগুলো এসে দাঁড়ায়ে গেল।

আবদুল হাই শিকদার ঃ এটা '৪৭ সালের কথা ? মানে পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল যে, অনৈসলামিক ব্যাপার, যেগুলোর বিরুদ্ধে আপনারা সংগ্রাম করেছেন সেগুলোই একেবারে হুবহু আরম্ভ হয়ে গেছে ?

অলি আহাদ ঃ হ্যাঁ হুবহু আরম্ভ হয়ে গেছে।

অধ্যাপক মোমেনুল হক ঃ পাকিস্তান আন্দোলনের জন্য যে কার্যকলাপ গুলো হয়েছিল জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, পাকিস্তান আন্দোলনে তার ভুমিকা কি ছিল?

অলি আহাদঃ জনাব শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান আন্দোলনে ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম নেতা।

অধ্যাপক মোমেনুল হকঃ শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব পাকিস্তান আন্দোলনে একমাত্র অগ্রসেনানী ছিলেন?

অলি আহাদ ঃ একমাত্র সেনানী নন। সেনাপতি ছিলেন নুরুদ্দিন সাহেব।

আবদুল হাই শিকদার ঃ '৪৭ সালে তখন তো আপনি কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র?

অলি আহাদ ঃ '৪৭ সালে এসে আমি ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয়ের ছাত্র হই।

আবদুল হাই শিকদারঃ দুটি প্রেক্ষিত একটা হলো কলিকাতা কেন্দ্রিক আন্দোলন। অন্যটি ঢাকা কেন্দ্রিক আন্দোলন, আপনি দুটোর সাথেই সম্পৃক্ত ছিলেন?

অলি আহাদ ঃ দুটোর সাথেই সম্পৃক্ত ছিলাম।

আবদুল হাই শিকদারঃ এইখানে আমরা একটু জানতে চাই যেটা আমাদের অধ্যাপক মোমেনুল হক সাহেব বলেছেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের একটা বিরাট অবদান আছে আমাদের সেই সময়কার পাকিস্তান আন্দোলনে। তো তার ভূমিকাটা কি ছিল? একটু যদি ব্যাখ্যা করেন।

অলি আহাদঃ পাকিস্তান আন্দোলনে ছাত্রদের সংগঠিত করার জন্য কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় জেলায় ঘুরে ছাত্র আন্দোলনকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তার খুব অগ্রণী ভূমিকা ছিল। মুসলিম লীগের যে দু'টি গ্রুপ ছিল, সোহরাওয়ার্দী ও জনাব আবুল হাশিম সাহেব। আমরা দু'জনেরই সমর্থক ছিলাম। শেখ সাহেব আবুল হাশিম সাহেবের সমর্থক ছিলেন সত্য, কিন্তু

www.pathagar.com

তিনি বলতেন আরে দুরু রবুবিয়াত, এসব হবে টবে না, যদিও আমি এসব বুঝি না। ধারও ধারি না। আমি সোহরাওয়ার্দী সাব-জিন্দাবাদ। সোহরাওয়ার্দী সাহেবও রবুবিয়াতের ধারও ধারেন না। বুঝেন না। এই ছিলেন শেখ সাহেব। শেখ সাহেব পাকিস্তানের পক্ষে, মুসলমানের পক্ষে তখনকার দিনে একজন অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী ছিলেন। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। এমনকি বিহারে যখন মুসলমানদের কচুকাটা করা হয় তখন সোহরাওয়ার্দী সাহেব প্রাইম মিনিষ্টার। তখনকার দিনে বেঙ্গলের যে মুখ্যমন্ত্রী তাকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত। প্রাইম মিনিষ্টার থাকাকালে উনি বিহারেও যাতে কাজ করা যায় তার চেষ্টা করেছেন। আবার গণভোট '৪৭ সালে যখন হয়, সেই গণভোটেও তিনি সিলেটে কাজ করেছেন। শেখ সাহেবের অবদানের কোন শেষ নেই। উনি সেনাপতি ছিলেন না, কিন্তু অবদান ছিল অনেক।

অধ্যাপক মোমেনুল হক ঃ এ কথাটা বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। একটা মহল বলছে, শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। অখন্ড ভারতের পক্ষে ছিলেন। অলি আহাদঃ সর্বৈব মিথ্যা কথা। এ কথা যে জন্ম দিয়েছে, তাকে আমার শক্ত ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় তার বাপের ....। এবং তারা দিল্লির দালাল।

আবদুল হাই শিকদারঃ এবং তারা শেখ মুজিবকেও ভালবাসে না।

অলি আহাদঃ শেখ মুজিবকেও ভালবাসে না। তারা দালালী করার জন্য শেখ সাহেবকে ব্যবহার করার জন্য যেটা দরকার, সেটা করে।

আবদুল গফুরঃ কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যে দ্বি-জাতি তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন, যার ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলন হল এবং যার ভেতরে আপনি একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন, সেখানে শেখ সাহেবকেও দেখা যায়, এ ব্যাপারে সক্রিয় নেতৃত্ব দিয়েছেন ছাত্র সমাজের ভেতরে। তাহলে কি আমরা বলব যে, তিনিও দ্বি-জাতি তত্ত্ব বাস্তবায়নের জন্য কাজ করেছেন তখন ?

অলি আহাদঃ একশ' পারসেন্ট। একশ' ভাগ। তিনি হানড্রেড পারসেন্ট, বরং একটা সেকুলার স্ট্যান্ড আমাদের মনের মধ্যে ছিল। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে রয়টারের রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্যাম্বলে যখন প্রশ্ন করলেন Well Qaid-e-Azam! Would it be a theocratic state, if Pakistan is acheived or a secular state? Qaid-e-Azam replied, It would be a secular state.আমরা এটার পক্ষে ছিলাম। শেখ সাহেব এটার পক্ষে ছিলেন না। উনি সেকুলার স্টেটও বুঝতেন না, থিওক্রেটিক স্টেটও বুঝতেন না। এর চেয়ে নির্মম সত্য নেই। এখন কেউ যদি বানিয়ে বলেন, যে উনি বুঝতেন থিওক্রেটিক স্টেট, ওনারে দিয়ে মুজিব বাদ লেখিয়েছেন, যেটা জীবনেও উনি লেখেননি, এটা লিখতে জানেনও না, জানলে তো উনি লিখবেন। সুতরাং উনি থিওক্রেটিক স্টেট বলেন, আর ডেমোক্রেটিক স্টেট বলেন, সেক্যুলার স্টেট বলেন, পিপলস্ স্টেট বলেন উনি কিছুই বুঝতেন না। উনি একটা জিনিস বুঝতেন ক্ষমতা চাই এবং ক্ষমতা পেতে হলে একটা বাহন দরকার। সেই বাহন সোহরাওয়ার্দী সাহেব। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের পিছনে থাকলে ক্ষমতা পাওয়া যাবে। তিনি ফাইটিং এলিমেন্ট ছিলেন। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। ক্ষমতাকে লক্ষ্য করে ফাইটিং। আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ছিলেন না।

আবদুল হাই শিকদারঃ আচ্ছা, তাহলে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে, সেদিনকার পাকিস্তান মুভমেন্টে বাংলাদেশের মুসলমানদের যে একটা বিরাট অংশগ্রহণ ছিল

www.pathagar.com

এটার সামাজিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি? কেন সেই সময়ে বাংলাদেশের মুসলমানরা পাকিস্তানের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ? এবং তারাই পরবর্তীকালে দেখা গেল পাকিস্তান ভাঙ্গলো। মুক্তিযুদ্ধ করল?

অলি আহাদঃ প্রথম কারণ হল। বাঙালীরা, বঙ্গবাসী মুসলমানরা ধর্মভীরু ছিল। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়ার ফলে মুসলমানরা সর্বস্বান্ত হলো। মুসলমানরা জমিজমার উপরই নির্ভরশীল ছিল। জমিদার বলতেও তারাই ছিলেন, জায়গীরদার বলতেও তারাই ছিলেন, চাষী বলতেও তারাই ছিলেন। সুতরাং তাদের সেই অধিকারটা হিন্দুদের হাতে যখন চলে গেল, জমিদারী অর্থাৎ জমির মালিকানা এবং মধ্যস্বত্বভোগী যখন তারা হল, তখন মুসলমানদের উপর 'আস্তে আস্তে মহাজনী এবং নানাভাবে অত্যাচার আরম্ভ হল। এতে মুসলমানদের মনে আস্তে আস্তে বিরূপ মনোভাব এসে গেল। তারা চেয়েছে যে, তাদের থেকে আমরা মুক্তি চাই। এই হল প্রথম সামাজিক কারণ। এই সামাজিক কারণে পরবর্তীকালে ইসলামের প্রতি তাদের সে বন্ধনের কারণটা হল, ইসলাম তারা গ্রহণ করেছে, ইসলাম যদি রক্ষা না পায় হিন্দুদের যে অত্যাচার হবে সে অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়া দায়। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের বই লেখা এবং ঐ হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার করা। আবার মুসলমান হিন্দুর বাড়ীতে গেলে হুক্কাতে তামাক খাইতে না দেয়া, পানি চাইলে পরে পানি উপর থেকে ঢেলে দেয়া। আমরা হা করে সেই পানি খেতাম। এই ধরনের অত্যাচার ছোট ছোট অত্যাচার, কিন্তু এই অত্যাচার সামাজিক অত্যাচারের অন্তর্ভূক্ত এবং এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা ছিল বলেই যখন শ্লোগান উঠল মুসলমানের জন্য ইসলামী স্টেট হবে। মুসলমানের কৃষ্টি রক্ষা পাবে। মুসলমানের আবাসভূমি হবে তাদের তাহজীব তমদ্দুন রক্ষা পাবে, মক্কা মদীনায় যেতে পারবে; এই ধরনের মনোভাব তাদের মধ্যে দৃঢ় হয়েছিল। আর চাকরি বাকরি, দেখা যেত মুসলমানরা বিএ পাশ করলেও চাকরি পায় না। আর হিন্দু ম্যাট্রিক পাস না করলেও তার চাকরিটা দাদা দাদা করে হয়ে যায়। এটাও আরেকটা কারণ এবং এটা বোধ হয় মূখ্য কারণ হয়ে দাঁড়ায় পরবর্তীকালে। এই মূখ্য কারণই গিয়ে দাঁড়ায় সব হিন্দুরা নিয়ে গেল, মুসলমানদের কিছু দিবে না এবং তার জন্য মুসলমানরা এই দাবীর পিছনে সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং এরই কারণে সেই নির্বাচনে জয়ী হয়।

আবদুল গফুরঃ আচ্ছা অলি আহাদ ভাই, আপনি তো শেখ সাহেবের সাথে কলিকাতা থেকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

অলি আহাদঃ খুব ঘনিষ্ঠ।

আবদুল গফুরঃ তাহলে এই যে, একটা কথা বলা হয় যে, শেখ সাহেব পাকিস্তান আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন না। আপাতত সোরোওয়ার্দী সাহেবের সাথে ছিলেন এবং '৪৭ সাল থেকেই তিনি পাকিস্তানকে ধ্বংস করে বা এটাকে অবলুপ্ত করে একটা স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের জন্য চিন্তা করছিলেন এ ব্যাপারে আপনার কি মতামত?

অলি আহাদঃ কম্যুনিস্ট পার্টি, পাকিস্তান হওয়ার পর পাকিস্তানকে নিন্দা করত এ কথা বলে আরে পাকিস্তান একটা স্টেট না কি? রানাঘাট টু কলিকাতা, রানাঘাট টু কলিকাতা ট্রেনে যেমন চিল্লাচিল্লি হয় ঠিক এই রকম একটা স্টেট। শেখ সাহেব এই কথা শোনার পরে খুব রাগ হয়ে গেলেন। তিনি আমাকে একদিন বললেন যে, অলি আহাদ দেখছস্‌নি, এরা কয় কি? রানাঘাট টু কলিকাতা কয়। এই গুয়োরের বাচ্চাদের সংগে থাকা যাবে না। তাগোরে

www.pathagar.com

শিক্ষা দিতে হইব। অহন তাইলে কেমনে দিবেন? তখন ময়মনসিংহে একটা মিটিং ডাকা হইছিল ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নের। বললেন চল যাই। আমিতো যাবই। আমি গিয়া ঐটা ভাইঙ্গা দিয়া আসি এবং তিনি গেলেন সেখানে এবং ভাইঙ্গা দিলেন ঐটাকে। ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নকে আর দাঁড়াইতে দিলেন না। শেখ সাহেব পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন না বিপক্ষে ছিলেন এটাই তার প্রমাণ।

আবদুল হাই শিকদার ঃ বদরুদ্দিন উমর তার বইতে লেখেন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে '৪৮ এর ১৬ই ফেব্রুয়ারী শেখ সাহেব টুপি মাথায় দিয়া মিটিংএ প্রিসাইড করতে বইসা গেলেন.....

অলি আহাদ ঃ হ্যাঁ ১৬ ফেব্রুয়ারী। ১লা মার্চ ও ১৬ মার্চের সেই মিটিংয়ে তিনি প্রিসাইড করলেন এবং সেখানে তিনি পরিষ্কারভাবে বললেন, পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য যে কোন চেষ্টা হবে সেই চেষ্টা আমরা বাধা দেব। আমরা আন্দোলন করি ঠিক আছে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, ঠিক আছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে পাকিস্তানকে ভাঙ্গা হবে। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যে আসতেছেন আমরা এর পর আন্দোলন বন্ধ করে দেব। বন্ধ করে দিয়া আমরা কয়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে রিসিভ করব। আমাদের নেতা, আমাদের পাকিস্তানের স্রষ্টা, পাকিস্তানের জনক। সুতরাং পাকিস্তান সম্পর্কে শেখ সাহেবের যে ধারণা এটা তো আমরা ভাল বলতে পারব। আর একটি কথা পরিষ্কার, তখনকার দিনে '৪৭-এর একটা কথা ছিল যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের কথা ছিল। স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গভূমি কি? সোহরাওয়ার্দী সাহেব, আবুল হাশিম সাহেব, শরৎ বোস তারা যে Independent Bengal এর Plan করেছিলেন As a declaration of Cabinet Mission plan, As a declaration of grouping তার বিরুদ্ধে তারা যে আওয়াজ তুলেছিলেন সেটা হল স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গদেশ। তখনকার দিনে দুইটি শ্লোগান ছিল শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির। শ্যামা প্রসাদ মুর্খাজি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যে, বঙ্গভূমিকে দুই ভাগ করে ফেলা হবে। এক ভাগ হবে পশ্চিমবঙ্গ অন্যটি হবে পূর্ববঙ্গ। আমরা মুসলমানদের সাথে থাকবো না বা যদি কেবিনেট মিশন প্লান গৃহীতও হয় এরপর যদি ভারত প্রতিষ্ঠিত হয় তথাপিও আমরা মুসলমানদের সাথে থাকব না। আমরা পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ দুই ভাগে বিভক্ত বঙ্গদেশ গড়ব। আমরা মুসলমানদের সাথে থাকব না।

আবদুল গফুরঃ অর্থাৎ উনি বলেছিলেন বোধ হয় একটি কথা, ভারত যদি ভাগ নাও হয় তবু বাংলা ভাগ করতে হবে। কারণ তারা মুসলমানদের রাজত্বে থাকতে চায় না।

অলি আহাদঃ ঐটাই বলেছিলেন। এ ব্যাপারে পন্ডিত নেহরু, প্যাটেল, আচার্য কৃপালিনী, গান্ধী তারা সবাই চেয়েছিলেন যে বঙ্গ বিভক্ত হোক এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনাইটেড বেঙ্গল হোক এটা তারা চাননি। তাদের চিন্তার বিরুদ্ধে ছিল যাকে এত কথা বলা হয়, তার নাম কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে আলাপ-আলোচনা করে ঘোষণা দিলেন- বেঙ্গল ইন্ডিপেন্ডেন্ট সভরেন এবং আমরা সেই দাবীটা সমর্থন করি। কিন্তু গান্ধীজি সেই সময় ঢাকাতে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি তখন আসলেন মিটিং করার জন্য, সে মিটিংটা ছিল করোনেশন পার্কে, সদরঘাটে। এবং সেই মিটিংয়ে তার দাবী ছিল বঙ্গভঙ্গ করতে হবে। যে হিন্দুরা একবার বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল ১৯০৫ সালে, সেই হিন্দুরাই শ্যামা প্রসাদের প্ররোচনায়, গান্ধীজির প্ররোচনায়, নেহরুর প্ররোচনায়, প্যাটেলের প্ররোচনায় এবং সামগ্রিক কংগ্রেসের প্ররোচনায় (কংগ্রেসের

www.pathagar.com

কিছু অংশ বাদ দিয়ে) কিরণ শংকর রায়ের কথা বলি, শরৎচন্দ্র বোসের কথা বলি, এসএম দাসগুপ্ত- তাদের কথা বলি তারা সবাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল সভরেন্ট বেঙ্গল-এর পক্ষে ছিলেন। কিন্তু আর বেশীর ভাগ কংগ্রেস ছিল বঙ্গভঙ্গের পক্ষে। যারা নাকি বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে ছিলেন ১৯০৫ সালে তারাই পরবর্তীকালে দেখা গেল বঙ্গভঙ্গের পক্ষে এবং কলোনিয়াল লাইনে সেই বঙ্গভঙ্গ হওয়া চাই। তারা ন্যাশনালিষ্ট ছিল না, সেক্যুলার ছিল না, তাদের কার্যকলাপে প্রমাণ আছে তারা কম্যুনাল। সে অবস্থায় যাকে কম্যুনাল বলা হয় কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তারা ঘোষণা করলেন- আমরা সভরেন বেঙ্গল, ইউনাইটেড বেঙ্গল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল চাই, সেটা আমাদের দাবী। আমরা এটা ডিভিশন চাই না। সে অবস্থায় শেখ সাহেব, আমরাও যখন পাকিস্তান হল, আমাদের মনে মনে একটা কথা ছিল, আমরা উচ্চারণও করেছি জায়গায় জায়গায় যে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সভরেন্ট বেঙ্গল চাইতে গিয়ে যা যা সংগ্রাম করা দরকার সেই সংগ্রাম আমরা করব। এই একটা সাধারণ আবহাওয়া আবুল হাশিমের যারা আমরা সমর্থক ছিলাম। তা আমাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু শেখ সাহেব, ঐ, তার অংশ হিসেবে হয়তো বলতে পারে আমি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ চাই। কিন্তু তা বললে পরেও শেখ সাহেবের কার্যকলাপে পরবর্তীকালে প্রমাণ হয়েছে অন্য রকম।সেটা ১৯৫৬ সালে মন্ত্রী যখন ছিলেন তখনকার অবস্থা পরবর্তীকালের অবস্থা যোগ-বিয়োগ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শেখ সাহেবের কোন প্রকার নীতি পরিষ্কার ছিল না। উনি বঙ্গভঙ্গ চান, যদি ক্ষমতায় থাকতে পারেন। উনি বঙ্গভঙ্গ চাই না যদি ক্ষমতায় না থাকতে পারি, আর অখণ্ড বঙ্গ চাই, যদি ক্ষমতা আমার হয়। আর যদি ক্ষমতা না হয় তাহলে অখণ্ড বঙ্গ হোক আর না হোক, আমার কিছু আসে যায় না। শেখ সাহেব ছিলেন এ ধরনের লোক। অর্থাৎ তার উপরে এ কথা আরোপ করা যে, '৪৭ সাল থেকে তিনি অখণ্ড বঙ্গের পক্ষে ছিলেন, এ কথা সত্য নয়।

আবদুল হাই শিকদারঃ এখানে একটা কথা '৪৭-এর পরবর্তীকালে আপনি বলেছেন '৬০ -এর দশক পর্যন্ত শেখ সাহেব, স্বাধীন বাংলাদেশ বা স্বাধীন বংগের কোন কাজ করেন নাই।

অলি আহাদঃ না করেন নাই।

আবদুল হাই শিকদারঃ তাহলে এখন শেখ সাহেবের পরবর্তী ভূমিকাটা কিভাবে দেখবেন আপনি?

অলি আহাদঃ পরবর্তী ভূমিকা ?

আবদুল হাই শিকদারঃ হ্যাঁ।

অলি আহাদঃ আমি তো আগেই বলেছি।

আবদুল হাই শিকদারঃ '৭০ পরবর্তী ভূমিকা, '৭১ পরবর্তী ভূমিকা।

অলি আহাদঃ পাকিস্তান থাকতে যে ষড়যন্ত্র ছিল, সেনাবাহিনীর তরফ থেকে কায়েমী স্বার্থের তরফ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের তরফ থেকে সেখানে তার পক্ষে প্রধানমন্ত্রী হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। একথা তিনি নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরও প্রমাণ পেয়েছেন। যদিও তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন ইয়াহিয়া খানের ভাষায়, তিনি যেহেতু হতে পারবেন না, সেহেতু বাংলা বললে পরে, বঙ্গদেশ যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে তিনি চীফ মিনিস্টার হতে পারবেন এবং হয়েছেনও তাই। এটুকু ক্যালকুলেশন শেখ সাহেবের পরিষ্কার ছিল। সেই আন্দোলনটার

www.pathagar.com

সময়, এর আগে নয়।

আবদুল হাই শিকদারঃ তাহলে '৭১ সালে এবং '৭১ পরবর্তী তাঁর যে ভূমিকা এটাকে একটু আপনি ব্যাখ্যা করবেন ...

অলি আহাদঃ '৭১ সালে তিনি, তার স্বাধীনতা আন্দোলনে যে ভূমিকা ছয় দফা আন্দোলনের প্রবক্তা, ছয় দফার জন্য তার ত্যাগ আছে, ডিটারমিনেশন আছে, সব কিছু আছে। তো ছয় দফা আন্দোলন, যখন তিনি নির্বাচনে জয়ী হলেন তখন আসল পরীক্ষা শুরু হল। '৭১ সালে যখন না-কি তিনি ছয় দফা দাবী করতে আরম্ভ করলেন, তখন কনফেডারেশন, প্রায় ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনা করে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। এই সবকিছুই তখন তার কাছে এটাই ছিল যে, যদি এটা হয় তাহলে পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হবে, স্বাধীন হলে আমি হব এটার রাষ্ট্রপতি এবং সংগে সংগে সমস্ত সুনাম যা কিছু আছে সব আমার হয়ে যাবে এবং তাই সত্য। তিনি '৭১ সালে ..... এটাত চেয়েছেন সত্য, কিন্তু আবার বুকের মধ্যে সেই সাহসটা ছিলনা। আমরা যখন ওনাকে দেখা করে বললাম- "মুজিব ভাই, আপনি একটা কাজ করেন, ইউনাইটেড ন্যাশনস-এ বলে দেন যে, আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চাই এবং আমরা সাহায্য চাই ইউনাইটেড ন্যাশন্সের। তিনি বললেন পাগল না কি! কি কস্ তুই এইসব। এটা আমার দ্বারা হবে না। এটা সম্ভব না।" তাজ উদ্দিন আহমেদও ছিলেন তখন। তারাও সে কথাই বললেন যে, "এটা অতি বিপ্লবী কথা। আমরা এই অতি বিপ্লবী কথা বলেছি সত্য (তাদের ভাষায়), কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যখন না-কি ২৫ তারিখে হামলা আসল, শেখ সাহেবকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সেনাপতি হিসেবে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য, রক্তাক্ত যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য তিনি অনুপস্থিত রয়ে গেলেন। অর্থাৎ বাড়ীতে থেকে গেলেন। কার পরামর্শে জানি না। পরামর্শ তো নিশ্চয়ই পেয়েছেন যে, বাড়ীতে থাকলে তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে এবং সেই গ্রেফতার করলে পরে, স্বাধীনতা আন্দোলন তিনি চেয়েছিলেন এই কথাটা প্রমাণিত হবে এবং গ্রেফতার হওয়ার পর যে একটা আলাপ আলোচনা সমঝোতা হয় সেই সমঝোতাতে এটাই দাঁড়াবে- শেখ সাহেব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন চেয়েছেন পূর্বাংশের জন্য কিন্তু স্বাধীনতা চান নাই। এটা প্রমাণ করার জন্যই স্বায়ত্তশাসন চেয়েছেন, স্বাধীনতা চান নাই তার জন্যই তিনি আত্মসমর্পণ করলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জেলখানায় চলে গেলেন। এই হল তার ভূমিকা।

আবদুল হাই শিকদার ঃ স্বাধীনতার ঘোষণা যেটা বলা হচ্ছে যে, তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন চট্টগ্রামের জনৈক হান্নানের মাধ্যমে, এই স্বাধীনতার ঘোষণাটা কি ? .....

অলি আহাদঃ এইটা গাঁজাখোরি গল্প। মিছা কথার কোন .... ইয়ে হয় না। শেখ সাহেব ফিরে আসার পর তিনি ঘোষণা দিছেন তা ছাপিয়ে দেয়া হয়। যেটা দাবী করে। আমার সাথে দেখা হল। আমি মুজিব ভাইকে বললাম- "মুজিব ভাই, আপনি এটা কি করলেন। আপনি তো কোন ঘোষণা দেন নাই। অথচ আপনার নামে একটা কাগজ বের কইরা দিছেন। আপনি জহুর আহম্মদ চৌধুরীকে টেলিফোন কইরা কি জানাইছেন? আমি নিজে জহুর আহম্মদ চৌধুরীর সাথে আগরতলায় আলোচনা করেছি। জহুর আহম্মদ চৌধুরী আমারে বলেছেন- "না, শেখ সাহেব আমাদের কোন ঘোষণা দেন নাই। আমরা জানি না।" তো ঘোষণা দেন নাই, জহুর আহম্মদ চৌধুরী জানেন নাই, অথচ তার কাছে টেলিগ্রাম পাঠাইছেন, সেটা ছাপাইলেন কি করে? তো আমি তর্ক করলাম যে, মুজিব ভাই এ কথাটা, এ কাজ করাটা ঠিক

www.pathagar.com

না, আপনার উচিত ছিল- এটা মাইনা নেওয়া যে, জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। এ কথা যদি বলেন তো আপনি ছোট হবেন না, আপনিই প্রেসিডেন্ট এখন। একথা আপনাকে বুঝতে হবে, আপনিই প্রেসিডেন্ট। আপনি জাতির পিতা হিসেবে এখন পরিচিত হতে চান। এটা আপনাকে জানতে হবে। অতএব, আপনি জিয়াউর রহমানকে যদি সেই ক্রেডিটটা দিতেন যে, আমার পক্ষ হইয়া না হোক, দেশের সেই ক্রান্তিলগ্নে জিয়াউর রহমানের মত একজন মেজর স্বাধীনতা ঘোষণা করায় মানুষের মনের ভিতর সাহস ফিরে আসে। এটাতো আপনার বলা উচিত ছিল। এটা বললে আপনি বড় হইতেন। ছোট হইতেন না। তিনি মুচকি হাসলেন। কোন উত্তর দিলেন না।

আবদুল হাই শিকদারঃ আচ্ছা, এবার আমরা একটু ভাষা আন্দোলনের দিকে যাই। ১৯৫২'র একুশে ফেব্রুয়ারী তো ভাষা আন্দোলনের চরম মুহূর্ত। তো সেই ভাষা আন্দোলনে আপনার নিজের ভূমিকা এবং ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আপনার মুল্যায়ন .....

অলি আহাদঃ আমি এ প্রসঙ্গে বলব না। সেটা আপনাদের বই পড়ে নিতে হবে।

আবদুল গফুরঃ আমি বরং একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই ..... এখন বাজারে একটা কথা একটা মহল প্রচার করছে, এবং প্রচুর পাঠ্যপুস্তক এ জিনিসটা ছাত্রদের পড়ানো হচ্ছে যে- ভাষা আন্দোলন কিভাবে শুরু হল? শুরু হল কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসলেন। তিনি বললেন যে, একমাত্র উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা। এতে মানুষ ক্ষেপে গেল। এরপর থেকেই .... এই যে, উনিতো আসলেন ১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ। আমরা শুনি যে, ১১ই মার্চে আন্দোলন করেছেন এবং এটা আমরাও জানি। আপনি বলেছেন যে, '৪৭ সালেই ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছে। তাহলে, ভাষা আন্দোলন আসলে শুরু হয়েছিল কবে? জিন্নাহ সাহেব আসার পর শুরু হল, না '৪৭-এ?

অলি আহাদঃ অনেক আগে থেকে ১৯৪৭ সালে যে আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন আন্দোলন করতাম। আবুল কাশেম সাহেব, তমুদ্দুন মজলিশ গঠন করেন এবং তারপর তিনি রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন আরম্ভ করেন। রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের স্থপতি যদি কাউকে বলা হয়, শুরু করেছিল যদি কাউকে বলতে হয়, উদ্যোগী যদি কাউকে বলতে হয় তাহলে প্রথম নাম বলতে হয় জনাব আবুল কাশেম সাহেবের। প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম সাহেব। এবং তার অর্থ হল তার যে প্রতিষ্ঠান তমদ্দুন মজলিশ। আমরা ছাত্রলীগে উনার সাথে জড়িত হয়েছিলাম। এই হল আমাদের প্রকৃত ইতিহাস। এই ইতিহাস অন্য কোনভাবে নেয়ার কোন অবকাশ নাই। উপায় নাই। যদি নেয় তবে তা মিথ্যা কথা। বইয়ে লেখুক আর যেখানেই লিখুক।

আবদুল গফুর ঃ আচ্ছা আপনি তো ছাত্রলীগের প্রথম থেকেই। এই ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা হয় বোধ হয় নতুন করে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ হিসেবে ১৯৪৮ সালে। এবং আপনি তখন যতটুকু আমার মনে পড়ে ত্রিপুরা জেলার প্রতিনিধি ছিলেন?

অলি আহাদঃ ঢাকা সিটির কনভেনরও ছিলাম।

আবদুল গফুরঃ তাহলে '৪৭ সাল থেকে তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে আবুল কাশেম সাহেবের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলন শুরু হয় এবং আপনারা তখন বিচ্ছিন্নভাবে এর প্রতি সমর্থন করে আসছিলেন।

অলি আহাদঃ একটা কথা ভুললে চলবে না। আমি অল বেঙ্গল মুসলিমলীগেও ছিলাম, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছি। তারপরে যখন এই আন্দোলন আসল আমরা মুসলিম ছাত্রলীগের

www.pathagar.com

সদস্য হিসেবে আবুল কাশেম সাহেবকে আমরা সমর্থন করেছিলাম এবং মূল কথা হল, ভাষা আমরা চেয়েছি বাঙলা তার জন্য আমাদের অবস্থান যেখানেই থাকুক না কেন আমরা এটা করেছি। এর মধ্যে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আসার পর ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছে এটা সর্বৈব মিথ্যা কথা। ইতিহাস বিরুদ্ধ কথা। যারা বলে তাদেরকে চাবকানো দরকার, তাদের শুধু চাবকানো না, তাদের বিচার হওয়া দরকার।

অধ্যাপক মোমেনুল হকঃ পাকিস্তান হওয়ার পরে যে মুসলিম ছাত্রলীগ এখানে প্রতিষ্ঠিত হল, নিখিল পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ তার প্রতিষ্ঠাতা নিয়েও কিন্তু এখন বিভ্রান্তি আছে। আমি যতটুকু পড়েছি তাতে আমরা জানি যে ফজলুল হক হলে এটা হয়েছিল। জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা তখন ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ছিলেন। জনাব শেখ মুজিবর রহমানকে এটার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও কোন কোন বইয়ে লেখা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থকাররা লিখেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সাংবাদকিতার কাজ করতে গিয়ে আমি বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি যে, এর কোন দলিল পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে এর প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

অলি আহাদঃ প্রতিষ্ঠাতা ছিল কথাটায় আসেতেছি। নিখিল বংগ মুসলিম ছাত্রলীগে যখন দেখা গেল যে, নাজিমুদ্দিন সাহেবের সমর্থক ভরা, আমরা আশা করেছিলাম, নুরুদ্দিন সাহেব যিনি বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্ট লীগের একটিং জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন, তিনি কলিকাতা থেকে এসে এখানে আমাদের নেতৃত্ব দেবেন। উনি আসছিলেন আমার বাড়ী। তো উনাকে অনুরোধ করেও আমরা রাখতে পারি নাই। উনি কলিকাতা থেকে গেলেন। না আসার ফলে আমরা ইচ্ছা করেও পারি নাই। তখন আমাদের মাঝে চিন্তা হল আব্দুল হামিদ চৌধুরী, মোল্লা জালালুদ্দিন আরো আমরা যারা আতাউর রহমান চৌধুরী তার পরে আব্দুর রহমান চৌধুরী অবশ্য ভীতু, পরে ভয়ে সে সইরা গেছে তারপর আবার আসছে। আব্দুল মতিন খান চৌধুরী ময়মনসিংহের; আমরা আলাদা আলাদা আলাপ করতে লাগলাম। আমরা তো অল বেঙ্গল মুসলিম লীগের লোক, সোরায়ার্দী সাহেবের সমর্থক। আবুল হাশেম সাহেবের সমর্থক। সুতরাং আমরা একটা মুসলিম স্টুডেন্ট লীগ দাঁড় করাই। এটার 'অল'টা কেটে দিয়া আমরা এখানে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ দাঁড় করাই। তো বল্লাম, চলেন ইনিসিয়েটিভ নেই। ইনিসেয়িটিভ নেয়ার মতো আর কেউ আগায় না। তখন আমি, আমাদের কিছু বন্ধু-বান্ধব ঢাকা কলেজের ছাত্র যারা ছিল, যারা নাকি আইসা আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হল, ওদেরকে বল্লাম ভাই কিছু একটা করতে হবে। করার জন্য রাজি আছে অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্ট লীগে যারা আছে তাদের একটা অংশ। তাদেরকে আমি বলেছি যে কাউন্সিল ডাকেন। কাউন্সিল ডাকলে যাই হোক, যতজনই হোক তাদের নিয়ে আমরা একটা সংগঠন দাঁড় করাই। কিন্তু তারা একবার রাজি হয় একবার পিছ পা দেয়। অর্থাৎ তারা নির্দ্বিধায় কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগতেছিল। এখন কথাটা হয়ে যায় ব্যক্তিগত মাতব্বরীর মত। আমি তাদের সাথে আলাপ করে বললাম যে, আমরা ফজলুল হক হলে একটা মিটিং ডাকি। তোয়াহা সাহেব ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে, হল আমাদের দিবে এবং হলে আমরা সেই মিটিংটা ডাকি। তখন সেই অনুযায়ী আমি ওখানে মিটিংটা ডাকলাম। ডাকার পরে ফেনী কলেজের লেকচারার ছিলেন নাজমুল করিম সাহেব, পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সোসিওলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান ছিলেন। আমরা প্রিসাইড করার কাউকে পাচ্ছিলাম না, উনাকে প্রিসাইড করতে দিলাম। উনি আইসা বসে গেলেন। যদিও আমরা যানতাম, উনার সম্পর্কে ধারণা

www.pathagar.com

ছিল উনি কমিউনিস্ট, উনাকে করা উচিত না। তথাপি আমাদের তখন উপায় ছিল না। উনাকেই বসাইছিলাম। শেখ সাহেব তখন এর কাছ দিয়াও ছিল না। জানতেনও না। উনি ঢাকায়ই ছিলেন না। জানবেন কি করে। আমরা মিটিং ডাকলাম ৪ঠা জানুয়ারী'৪৮। অতএব শেখ সাহেব প্রতিষ্ঠাতা এটাও মিথ্যা কথা। যেমনি মিথ্যা কথা '৪৭ সাল থেকে তিনি চিন্তা করতেন স্বাধীন বাংলাদেশ করার জন্য, ঠিক তেমনি এটাও জাজ্বল্যমান মিথ্যা। দিনের সূর্য যেমন সত্য আমার কথাও তেমন সত্য নঈমুদ্দিন আহমেদকে আমরা কনভেনার করে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ অর্গানাইজিং কমিটিটা করি। আমার পক্ষে কনভেনার হওয়া তখন অসুবিধাজনক ছিল। কারণ তখন বয়স আমার কম এবং মাত্র ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি। সুতরাং আমাকে ত্রিপুরা জেলার রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে নেওয়া হয় এবং ঢাকা সিটির কনভেনর করা হয়। আমি তাতে আমার সম্মতি দেই, এই হল সংগঠন গড়ার কাহিনী।

আবদুল গফুর ঃ ওই কমিটিতে বোধ হয় শেখ সাহেবকে ফরিদপুর জেলার প্রতিনিধি রাখা হয়েছিল ?

অলি আহাদঃ হ্যাঁ, শেখ সাহেবের অন্য ইম্পোর্টেন্সী আছে।

আবদুল গফুর ঃ আচ্ছা ১১ মার্চে যে আপনারা একটা প্রতিবাদ দিবস পালন করেছিলেন এটার পটভূমি কি ছিল, এটা একটু বলবেন ?

অলি আহাদঃ আমি কিন্তু ঢাকা সিটির মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক ছিলাম, শেখ সাহেবের দান আছে, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। শেখ সাহেবের নামেই আমরা পরবর্তীতে অংশগ্রহণ করতে পারছি। নূরুদ্দিন ভাই রাজী হল না, তখন শেখ সাহেব দৌড়াদৌড়ি করে তার জানা শোনা যত ছেলেরা আছে তাদের দিয়ে দলটির কমিটিটা সেটআপ করতে সাহায্য করেছিলেন, এর মধ্যে সন্দেহ নেই।

আবদুল গফুর ঃ এই যে ১১ মার্চের যে আন্দোলনটা হয়, ১১ মার্চ প্রথম যে গণবিস্ফোরণ হয় ভাষার দাবীতে এটার পটভূমিটা কি। '৪৮ সালের ১১ মার্চের সেই আন্দোলনের পটভূমিটা কি? এটা ডাকা হল কেন প্রতিবাদ দিবস এবং ঐ দিনকার ঘটনা....।

অলি আহাদঃ এটাতো পুরানো কথা। আগস্ট মাসের মিটিংয়ে বাংলাকে অন্যান্য ভাষায় সহিত যোগ করার জন্য, বক্তৃতা করার জন্য অধিকার দেওয়ার জন্য দাবী তোলা হয়, এ থেকে ভাষা আন্দোলন। আবুল কাশেম সাহেবের দেশপ্রেমের কারণে, আবুল কাসেম সাহেবের মাতৃভাষার প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং আনুগত্যের কারণে এই আন্দোলনটা আরম্ভ হয়।

১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী উর্দু, ইংরেজীর সহিত গণপরিষদের বাংলা ভাষা ব্যবহারের স্বপক্ষে দাবী উত্থাপন করেন বাবু ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত। এই অপরাধে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান ও অন্যান্য বক্তা অসৌজন্যমূলক ভাষায় তাকে আক্রমন করেন। ঢাকায় পুনঃপুনঃ দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ওকালতী করেন। এর কারণেই আবুল কাসেম সাহেব তমুদ্দুন মজলিসের একটা সভা ডাকেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে রশিদ বিল্ডিং-এর দোতালায়। সেই রশিদ বিল্ডিংয়ের দোতলার সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, আমরা একটি কমিটি অব একশন সেটআপ করব। সেই কমিটি অব একশন শামসুল আলম সাহেব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় বর্ষের ছাত্র তাকে কনভেনর করে করা হয়। আর পূর্বকার যে সাব-কমিটি করা হয়েছিল তমুদ্দুন মজলিসের, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন গাইড করার জন্য তা থেকে নূরুল হক সাহেব পদত্যাগ করেন। সেই

www.pathagar.com

দিনই আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি ১১ মার্চে যেহেতু পূর্ববঙ্গ এসেম্বলীর অধিবেশন, সেই অধিবেশন দিবসে প্রতিবাদ করার জন্য আমরা ১১ মার্চকে ঘোষণা করি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবীতে।

আবদুল গফুর ঃ ১১ মার্চতো আপনি গ্রেফতার হয়েছিলেন?

অলি আহাদঃ ১১ মার্চে আমি , শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরো অনেকে গ্রেফতার হয়েছিলাম।

আবদুল গফুর ঃ ওখানে কি গোলাম আযম সাহেবের কোন ভূমিকা ছিল?

অলি আহাদঃ নিশ্চয় ছিল। গোলাম আযম সাহেব তখন খুব ইমপর্টেন্ট লোক। উনি তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ডাকসুর জেনারেল সেক্রেটারী এবং ফজলুল হক হলের যে নির্বাচন হয়েছিল তোয়াহা সাহেবের সাথে মিলে তিনি একই পক্ষ থেকে সেই নির্বাচন গাইড করেছিলেন। অতএব গোলাম আযম সাহেবের ডেফিনিটলি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা ছিল। অন্যদের চেয়েও ভাল কন্ট্রিবিউশন ছিল।

আবদুল গফুরঃ আচ্ছা, এর পরে তো কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্'র সাথে আপনাদের আলোচনা হয়। সে আলোচনা সম্পর্কে কিছু বলুন।

অলি আহাদঃ আলোচনাটা, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র সাথে আমরা দেখা করি। চীফ সেক্রেটারী ছিলেন আজিজ আহম্মদ সাহেব তার বাড়ীতে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অবস্থান করছিলেন, আমরা ওখানে আলাপ-আলোচনা করলাম যে, স্যার, সভায় আপনি বলেছেন Urdu shall be the state language" এ কথাতে এবং only state language এ কথাতে আমরা খুব ব্যথা পেয়েছি। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা মনে করি পূর্ববঙ্গের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশি। আমরা মনে করি উর্দু state language হতে পারে, বাংলাও state language হতে পারে এবং দু'টোকেই করা উচিত। আর আপনার ভাষায় State Language যদি উর্দুকে করা হয় অর্থাৎ বাংলাকেও তার সাথে করা হয় তাহলে পাকিস্তান থাকবে না, পাকিস্তান ভেঙ্গে যাবে। এই কথাটির সাথে আমরা একমত নই। কারণ, বিভিন্ন দেশে দেখা গেছে একই ধর্ম, একই ভাষা-তা সত্ত্বেও তারা একটা স্টেট। যেমন কানাডার কথা বলা যায়। আরব দেশের কথা বলা যায়। বিশেষ করে আরব দেশে ধর্ম এক জাতি এক ভাষা এক তা সত্ত্বেও একটা স্টেট নয়। অনেকগুলো স্টেট রয়েছে। এটা আমরা প্রমাণ করেছি যে, বিভিন্ন ভাষা Multi Language হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান একটা স্টেট হিসেবে দাঁড়াতে পারে এবং দাঁড়াবে। তার জন্য গণতান্ত্রিক মনোভাব থাকলে এটা সম্ভব। তা আমরা মনে করি এবং এ কারণে দু'টো State Language হওয়া উচিত। তিনি এক স্টেজে আমাদের সাথে রাগ করে বসলেন। If necessary in the interest of the state, the interest of the integrated state, your language will have to be changed. কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে সেখানে আমাদের দ্বিমত। দ্বিমত নয়, প্রকট Difference of opinion হয়। যদিও আমরা পরবর্তীকালে শুনেছি কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এটা বলতে চাননি। কিন্তু ওনাকে বলানো হয়েছে। জিন্নাহ'র মতো নেতাকে যদি বলাতে পারে এর'চে দুঃখের আর কি হতে পারে? যেমন কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ববঙ্গ এসেম্বলিতে যখন এডড্রেস করতে আসলেন, মওলানা ভাসানী তিনি তখন সদস্য ছিলেন। তিনি উঠে বললেন "কায়েদে

www.pathagar.com

আযম, মুঝে এক সাওয়াল হ্যায় আপকে পাস, আপ বাতাইয়ে, হামিদুল হক চৌধুরীকে লিয়ে আপ ছে মাহিনেসে ন মাইনে কর দিয়া, ইন্তেখাব কে লিয়ে, হামলোগ কোন ক্যায়াস হ্যায়, যো এন্তেকাবি কে লিয়ে যদি কনস্টিটিউশন চেঞ্জ করা যায়, আগার ইয়ে হো সাকতা। আপকে তারা পার্লামেন্টারিয়ান, আপকে তারা কনস্টিটিউসানকো এহি কর সাকতা হ্যায়। তো ক্যায়া নেহি হো সাকতা"। তিনি জবাবে বললেন, মওলানা, ম্যায় নেহি মানতা এহি বাত, মুজে বোলানেই হোগা। ম্যায়েনে, কিয়া, হো গায়া"। কায়েদে আযমের এতটুকু মানসিক অবস্থা ছিল ভুলকে স্বীকার করে নেয়ার মত। এবং সেই ভুল তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এখানেও আমরা যারা পরবর্তীকালে বিভিন্ন বই থেকে পড়েছি ..... এর পরে কায়েদে আযম কোনদিন উনার মৃত্যু পর্যন্ত রাষ্ট্র ভাষা সম্পর্কে State Language Shall Be the Urdu- এটা কখনোই বলেননি। এমনকি রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোন কথাই বলেননি। এতটুকু তিনি নিজেকে সংবরণ করে নিয়েছিলে। কায়েদে আযম যা তা নেতা নন। কায়েদে আযমের ডিটারমিনেশন অসম্ভব ছিল। কায়েদে আযম যা সত্য মনে করতেন তা বলতে এক সেকেন্ড দেরী করতেন না। যেমন খেলাফত আন্দোলন। খেলাফত আন্দোলনের মওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, গান্ধিজী তারা যখন করছিলেন ক্যালকাটা কনফারেন্স চলছে, তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, খেলাফত ইয়ে হোনা নেহী চাহিয়ে He was against this movement তার ফলে তার বক্তব্য শুনে মাওলানা শওকত আলী কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলীকে ডায়াসে মারতে গেলেন, ধরে তাকে থামানো হল। তারপর কায়েদে আযম সেখান থেকে বেরিয়ে আসলেন, বেরিয়ে এসে ট্রেনে উঠে পরিষ্কার চলে গেলেন। তারপর লন্ডন চলে গেলেন। তারপর তো রাজনীতিই ছেড়ে দিলেন। এই হল কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। সুতরাং উনি বুঝে ফেলেছেন আমি একটা ভুল করে ফেলেছি। হয়তো একটা ক্ষতিও করে ফেলেছি। যার জন্য তিনি আর কখনো এ সম্বন্ধে, রাষ্ট্রভাষা কি হবে না হবে সে সম্পর্কে আর কিছু বলেননি।

আবদুল গফুরঃ আচ্ছা তাহলে, আমরা মোদাব্বের সাহেবের একটা বইতে পেয়েছি। উনি ওনার ভুলটা স্বীকার করেছিলেন ডাক্তার এলাহী বখ্শর কাছে।

অলি আহাদঃ হ্যাঁ' এলাহী বখ্শর কাছে।

আবদুল গফুরঃ আচ্ছা, একটা কথা তাহলে কায়েদে আযম চলে যাবার পরে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কিন্তু খুব তীব্র আকার ধারণ করেনি কেন। হরফ নিয়ে একটা আন্দোলন হয়েছিলো, কিন্তু রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে একজাক্ট, '৫২-তে যেভাবে আবার জন্ম নিল, সেভাবে আর কোন আন্দোলন হয়নি। সেটার কারণ কি?

অলি আহাদঃ যে কোন মুভমেন্টে আপস এন্ড ডাউন আছে। সে জন্যই একটা কথা মনে রাখতে হবে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এসে যখন বলে গেলেন। তার দ্বিমত প্রকাশ করে গেলেন। এখানকার মুসলমানরা একটু থ খেয়ে গেল। এটা না যে কায়েদে আযমের বক্তব্য গ্রহন করেছেন কিন্তু তার একচ্ছত্র নেতা তার প্রিয় নেতা এই বক্তব্য দিয়ে গেছে, কি করা উচিত? কি কর্তব্যবিমূঢ় সবাই। কিন্ত ইয়ংগার জেনারেশন যারা ছাত্র ছিল তারা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে জিইয়ে রাখার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছে। কিন্ত সেই চেষ্টা ফলপ্রসু হয়নি।

আবদুল গফুর ঃ এর আগে তো আমাদের যতটুকু মনে পড়ে ১১ মার্চকে রাষ্ট্রভাষা

www.pathagar.com

দিবস হিসেবে পালন করা হয় এবং ১১ মার্চ আপনারা '৪৮ সালেই করেছিলেন তার পরে '৪৯ সাল, '৫০ সাল, '৫১ সাল ১১ মার্চকে রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হয়। কিন্তু এখানে একটা নতুন ধারা শুরু হল '৫২ তে। সংযোজন হল একটা নতুন দিগন্তের। এটার পটভূমিটা কি? তখন বোধ হয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন।

অলি আহাদঃ খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব, ২৬ জানুয়ারী পল্টন ময়দানে বক্তৃতা করলেন, কিন্তু একটি জিনিস দেখতে হবে, একটা এডমিনিস্ট্রেশন যখন চলতে থাকে যখন '৪৭ সাল থেকে আরম্ভ করে '৫২ সাল পর্যন্ত এই পিরিয়ডটাতে এই সরকার সমন্ধে মানুষের মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হল। যেমন শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবর্তন হওয়ার পরে ১৫ আগস্ট সমগ্র দেশবাসী সেটাকে গ্রহণ করেছিল (কয়েকজনের কথা বাদই দিলাম)। তেমনি আজকে যে অবস্থা এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হাসিনা হয়তো বুঝতে পারছেন না যে, আজকে গণভোট দিলে পরে শতকরা নব্বইটি ভোট মুসলমানদের ওনার বিরুদ্ধে যাবে। যেমনি এই দেড়-দুই বৎসরে কোয়ালিটি চেঞ্জ হয়ে গেছে। তেমনি আমরা মানুষের-মাটির সাথে সম্পর্ক রাখি। মাটির আওয়াজ আমাদের কানে আসে এবং আমরা বুঝতে পারি যে, দেশের অবস্থা কি। তা না হলে রাজনীতি করে লাভ নেই। ঠিক তেমনি সে অবস্থার সাথে তুলনা করতে হবে ১৯৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২'র সাথে। নানা কারণে সামাজিক কারন, অর্থনৈতিক কারণ, রাজনৈতিক কারণ, এসব কিছু মিলিয়ে একটা পরিবর্তনের দিকে মানুষের হাওয়া বইছে। যেমন ৩৫টা বাই-ইলেকশন বন্ধ করেন নূরুল আমিন সাহেবের সময়। এগুলি মানুষের মনের মধ্যে দাগ কাটতে লাগল। যেমন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সম্পর্কে যে নিউ মিডল ক্লাস গড়ে উঠল, সেই নিউ মিডল ক্লাস তারা চাইল, আমরা যে কেকটা পেয়েছি সেই কেকটার একটা অংশ আমরা পাইনি এবং তার অর্ধেকটা, পুরোটা না পাই। আমাদের অন্তত পাইতেই হবে। তো কেক বলতে কি কি জিনিস ছিল। আর্মিতে রিক্রুটমেন্ট, সিভিল রিক্রুটমেন্ট, বিজনেসে তারপর শিক্ষা-দীক্ষায়, স্কুল কলেজ এগুলো পশ্চিম পাকিস্তানে হয়, পূর্ব পাকিস্তানে হয় না। এই প্রোপাগান্ডাগুলো অন্তর্শেলের মত কাজ করেছে। নাজিমুদ্দিন সাহেব এখানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় একবার সই করেছিলেন এবং সেই সইয়ের তিনি মর্যাদা রাখেননি। অর্থাৎ সেই সংগে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। সেই বিশ্বাসঘাতকতা, সেই গাদ্দারী জনগণের মনের মধ্যে কাজ করতে থাকল। State language এটা হয়, তবে এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে চাকরি পাওয়া যাবে না।

আবদুল গফুরঃ সবচেয়ে বড় কথা উনি তার আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ওয়াদা করেছিলেন, সেই আগে ১৯৪৮ সালে, তা থেকে ফিরে আসেন।

অলি আহাদঃ তখনই তিনি ফিরে আসেন। এই ফিরার পর থেকেই এ পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে দেখা গেল যে, ওনাকে বিশেষ করে ছাত্রমহল গ্রহণ করেনি। ছাত্র সমাজ গ্রহণ না করার ফলেই সেই আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়। ১১ মার্চে যেমন পূর্ববঙ্গের লেজিসলেটিভ এসেম্বলীর অধিবেশন ডাকা হয় ঠিক তেমনি একুশে ফেব্রুয়ারীতে পূর্ববঙ্গ লেজসলেটিভ এসেম্বলীর অধিবেশন ডাকা হয়। আমরা এ সুযোগে মনে করলাম আন্দোলন দিতে হলে ঐ তারিখকে লক্ষ্য করে দিতে হবে। এবং পূর্ববঙ্গ এসেম্বলী দিয়েই, ঘোষণা করাতে হবে যে, স্টেট লেঙ্গুইজ অন্যতম ওয়ান অব দি স্টেট লেঙ্গুইজ এ প্রশ্নটা আমাদেরকে তুলতে হবে। সে জন্য এই আন্দোলন সে দিন ঘোষণা করা হয়। এর ঘোষণা করার, তারপর বাকীটা গণআন্দোলনে রূপ নেয়।

www.pathagar.com

আবদুল গফুরঃ সে সময়ে তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ আলাদা ছিল, এটার ভূমিকা সম্পর্কে আপনি কাইন্ডলী বলবেন?

অলি আহাদঃ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ যেটা গঠিত হয় সেটাতো গঠিত হয়েছে ওখানে যারা ছিলেন তারাই বিভিন্ন সময়ে এসেম্বলীর মেম্বার পার্লামেন্টোরী মেম্বার তাদিগকে মেমোরেন্ডাম দিতেন যে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হউক। এটাই কন্টিনিউ করতে লাগলো। আর আমার পূর্ব পাকিস্তান ইউথ লীগ, তখন আমি তখন পূর্ব পাকিস্তান ইউথ লীগের জেনারেল সেক্রেটারী।

আবদুল গফুরঃ আপনি তো ফাউন্ডার জেনারেল সেক্রেটারী?

অলি আহাদঃ আমি ফাউন্ডার জেনারেল সেক্রেটারী। তো আমাদেরও মনে হলো যে এই মতিন সাহেব যেহেতু আমাদের পুর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের' পুর্ব পাকিস্তান ইউথ লীগের অন্যতম সদস্য ছিলেন, তিনি আমাকে একদিন এসে বললেন, যে কিছু তো করতে হবে, আমি বলি নিশ্চয়ই করতে হবে, নাজিম উদ্দিন সাহেব এ ঘোষণা করেছেন, অতীতেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আগামীতেও বিশ্বাসঘাতকতা করবেন। সুতরাং আমাদের দায়িত্ব হবে কিছু করার এবং চলেন আমরা একটা মিটিং ডাকি এই থেকে সূত্রপাত।

আবদুল হাই শিকদারঃ এখানে যে কথাটা অধ্যাপক আবদুল গফুর বললেন, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে যে দেখাটা হলো এবং তারপরে যে বিরাট গ্যাপ গেল, গ্যাপের পরে আবার ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা এটা নতুনভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠলো বায়ান্ন সালে। এই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক নতুন ধরনের জাগরণ ঘটলো এই জাগরনটাকে একটু ব্যাখ্যা করলে আমাদের জন্য একটু ভাল হয়।

অলি আহাদঃ দেখেন তখন সোহরাওয়ার্দী সাহেব পাকিস্তানে এসেছেন। বিরোধী দলের নেতৃত্বের ভার নিয়েছেন মওলানা ভাসানী। তখন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট মওলানা ভাসানী সমগ্র দেশে বিশেষ কইরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় প্রতিটি মহকুমার এমন কি কোন কোন থানায় পর্যন্ত নূরুল আমিন সরকারের বিরুদ্ধে, মুসলীম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে, লিয়াকত আলী খান সরকারের বিরুদ্ধে নাজিমুদ্দিন সরকারের বিরুদ্ধে যা যা বলা দরকার তিনি বলেছেন এবং উদ্বুদ্ধ করেছেন। এতে জনগণ উত্তেজিত হয়েছে, মওলানা ভাসানীকে বিশ্বাসও করেছে। সে অবস্থায় ছাত্রদের আন্দোলন এবং এই দেশের স্বাভাবিক ভাবেই আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রিতে যা হয় ছাত্রদের প্রতি লোকজনের বিশ্বাস জাগে। ছাত্ররা আবার ইনিসিটিভও নেয় এবং ইনিসিটিভই ছাত্ররা নিয়েছে। একদিকে সোহরাওয়ার্দী সাহেব পার্লামেন্টারী লিডার আর এক দিকে মওলানা ভাসানী মাস লিডার। এই দুইজনের নেতৃত্বে পাবলিক অপেনিয়ন ফর্ম হইতে লাগলো। কনসুলেটেড হইতে লাগলো এবং কনসুলেটেড হলোও তাই। সে অবস্থায় যখন ছাত্ররা আন্দোলনের ডাক দিল সাড়া পাওয়া গেল। এটাই হলো মূল কারন এবং ছাত্ররা আন্দোলনের ডাক দেওয়ার ফলে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডাক দেওয়ার ফলে সমগ্র স্কুল-কলেজ ও সমস্ত দেশের মধ্যে আগুন জ্বললো। কিন্তু আসল হলো, ঢাকা শহর। ঢাকা ইউনিভার্সিটি। জগন্নাথ কলেজ, ইন্টারমেডিয়েট কলেজ, ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজ এইগুলো।

আবদুল গফুরঃ তো এই যে একটা রাজনৈতিক পরিবেশ, আপনি যেটা বলতে চাইলেন

www.pathagar.com

তাহলে এটা মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী সাহেব, আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এদিকে আপনারাও যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করে কাজ করছেন। মোটামুটিভাবে একটা রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। মুসলীম লীগ বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন বা এ সংক্রান্ত অন্যান্য আন্দোলনের পটভূমি একটা সৃষ্টি হচ্ছে।

অলি আহাদঃ এর সাথে অবশ্য একটা কথা যোগ করতে হবে। আপনার সাথে যে সৈনিক পত্রিকা এবং বিশেষ কইরা আবুল কাশেম সাহেবের নেতৃত্বে তমুদ্দুন মজলিস গড়ে উঠে তাদের যে কার্যকলাপ হয় ঢাকা শহরে এটা অবিচ্ছেদ্য। এটাকে ছোট করে দেখার মত কোন উপায় যেমন' ৪৮ সালেরটাতো ছোট করার জায়গাই নাই এবং এটাকেও ছোট করে দেখার কোন উপায় নেই। এ পাবলিক অপেনিয়ন সব।

আবদুল গফুরঃ ধন্যবাদ। ১৯৫২ সালে যে একটা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ হয় এটা বোধ হয় ৩০ জানুয়ারি কোন একটা মিটিংয়ে না কত তারিখে যেন।
অলি আহাদঃ ৩০ তারিখে।

আঃ গফুরঃ সেখানে কারা কারা ছিলেন?

অলি আহাদঃ ব্যাপারটা হয়েছিল কি মুসলিম ছাত্রলীগের তরফ থেকে তারা আন্দোলনটা হউক এটা চায় নাই। সে না চাওয়াটা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের জন্য। শেখ মুজিবুর রহমান সাব তখন জেলখানায় আমি যখন যুবলীগের সেক্রেটারী হিসাবে আইসা উপস্থিত হইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে খালেক নেওয়াজ খান, জিজ্ঞাসা করলো কি করবেন? কি করতে চান অলি আহাদ সাহেব? আমি বলি করবো একটা কিছু, করতে হবে তো। করার জন্যই আছি। একটা কিছু করব, আপনারাও করবেন। সবাই মিলেই করবো। ইন দি মিন টাইম বুঝা গেল যে, তারা প্রিসাইড করবে। আমি সেটাতে রাজি না। মুসলিম ছাত্রলীগের কেউ প্রিসাইড করলে আন্দোলনটা বিক্রি করে দেবে আমার ধারণা তখন তাই। এটা কিছুতেই আমি রাজি ছিলাম না। কিছু বলি নাই তাদেরকে। আমি গাজীউল হককে ডেকে বললাম যে, আপনি মুকুলকে নিয়ে সেখানে একটা টেবিল পাতাইয়া মিটিং এ সভায় কে সভাপতিত্ব করবে ঘোষণা করে দেবেন। মুকুল ত্বরিত ছেলে। চট করে গিয়ে টেবিল একটা নিয়ে গিয়ে এটার উপর দাঁড়াইয়া বললেন যে, আমরা এখন এ সভায় প্রস্তাব করতেছি যে, গাজীউল হক সাব এ সভায় সভাপতিত্ব করবেন। এখনই সভা আরম্ভ। আমতলায় সভা এভাবে এটা গড়ে উঠে।

আবদুল গফুরঃ এটা তো হলো একুশে ফেব্রুয়ারির কথা।

অলি আহাদঃ না একুশে ফেব্রুয়ারীর আগে।

আঃ গফুরঃ না, একুশে ফেব্রুয়ারির ভোর বেলায় তো এটা।

অলি আহাদঃ না এটা হলো দ্বিতীয় বার, একুশে ফেব্রুয়ারির এটা হলো দ্বিতীয় বার। আর প্রথম বার হলো ওটা। গন্ডগোলটা ওখানে। কাজী গেলাম মাহবুব আইসা বললো যে, অলি আহাদ কাকে প্রিসাইড করতে বলবা আর প্রসেশান করবা? বললাম, না প্রসেশান তো করবোই, করতেই হবে। আর প্রিসাইড করবে কে, এটা এখনো ঠিক করতে পারি নাই। আপনারাও কি বলেন, দেখা দরকার। এর মধ্যে প্রস্তাব হয়ে গেল।

আবদুল গফুরঃ শিকদার সাহেব বোধ হয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, বার লাইব্রেরী হলে যে আপনাদের মিটিং হয়েছিল সেখানে কে সভাপতিত্ব করেছে?

অলি আহাদঃ সেটায় সভাপতিত্ব করেন মওলানা ভাসানী।

www.pathagar.com

আবদুল গফুরঃ ওখানে বোধ হয় কনভেনার .....

অলি আহাদঃ কনভেনার কাজী গোলাম মাহবুব।

আবদুল গফুরঃ এবং আপনারা মেম্বার ?

অলি আহাদ ঃ হ্যাঁ। আমরা মেম্বার।

আবদুল হাই শিকদারঃ এখানে প্রশ্ন, যেহেতু সর্বদলয়ি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনার ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব, কিন্তু আপনারা যখন মিটিংটা করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে, তখন এটা গাজীউল হক প্রিসাইড করলেন, এর রহস্যটা কি? কারণটা কি?

অলি আহাদঃ রহস্যটা হইলো আমরা তাহাদিগকে বিশ্বাস করি নাই। তারা বলতো আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করবো।

আবদুল হাই শিকদারঃ কাজী গোলাম মাহবুবরা?

অলি আহাদঃ কাজী গোলাম মাহবুবরা। তারা অর্থাৎ আওয়ামী মুসলিম লীগ বলতো, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করবো। শেখ মুজিবুর রহমান বলতো। তিনি তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছিলেন। তারা বলতো, আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করবো। শামসুল হক সাহেব ফাউন্ডার সেক্রেটারী। তিনি বলতেন, আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করবো। আতউর রহমান খান বলতেন আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করবো। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বলার অর্থ হলো ১৪৪ ধারাকে মাইনা নেওয়া, যদি সরকার দেয়। আমরা এটা মানার পক্ষে ছিলাম না। ঘোর বিরোধী ছিলাম। সে জন্যেই প্রিসাইড করতে যদি অন্য একজনকে দেই তাহলে মিটিংটা সেভাবেই নিয়ে যাবে। আর না হলে কিলাকিলি হবে। আমরা সেটা করেত চাই নাই।

আবদুল হাই শিকদারঃ এ মিটিংটার তারিখটা কতো? যে মিটিংয়ে গাজীউল হক সভাপতিত্ব করেন?

অলি আহাদঃ দুইটাতে, ৩০ তারিখও করেছে, ২১ তারিখও করেছে।

আবদুল হাই শিকদারঃ ৩০শে জানুযায়ী, আরেকটা হলো ২১শে ফেব্রুয়ারী ? এ দু'টা মিটিং এ গাজীউল হক সভাপতিত্ব করেছে?

অলি আহাদঃ গাজীউল হক প্রিসাইড করেছে।

আবদুল হাই শিকদার ঃ আচ্ছা, তাহলে একটা কথা, ইদানীং বলা হচ্ছে, এটা আমরা এখন একটু জানতে চাই আপনার কাছে, যে তমুদ্দন মজলিস আন্দোলনটা দাঁড় করালো, কিন্তু একটা পর্যায়ে '৫২ সাল থেকে দেখা যায় তমুদ্দন মজলিস আর এর মধ্যে নেই।

অলি আহাদঃ আমাদের হাতে কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ হয়ে গেল। তখন তমদ্দুন মজলিস যদি তাদের সাথে সায় না দিত, ইয়ুথলীগের সাথে সায় দিত, তাহলে আমরা তমদ্দুন মজলিসকে নিয়েই সে আন্দোলনটা আরম্ভ করতাম। আমরা তমদ্দুন মজলিসের লোকদেরই হয়তো বসাইয়া দিতাম যে, প্রিসাইড কর। যেহেতু আমরা বুঝে ফেলেছি, খালেক নেওয়াজ খান, কাজী গোলাম মাহবুব তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে এবং তারা মিটিংয়ে দাঁড়াইয়া যখন বলে দেবে, ১৪৪ ধারা আমরা ভঙ্গ করবো না। আমরা যতই বলি, একটা গ্রুপ ছাত্র-জনতা তাদের সমর্থন করবেই। আর একটা গ্রুপ আমরা করবো না। তাতে হতো কি ? আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। এটা প্রমাণিত হতো। তার জন্যই আমাদের পক্ষে তখন চিন্তা হইলো এইটা, আমাদের উপর আঘাত করার জন্য ১৪৪ ধারা দিলে পরে, নিয়ম ভঙ্গ তারা

www.pathagar.com

করলে, আমরাও নিয়ম ভঙ্গ করবো। এই কথা যদি তমদ্দুন মজলিস তখন ইয়ংগার জেনারেশনকে বলতো, তাইলে আজকে তারা নেতৃত্ব দিত।

আবদুল গফুরঃ আচ্ছা, এই যে ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারী একটা সভা হয়েছিল ইউনিভার্সিটিতে আপনি বলছেন, এটা কি আপনার বইতে আছে ?

অলি আহাদঃ আছে। হয় ৩০, না হয় ৩১ পৃষ্ঠায় আছে।

আবদুল গফুরঃ আচ্ছা আরেকটা মিটিং যে হয়েছিল, যখন ১৪৪ ধারা হঠাৎ ১৯ তারিখ বোধ হয় জারি করলো গভর্নমেন্ট।

অলি আহাদঃ ২০ তারিখ সন্ধ্যায় সময়।

আবদুল গফুর ঃ ২০ তারিখ সন্ধ্যার পরেই।

অলি আহাদ ঃ আমরা মিটিংয়ে বসলাম।

আবদুল গফুর ঃ একটা জরুরী মিটিং।

অলি আহাদঃ খুব ইমাজেন্সী মিটিং ডাকলাম, আবুল হাশিম সাহেব প্রিসাইড করলেন। ১১- আর ৪-এ ভোটাভূটি হলো।

আবদুল গফুরঃ অধিকাংশ লোক ভোট দিল বিরুদ্ধে।

অলি আহাদঃ ১১ জন ভোট দিলো ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা যাবে না। আর ৪ জন আমরা, ভাঙতে হবে। এই ৪ জনের একজন আমি, আবদুল মতিন, ফজলুল হক হলের ভাইস প্রেসিডন্ট জনাব শামসুল আলম এবং মেডিক্যাল কলেজের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম মাওলা। আমরা এই ৪ জন ভোট দেই ১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে। তোয়াহা সাব ভোট দেয় নাই। তোয়াহা সাব ঐদিকে ছিল।

আবদুল হাই শিকদারঃ গাজীউল হক ?

অলি আহাদঃ গাজীউল হক তো মেম্বারই ছিল না। তোয়াহা সাব মেম্বার ছিলেন ইয়ুথ লীগের তরফ থেকে আমরা দুইজন। গাজীউল হক আমাদের ইয়ুথ লীগের লোক, গাজীউল হক মেম্বার ছিলেন না। মেম্বার ছিলেন তোয়াহা সাহেব এবং আমি, আমরা দুইজন। মাহমুদ আলী সাব সিলেটে থাকতেন, সেইজন্য মাহমুদ আলী সাব হইতে পারেন নাই। মাহমুদ আলী সাব ঢাকা থাকলে তিনি মেম্বার হইতেন। আর গাজীউল হক সাহেব তো আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র।

আবদুল হাই শিকদারঃ এখানে কোশ্চেনটা হলো, ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ব্যাপারে আপনারা মাত্র ৪ জন পক্ষে থাকলেন, ভাঙতে হবে। আর ১১ জন থাকলো বিরোধী, যে ভাঙ্গা যাবে না। কিন্তু এই কমিটির মধ্যে গাজীউল হক ছিলো না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ২০ তারিখের মিটিংটা গাজীউল হক প্রিসাইড করেছে-

অলি আহাদঃ না।

আবদুল হাই শিকদার ঃ ২১ তারিখের মিটিংয়ে ....

অলি আহাদঃ বিশ তারিখের মিটিংয়ে আমরা ডিসাইড করেছি। ইউনিভার্সিটির ছাত্র, এটাতো ছাত্রদের মিটিং।

আবদুল হাই শিকদারঃ আচ্ছা আচ্ছা।

অলি আহাদঃ জনগণের মিটিং না। ছাত্র জনতা মিটিংয়ের মধ্যে তো, ছাত্রকে দেব, তার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তার মধ্যে প্রমিনেন্ট।

www.pathagar.com

আবদুল হাই শিকদারঃ তাহলে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে, ভাষা আন্দোলনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর একটা বড় ধরনের ভূমিকা আছে।

অলি আহাদঃ নিশ্চয়ই আছে। নিশ্চয়ই আছে। আগাগোড়া আছে।

আবদুল হাই শিকদার ঃ আর একটা ব্যাপার, ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে এখন কথা বলতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, কোন কোন গ্রন্থকার যেমন মাযহারুল ইসলামের মত লেখকরা, মুনতাসির মামুন, এ জাতীয় লোকরা। এরা দেখা যাচ্ছে যে ভাষা আন্দোলনে জেলখানা থেকে শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্ব দিয়েছে এ রকম কথাও লিখেছে।

অলি আহাদঃ এটা মিথ্যা কথা। এটা প্রশ্ন উঠে না, এমনকি শেখ মুজিবুর রহমান হাসপাতাল থেকে রিলিজ হওয়ার পরও চলমান আন্দোলনে সক্রিয় হয় নাই। তার নেতৃত্বে কোন নতুন আন্দোলনও গড়ে ওঠে নাই। ইতিহাস সাক্ষী, এসব লেখা চরম মিথ্যাচার। জাতির সাথে চরম প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। শেখ মুজিব নেতৃত্ব দিল কিভাবে? তার দল বলছে, আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করবো। আমরা ১৪৪ ধারা দিলে ভাঙ্গবো না। তিনি করবেন কোথায়? তারই লোক খালেক,নেওয়াজ খান, তারই লোক কাজী গোলাম মাহবুব, তারই লোক জনাব শামসুল হক, তারা বলছেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবো না, জেলখানা থেকে উনি নেতৃত্ব দিবেন, নেতৃত্ব দিতে হলে তো কারো মারফত নেতৃত্ব দিতে হবে, হয় দিবে খালেক নেওয়াজ খান ছাত্রলীগের যে জেনারেল সেক্রেটারী, না হয় দিবে শামসুল হক চৌধুরী যে নাকি ছাত্রলীগের একটিং প্রেসিডেন্ট, না হয় দিবে কাজী গোলাম মাহবুব যিনি কলিকাতায় তার সাথে কাজ করেছেন, না হয় দিবে উনারই জেনারেল সেক্রেটারী শামসুল হক সাব, না হয় দিবে তখনকার দিনের মুসলিম লীগের ১৫০ মোগলটুলীতে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন শওকত সাহেব, তারা দিবেন। না হয় মানিক মিয়া দিবেন যে ইত্তেফাকের তখন এডিটর ছিলেন। তারা তো সবাই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে ছিল। অতএব তিনি নেতৃত্ব দিলেন, এটা সর্বৈব মিথ্যা কথা, মিথ্যা, মিথ্যা, এবং এবসলিউটলি মিথ্যা।

আবদুল হাই শিকদার ঃ ইদানীং আর একটা কথা বলা হচ্ছে, বিভিন্ন মহল থেকে যারা হয়ত বিকৃত করছে তারাও বলছে যারা এটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে তারাও বলছে, যে ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে, এ বিকৃতিটা কিভাবে হচ্ছে এবং কোথায় কোথায় হচ্ছে ?

অলি আহাদঃ প্রথম প্রধান বিকৃতি হইলো শেখ মুজিবুর রহমানকে '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের নেতা হিসাবে চিত্রিত করা। এরপর আর বিকৃতির কোন শেষ নাই। ভাষা আন্দোলন তো পপুলার আন্দোলন। রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন ঐতিহাসিক আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন বিপ্লবী আন্দোলন, বিশেষ করে '৫২ সালেরটা, কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ হয়েছে। এটার থেকে শেখ মুজিব বাদ পড়ে যাবে এটা কখনো চিন্তা করা যায় না এবং শেখ মুজিবকে বাদ যাতে না যেতে হয় তার জন্য তার ছাত্র অর্গানাইজেশন, খাইয়া না খাইয়া, তার দলের লোক খাইয়া না খাইয়া মুজিবের যারা সমর্থক তারা প্রচেষ্টা করতে লাগলো যে, শেখ মুজিবুর রহমান জেলখানা থেকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এ সবই মিথ্যা কথা। সর্বৈব মিথ্যা। তো মিথ্যার বেসাতির সাথে দাঁড়ানো সম্ভব না।

আবদুল হাই শিকদারঃ আরো অন্যান্য বিকৃতির ব্যাপারে যদি একটু বলেন ?

অলি আহাদঃ আছে বিকৃতি, যেমন আতাউর রহমান খান। আতাউর রহমান খান যে

www.pathagar.com

আন্দোলনের দিন, একুশের আন্দোলনের দিন তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন, ময়মনসিংহ। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কমিটি যখন হয় তাকে কনভেনার করা হয়। যেমন আমরা জেলে যাওয়ার পর তাকে কনভেনার করা হলো রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের জন্য। সম্মেলন করার জন্য যে কমিটি হয়, সে কমিটিতে তাকে কনভেনার করা হয়। এখন সত্য কথা বললে তো অনেকের কাছে খারাপ লাগবে। তাহলেও আমারটা আমার বলে ফেলতেই হয় কে কি মনে করেন সেটা চিন্তা করার ব্যাপার নয়। মওলানা ভাসানী, উনাকে আমরা বললাম, হুজুর আপনি এখন দূরে যাবেন না। ১৪৪ ধারা নুরুল আমিন যেটা দিয়েছে, সেটা ভাঙতে হবে। তিনি বললেন, না আমি দুরে যাব না, তবে আমি একটু নরসিংদী থেকে ঘূরে আসি। তিনি ঢাকা ছেড়ে চলে গেলেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হলো, কিন্তু তিনি আসলেন না। এটাই আবার অনেকে যারা নাকি কমিউনিস্ট, যারা নাকি প্রগতিশীল দাবী করে, তারা বলে বেড়ায় যে, মওলানা ভাসানী সেদিন ছিলেন।

আবদুল হাই শিকদারঃ কিন্তু কোন কোন বইয়ে দেখা যায়, গায়েবানা জানাযায় পরের দিন তিনি .....

অলি আহাদঃ মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা। গায়েবানা জানাযা যখন করি তখন আমার বন্ধু আমার অর্গানাইজেশনের ইউথ লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন এডভোকেট এমাদুল্লাহ। এমদুল্লাহ সেই মিটিংয়ে প্রিসাইড করেন, গায়বানা জানাযাতে এক গায়েবানা জানাজা হয় কোথায় লেখে? সেটা বলেননি? সেটা মেডিক্যাল কলেজের ব্যারাকে। কখন আর হয় কইতে পারবে ? না। এই সব মিথ্যা কথার সাথে তো সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়। ইতিহাসে বিকৃতি তো হবেই। তখন বেলা দশটা কি এগারোটা।

আবদুল হাই শিকদারঃ একুশ তারিখে।

আবদুল গফুরঃ বাইশ তারিখে।

আবদুল হাই শিকদারঃ বাইশ তারিখে।

অলি আহাদ ঃ বাইশ তারিখে।

আবদুল হাই শিকদারঃ আন্দোলন কেন্দ্রিক যে শহীদ মিনার, শহীদ মিনারে প্রথম ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন তো মওলানা ভাসানী করেছিলেন।

অলি আহাদঃ মোটেই না। সেটা করেছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দিন সাহেব। আবুল কালাম শামসুদ্দিন সাহেব দৈনিক আজাদের যিনি এডিটর ছিলেন এবং পূর্ব বঙ্গ এসেমব্লীর মেম্বার ছিলেন, যা থেকে উনি রিজাইন করেছিলেন।

আবদুল হাই শিকদারঃ তাহলে আমরা একটা কথা বলতে পারি। যেমন ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত বা এ জাতীয় অনেককে নিয়ে আমরা কথা বার্তা বলছি। কিন্তু আবুল কালাম শামসুদ্দিনের এই যে একটি ঐতিহাসিক এবং যুগান্তকারী কর্ম এটার জন্য তো তাকে আমরা ভাষা আন্দোলনে অন্যতম সৈনিক বা একটা বিরাট ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি বলতেই পারি।

অলি আহাদ ঃ নিশ্চয়ই বিরাট ভূমিকা তো বটেই। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই তখনকার দিনে পূর্ববঙ্গ এসেমব্লীর সদস্যশীপ ছেড়ে দেওয়া একটা ইস্যুর উপরে? যে ইস্যু উনার মুসলিম লীগ সৃষ্টি করেছে। যে ইস্যু নুরুল আমিন সাহেব সৃষ্টি করেছেন। যে ইস্যু খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব সৃষ্টি করেছেন, যে ইস্যু মাওলানা আকরাম খাঁ সৃষ্টি করেছেন, সেই মাওলনা আকরাম খার পত্রিকা আজাদের এডিটর হয়ে, পদত্যাগ করা এর প্রতিবাদ করা এটা চাট্টিখানি কথা নয়।

www.pathagar.com

আবদুল হাই শিকদার ঃ আবার শেখ মুজিবের প্রসঙ্গে যাই। কোন কোন বইয়ে লেখা হচ্ছে যে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সেই বক্তৃতায় যখন তিনি বলছিলেন উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে তখন নাকি শেখ মুজিবুর রহমান নো নো করে উঠেছিলেন?

অলি আহাদঃ শেখ মুজিবুর রহমানের নো নো বলার সুযোগ কোথায়? এটাতো কনভোকশেন। কনভোকেশানে শেখ মুজিবুর রহমান আসবে কোত্থেকে। ঢাকা ইউনির্ভাসিটির ছাত্রই নন। তিনি ক্যালকাটা ইউনির্ভাসিটির ছাত্র। এ কনভোকেশানে তিনি কি করে যাবেন? অতএব এটা মিথ্যাকথা। এ মিথ্যাকে ভিত্তি করে মিথ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের সাথে শেখ মুজিবর রহমান প্রসঙ্গে যারা বলে তারাও জানেন মিথ্যা কথা বলছেন কিন্তু ওদের তো বলতে হবে।

আবদুল হাই শিকদারঃ ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রীক আমাদের দেশের যে সমস্ত বইপত্র আপনার চোখে পড়েছে এগুলোর মধ্যে আমরা কোনটাকে সবচেয়ে নির্ভরশীল বলতে পারি।

অলি আহাদঃ বেশি কথা হইয়া যাইবে। নির্ভরশীল তো আমি আমারটাই মনে করি। কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক আমার কিছু আসে যায় না। আমার একটা শব্দ তাদের যদি শক্তি থাকে তারা অস্বীকার করুক।

আবদুল হাই শিকদারঃ বদরুদ্দীন ওমর সাহেবের যে বইটা, এটার ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

অলি আহাদঃ বদরুদ্দীন ওমর সাহেবের বইকে একেবারে মিথ্যা বলা যাবে না শেখ সাহেব সম্বন্ধে অন্যখানে যেভাবে যেভাবে বলা হয়েছে একেবারে মিথ্যা সবই মিথ্যা বিকৃত, একথা বদরুদ্দীন ওমর সম্পর্কে বলা যাবে না। দুই/একটা ফ্যাক্টর এদিক সেদিক ভুল হতে পারে। ভুল, ভুলের কারণে হইতে পারে, এটার অন্য কোন কারণ আমি মনে করি না।

আবদুল গফুরঃ সেই যে একুশে ফেব্রুয়ারী শেষ হলো, এরপরে আপনারা সেই রাত্রেই গোলাম মাওলা সাহেবের রুমে বসেছিলেন না?

অলি আহাদঃ বসেছিলাম। গোলাম মাওলা না, আজমল।

আবদুল গফুরঃ যা হউক মেডিক্যালের একটা হোস্টেলে-

অলি আহাদঃ সেখানে আমরা শামসুল হক সাহেবকে আসার জনা বলেছিলাম, তিনি আসেন নাই।

আবদুল গফুরঃ ওখানে কারা কারা উপস্থিত ছিল?

অলি আহাদঃ গোলাম মাওলার কথা আমার মনে আছে। মতিন সাহেব আসেন

আবদুল গফুর ঃ গাজীউল হক ?

অলি আহাদঃ গাজীউল হকের তো প্রশ্নই আসে না।

আবদুল গফুরঃ কেন?

অলি আহাদঃ গাজীউল হক চলে গেল বগুড়া।

আবদুল গফুরঃ কবে ?

অলি আহাদঃ ঐদিনই। বরঞ্চ গাজীউল হক আমাকে খবর দিল যে আমার শরীর খারাপ হয়ে গেছে। আমি একথা শুনে, মেডিক্যাল কলেজ থেকে দৌড়াইয়া হন্তদন্ত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া উনাকে দেখলাম। একটা টেবিলের উপর শুইয়া আছে।

www.pathagar.com

আবদুল গফুরঃ একুশ তারিখে?

অলি আহাদঃ একুশ তারিখে।

আবদুল গফুরঃ কখন?

অলি আহাদঃ তখন বোধ হয় বেলা ৪টা কি সাড়ে ৪টা, তখন কিন্তু শীতের দিন। বেলা পড়তেছে। ৫টাও হইতে পারে। তো আমি বললাম যে, গাজীউল হক সাহেব, কি হইছে আপনার? বলে, জ্বর। বললাম, এরকম হয়, এতে কিছু আসে যায় না। আইসা পড়েন এখান থাইক্যা। এখন আমরা একটু বসবো, আপনি ইমপর্টেন্ট লোক, আপনাকে থাকতে হবে। বললেন, আচ্ছা, আসছি। কইয়া উনি আর আসলেন না। এরপরে আমি লোকশ্রুতিতে শুনলাম, তিনি বগুড়া চলে গেছেন।

আবদুল গফুরঃ উনি কি গ্রেফতার হননি একুশে উপলক্ষে? একুশে উপলক্ষে কারা কারা গ্রেফতার হলেন?

অলি আহাদঃ না, গাজীউল হক সাহেব একুশে উপলক্ষে গ্রেফতার হননি। গুলী হওয়ার পরে উনি ছিলেন, গুলী হয় আড়াইটা কি তিনটায় এমন হবে। অপরাহ্ন বেলায়, এই হইলো কথা। গাজীউল হক সাহেবের সাথে দেখা আর পাই নাই, উনি আসেন নাই। আমরা দেখি নাই, হয়ত ছিলেন কোথাও। কোথায় ছিলেন জানি না।

আবদুল হাই শিকদারঃ আর একটা বিষয় একটু আমরা জানতে চাই, সেটা হলো যে ভাষা আন্দোলনের একটা পর্যায়ে আপনি বলছেন যে, যদি জনক বা উদ্যোক্তা বলতে হয়, সেটা প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাশেমকে। পরবর্তী পর্যায়ে আপনারা যখন দায়িত্ব নিলেন, সে সময়ের আপোষহীন, সত্যিকারের, নেতৃত্বদানকারীর ভূমিকায় যে ক'জন ছিলেন, তাদের মধ্যে কাদেরকে আপনি, ক'জনকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন?

অলি আহাদঃ ২১ তারিখ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, প্রথমতঃ কে জি মোস্তফার বরাত দিয়া নাম বলতে হয়, উনাকে রেডিও থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেজি মোস্তফাকে, ভাষা আন্দোলনের নাম বললে, কার নাম বলবেন? অলি আহাদ। ২য় নাম বললে কার নাম বলবেন? অলি আহাদ আর মতিন। এরপরে? এরপরে জানি না। এটাই বলল, সরাসরি।

আবদুল হাই শিকদারঃ আচ্ছা, এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই। স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল '৭১ সালে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরবর্তীতে আমরা দেখলাম ২৫ মার্চের পরে বা ২৫ মার্চের রাতে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান বাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করলেন এবং আওয়ামী লীগরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল চারিদিকে। কেউ পালিয়ে এদিক সেদিক চলে গেল। এই যে আওয়ামী লীগের বিশৃংখল অবস্থা, সেই সময়কার ব্যাপারটা যদি আপনি বলেন, কেন এরকম হ-য-ব-র-ল করেছিল?

অলি আহাদঃ হ-য-ব-র-ল হওয়ার কারণ হলো, শেখ সাহেব কখনো কোন আন্দোলনকে কনসলিডেট করে দিতে পারেন নাই ছড়াইয়া ছিটাইয়া আন্দোলন করেছেন এটা ঠিক। এবং আন্দোলন হয়েছে, এটাও সত্য। শেখ সাহেব আত্মসমর্পণ করার পরে তারা চেষ্টা সত্ত্বেও শেখ সাহেবকে যখন সেনাপতি হিসাবে মাঠে নিতে পারেন নাই, তাদের মধ্যে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব এসেছে, কি করবে? আবার এটাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নাই, তাদের মোবিলাইজেশনের পিছনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর একটা সিংহ ভূমিকা ছিল। সেজন্য হাতছানি দিয়ে যখন দিল্লী ডাকে, তোমরা আসো, কি বলে এটাকে, বাস্তুহারা হও

www.pathagar.com

এবং আন্দোলনের গোড়াপত্তন কর, ভারত থেকে আমরা সাহায্য করবো। দিল্লী থেকে আমরা সাহায্য করবো, এ হাত ছানিতেও তারা, তাজউদ্দিন সাহেব তারা ছিলেন। তাই এই জন্য তারা ভারতে যাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখলেন। এখানে কনসলিডেট করার চেয়ে যেমন এটা আজকে অস্বীকার করবেন কিনা, করলে তো আমার কিছু আসে যায় না। আমি যেটা সত্য জানি সেটাই বলবো। ২৫ তারিখের হামলার পরে। তারপরে যখন ২ ঘন্টার জন্য কারফিউ তোলা হইলো, ২ ঘন্টা না কয়েক ঘন্টার জন্য কারফিউ তোলা হইলো, আমি একটা বেবীটেক্সী নিয়া গেলাম। বোধ হয় ২৬ তারিখে। যে তারিখেই হউক, আমি বেবীটেক্সী নিয়া চলে গেলাম। ২৬ না ২৭ বোধ হয়। চইলা গিয়া দেওয়ান সিরাজুল হক সাহেবের সাথে দেখা করলাম। আর সমস্ত শহরটা ঘুরে দেখলাম। আমার সাহস ছিল এজন্য যে, অবাঙ্গালী যারা অস্ত্র চালনা করছে, তারা আমাকে চেনে না। আর চিনে যারা তারা বাঙ্গালী। গোয়েন্দা বিভাগের লোক। সে গোয়েন্দা বিভাগের লোক আমাকে চিনবে কিন্তু ধরিয়ে দেবে না। এটা আমার একটা বিশ্বাস ছিল। সে জন্য আমি বাইর হয়ে গেলাম। ঘুরলাম। আসলাম আবার ফিরা। আবার গেলাম। সে অবস্থায় আমি আওয়ামী লীগের আ-ও দেখতে পাই নাই।

আওয়ামী লীগের আ না দেখলে তো আন্দোলন করা যাবে না। আন্দোলন করতে হলে আওয়ামী লীগ লাগবে। যেমন এখন বিএনপি লাগবে। এখন আন্দোলন করতে হলে বিএনপি ছাড়া হবে না। ঠিক তেমনি তখন আওয়ামী লীগ ছাড়া এ আন্দোলন করা সম্ভব ছিলো না। আমি দৌড়াইয়া চলে গেলাম আনিসুজ্জামান সাহেবের কাছে। আজাদের পরবর্তী কালের এডিটর, বর্তমানে বাসসের প্রধান। উনার এখানে গিয়া বললাম যে, কি করবেন? তো উনি বললেন, অলি আহাদ ভাই, কি করবো সব আওয়ামী লীগ ভাগছে। আমি বললাম, ভাগছে তো, কোথায় ভাগছে ? বলে, কলাতিয়া, বলি, কেন সেখানে? বলে, সেখান থেকে ইন্ডিয়া যাবে। তাহলে আপনি এক কাজ করেন, ওখানে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিল কোন হলের জানি, আমার ঠিক মনে নাই, সে ভাইস প্রেসিডেন্টকে বললাম, তো উনি বললো যে, কি করবো, আমি বললাম, আপনি যান কলাতিয়া, কলাতিয়া গিয়া আপনি তাদের সাথে আলোচনা করেন। কইরা তাদের ফেরত আনেন। আমরা এখানে রেজিস্টেন্স করবো। উনি বললেন যে, ঠিক আছে। আপনার তো ভাল প্রস্তাব, আমি যাই। উনি গেলেন। গিয়া ফিরা আসলেন। পরের দিন আইসা বললেন যে, আমি কলাতিয়া গিয়া তাদের পাই নাই। তারা সব ইন্ডিয়াতে চলে গেছে। এটাই হলো, তারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার মূল কারণ।

আবদুল হাই শিকদারঃ আচ্ছা এমন কি আপনার মনে হয়, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান অর্থাৎ সে সময়কার জিয়াউর রহমান যদি স্বাধীনতার ঘোষণাটা না দিতো, তাহলে কি আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করতো?

অলি আহাদঃ স্বাধীনতা সংগ্রাম ইন্দিরা গান্ধী তার প্রয়োজনেই করাতো, অতএব সেখানে অলি আহাদ যাক, তাজউদ্দিন আহমদই যাক, আর মেজর জিয়াই যাক আর ভাসানীই যাক সেটা হইতোই।

আবদুল হাই শিকদারঃ আচ্ছা এই যে, তড়িঘড়ি করে মুক্তিযুদ্ধটাকে হঠাৎ করে একসময় দেখা গেল যে, ইন্ডিয়া এর মধ্যে ইনভলভ হলো, সরাসরি, একদম সৈন্যসহ যুদ্ধ ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করে দিল। এই তাড়াহুড়া করার কারণটা কি ছিল? এটাকে গণযুদ্ধে রূপ না দিয়ে এভাবে মাঝ পথে .....।

www.pathagar.com

অলি আহাদঃ আমি সেটার পক্ষেই। কারণ, ভারত যদি না আসত তা হইলে পরে, মিছমার হইয়া যাইতো সব। আবার যারা নাকি গেরিলা যুদ্ধ বলতেছিল, যেমন আ স ম আবদুর রব, তারা যুদ্ধের বেলায় কিছু নাই। এলাকায় আসতো না। তাদের সাথে আমার কথা হইছে, আগরতলাতে। তারা থাকতো সেখানে আর গেরিলা যুদ্ধ করলেই, এটা ২০ বছর ২৫/৩০ বছরের ভিতরে, এর মধ্যে মানুষ শেষ হইয়া যাইতো। জানে, মানে, ধনে, বলে, জনে এখানকার সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যেত। এই জন্যই ইন্দিরা গান্দীর এই হস্তক্ষেপটাকে আমি খুব সমর্থন করি। অতএব এটাকে আমি তাড়াহুড়া মনে করি না। যারা মনে করে তাদের জিজ্ঞাসা করেন।

আবদুল হাই শিকদারঃ আপনার এই সমর্থন করা, তাহলে, এই যে স্বাধীনতা যুদ্ধে মওলানা ভাসানীকে অন্তরীণ বা গ্রেফতার করে রেখেছিল ইন্ডিয়া, এটার ব্যাপারে আপনার বক্তব্য?

অলি আহাদঃ মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করে রাখা বা অন্তরীণ করে রাখা এজন্য যে, মওলানা ভাসানী যেহেতু মওলানা ভাসানী, তাহলে তখনকার স্বাধীন বঙ্গদেশের প্রেসিডেন্ট তাকেই ঘোষণা করতে হয়। মওলানা ভাসানীকেই করতে হয়। ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়োজনে যেহেতু এই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ তার প্রয়োজন ছিল, সেহেতু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘোষণা করা হইলো প্রেসিডেন্ট। আর একটিং প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করলো নজরুল ইসলাম সাবকে। প্রাইম মিনিস্টার তাজউদ্দিন আহমদকে। তারা তার হাতের মধ্যে ছিল। তো মওলানা ভাসানী তার হাতের মধ্যে নয়। সে জন্য তাকে গ্রেফতার করে রাখলো। তাকে হেয় করে রাখা হলো। ইচ্ছা থাকলেও তিনি কিছু করতে পারলেন না।

আবদুল গফুরঃ কিন্তু এ পাওয়াকে কি পূর্ণ পাওয়া বলা যায় ?

অলি আহাদঃ পূর্ণ স্বাধীন দেশ পাইতে দেরী হইলে ধনে জনে, বলে শেষ হয়ে যাইতে হইতো। সুতরাং পূর্ণ স্বাধীনতা পাইতো কি পাইতো না, সেকথা বলাও কঠিন। এখানে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আমাদেরই প্রয়োজনে। ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়োজনে। আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি এবং এটা আমি মনে করি জডিসাস ডিসিশান। এই ডিসিশানের ফলে বাংলাদেশ আজকে স্বাধীন হিসাবে আমরা আছি। আমার কোন কনফিউশান এ ব্যাপারে নাই।

আবদুল গফুরঃ আচ্ছা, একটা ব্যাপার দেখা যায় একটা বইতে যে, ১৯৭১ সালে যখন মুজিব নগর সরকার ওখানে ছিল, ইন্ডিয়ার সয়েলে, তখন মুজিব নগর সরকারের একটিং প্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম এমন একটা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ৭ দফা চুক্তি হিসাবে, যাতে বলা ছিল যে, মুক্তিবাহিনী ইন্ডিয়ান কমান্ডের অধীনে থাকবে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বাংলাদেশের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী থাকবে না। তারপর এখানকার যারা ব্যুরোক্রেটস রয়েছে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা রয়েছে, তাদের যারা মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করে নাই, তাদের রিটায়ার করিয়ে দেয়া হবে। প্রয়োজনবোধে শূন্যপদ ইন্ডিয়ান কর্মকর্তাদের নিয়ে পূরণ করা হবে এবং পররাষ্ট্রনীতি নেয়ার সময় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হবে। এ ধরনের অনেকগুলোই ছিল। তো এই যে চুক্তিটা স্বাক্ষর করার একটা সুযোগ পেল, এটা তো ইন্ডিয়ার মাটিতে ছিল বলেই। এবং ইন্ডিয়ার চাপ ছিল বলেই, এটা সত্য না?

অলি আহাদঃ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। এখানেই তো বেশকম। যদি মওলানা ভাসানী হইতেন প্রেসিডেন্ট প্রভিশনাল গভার্মেন্টের, প্রভিশনাল রাষ্ট্রের, স্বাধীন রাষ্ট্রের, তা হইলে ইন্দিরা গান্ধী যে চুক্তি ৭ দফা সই করায়ে নিয়েছিলেন সেটা করাতে পারতেন না। সেই জন্যেই

www.pathagar.com

ইন্দিরার স্বার্থেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর স্বার্থেই মওলানা ভাসানীকে অন্তরীণ করা হয়েছিলো। ইন্দিরা গান্ধীর স্বার্থেই আমরা তার কাছে মাথানত করেছি। এখানে ঐ বৃটিশের আমলে সিরাজদ্দৌলা যে ভূমিকা পালন করেছিল, মওলানা ভাসানী সে ভূমিকা পালন করেছেন। আর যে ভূমিকা মীর জাফর পালন করেছেন সে বৃটিশের আমলে, সে ভূমিকাই পালন করেছে তাজউদ্দিন এবং নজরুল ইসলাম তারা। সেই জন্য দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব পুরোপুরি না হলেও মোটামুটি কম্প্রোমাইজ করে নেয়া হয়েছে।

আবদুল গফুর ঃ আচ্ছা, আর একটা প্রশ্ন, আমাদের ইতিহাসের পটভূমি যখন বিশ্লেষণ করতে দেয়া হয়, কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী আছেন; তারা বলতে চান, পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বা আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিকাশের কোন সম্পর্ক নেই এবং যে লাহোর প্রস্তাবের কথা বলা হয়, অনেকে বলে যে, লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন হয়েছে; লাহোর প্রস্তাবের একটা অংশ '৪৭ সালে বাস্তবায়ন হলো পার্টিশন অব ইন্ডিয়া। আর একটা বাস্তবায়িত হলো যে, ঐ দুই অংশের দুটো স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে। আচ্ছা, এই যে ব্যাপারটা তারা বলতে চান যে, লাহোর প্রস্তাবের সাথে বাংলাদেশের অস্তিত্ব বা বাংলাদেশ সৃষ্টির কোন সম্পর্ক নাই। এ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ?

অলি আহাদঃ লাহোর প্রস্তাব না হলে পাকিস্তান হতো না। দিল্লী কনভেনশনের প্রস্তাব না হলে পাকিস্তান হতো না। পাকিস্তান না হলে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অংশ হতো না। অর্থাৎ আমরা দিল্লীর সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকতাম, অখন্ড ভারতের অংশে থাকতাম, অখন্ড ভারতের অংশ হিসাবে পশ্চিম বঙ্গ আছে তারা কি স্বাধীনতা পেয়েছে? নাকি স্বাধীনতা যুদ্ধ করতে পারছে? আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ করতে পেরেছি, যেহেতু পাকিস্তান হয়েছিল, সেহেতু পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হয়েছে। যদি আমরা পাকিস্তান না হয়ে বা পাকিস্তান হওয়ার পরও যদি ভারতের অধীনে থাকতাম অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সাথে থাকতাম তাহলে সমস্ত বঙ্গদেশই আজকে হিন্দুস্তানের পদতলে থাকতো। অতএব যে যা বলুক না কেন, এটা হলো, জ্ঞানপাপীদের কথা। এর মধ্যে একজন আছে শওকত ওসমান। শওকত ওসমানের কাছে আমার প্রশ্ন, জনাব, ভারত বিভক্তির পরে আপনারা সুন্দর দেশটিতে থাকলেন না কেন? আপনাদের মত এরকম বহু লোক এসেছেন এখানে। এখানকার কলাটা, মূলাটা চোষার জন্য এবং খেয়েছেন আপনারা। আবার এখন উল্টা বাক্য আওড়ান। উল্টা বাক্য যখন তো দয়া করে দিল্লীতে যান, পশ্চিমবঙ্গে যান, পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতা চান। তাহলে বুঝবো ওখানের বাঙ্গালীরা স্বাধীনতা চায়। কিন্তু ঐ বাঙ্গালীরা স্বাধীনতা চান না। আপনারা অখন্ড ভারত চান। আমাদের পরাধীনতা চান। এপরাধীনতার জন্য কি আমরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে, '৪৭ থেকে আরম্ভ করে বহু ত্যাগ করেছি, বহু জেল খেটেছি, বহু কষ্ট করেছি? নিজের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক্সপেল করে দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আর পড়তে পারলাম না। বিদেশে আর পড়তে যাইতে পারলাম না। যেহেতু এখানকার এক্সপালশান আছে আমার। সেহেতু এ রেফারেন্সে সেখানে আর হয় না। বার এট ল' পড়তে পারিনি। কিন্তু আপনারা কোনটা খাননি? কোন কলাটা, মলাটা খাননি? পরাধীন থাকতেও আবার কলাটা, মুলাটা পাবেন। এখানে আইসা আমাদের দয়া করে জ্বালাতন না করে বাঙ্গালী দাবী করেন, তা না কয়ে দয়া করে পশ্চিমবঙ্গে যান, পশ্চিমবঙ্গে গিয়া ঐটাকে স্বাধীন করে আসেন। জ্যোতি বসুর সাথে কথা বলেন। আমি দেখতে চাই কেমন ব্যাটাডা হয়েছেন আপনারা। আমাকে

www.pathagar.com

বলেন, আমি পারবো। আমি আগরতলায় আপনার মত পন্ডিতদের বলেছিলাম যে, আমরা একটা কথা জিজ্ঞাস করি। আমরা রাওয়ালপিন্ডি, করাচীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে, আপনাদের এখানে আশ্রয় নিতে এসেছি যুদ্ধ করার জন্য। আপনারা এখন পশ্চিমবঙ্গের সাথে, পশ্চিমবঙ্গকে বলেন, আপনার ত্রিপুরায় বাঙ্গালী বেশী, আপনারা বলেন, আমরা দিল্লীর অংশ হিসাবে থাকবো না। আমরা অখন্ড ভারতের অংশ হিসাবে থাকবো না। আমরাও স্বাধীনতা চাই, সার্বভৌমত্ব চাই, বাঙ্গালীদের জন্য। যেমন শরৎচন্দ্র চেয়েছিল, যেমন সোহরাওয়ার্দী সাহেব চেয়েছিলেন, যেমন কিরণ শংকর রায় চেয়েছিল, যেমন এস এম দাশ গুপ্ত চেয়েছিল। আপনারা দয়া করে এটা করেন। এখন সুযোগ আছে। কিন্তু সাহেব বলে, না এটা আমরা করবো না। আমরা অখন্ড ভারতের সদস্য হিসাবে নিজেদেরকে গর্ববোধ করি ।

আবদুল গফুরঃ আচ্ছা একটি জিনিস তাহলে দেখছি, আপনার কথায় আমরা এটা বুঝতে পারছি, পাকিস্তান আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির আন্দোলনের সবগুলো ঘটনা একটার সাথে একটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

অলি আহাদঃ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই জড়িত।

আবদুল গফুরঃ তাহলে লাহোর প্রস্তাবের সাথে আমাদের বাংলাদেশের যে ইমার্জেন্স এটার একটা অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

অলি আহাদঃ নিশ্চয়ই আছে, লাহোর প্রস্তাব না হলে তো পাকিস্তানই হতো না। অখন্ড ভারত থাকতো। ভারত খন্ডিত হতো না। লাহোর প্রস্তাব না হলে পূর্ববাংলা স্বাধীন হতো না। আমরা চেয়েছি বঙ্গদেশকে, আমরা চেয়েছি আসামকে, একত্রে মিলে লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী। কিন্তু আমরা আসাম, বেঙ্গল দুইটার কোনটাকে পাইনি, না পেলেও তো এইটুকু আমরা স্বাধীন হয়েছি। আমার এই জায়গাটুকুতে আমি আজকে স্বাধীন। যে স্বাধীনতার ফল, আজকে ধানমন্ডিতে বসে কথা বলি, এটা একটা বাজার ছিল। ধানমন্ডি অর্থাৎ ধানের বাজার। আর চতুর্দিকে ছিল ধানক্ষেত। সে জায়গা আজকে অট্টালিকাপূর্ণ। আমার দেশে আজকে যে অবস্থা চট্টগ্রামে হয়েছে মংলা পোর্টে হয়েছে। এমনকি সমস্ত দেশব্যাপী যে উন্নতি হয়েছে, এটা একটি মাত্র কারণ, পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল। লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তান হওয়ার পরে বাংলাদেশ স্বাধীন আজো আছে, যদিও নানা ষড়যন্ত্র চলছে, দিল্লীর পদতলে পুরাপুরিভাবে নিয়ে নেওয়ার জন্য।

আবদুল গফুর ঃ আচ্ছা এ ধরনের কি একটা ষড়যন্ত্র আপনি মনে করেন, এই যে সম্প্রতি পার্বত্য চুক্তি একটা স্বাক্ষরিত হয়েছে আজকে একুশের মাসে, একুশে ফেব্রুয়ারীতে, আপনি একুশের একজন ভাষা সংগ্রামী, আপনার দৃষ্টিতে চুক্তির সাথে একুশের চেতনার সম্পর্কটা কি?

অলি আহাদ ঃ একুশের চেতনা স্বাধীনতার দিকে আমাদের ধাবিত করে। সার্বভৌমত্বের দিকে ধাবিত করেছে। বাঙ্গালী এক জাতি প্রমাণ করার জন্য। আর আমাদের কাছে সে একুশের চেতনাকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য এই পার্বত্য চুক্তি করা হয়েছে। এ চুক্তির অর্থ আগামী দিন সেই গেট ওয়ে টু, কি বলে এটাকে?

আবদুল গফুর ঃ সেভেন সিস্টারস।

অলি আহাদ ঃ গেট ওয়ে টু সেভেন সিস্টারস হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং গেট ওয়ে চিটাগাং পোর্ট, এ বিবেচনায় গেট ওয়ে টু চিটাগাং পোর্ট বলেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে আমাদের অংশ হিসাবে দিয়েছে। আজ এটাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হিন্দুস্থান যাতে নাকি একটা

www.pathagar.com

পর্যায়ে গিয়া সার্কেল চীফ এবং যে সকল চুক্তি করা হয়েছে চুক্তিগুলির ধারা অনুযায়ী এক জায়গায় গিয়ে দাড়াবে যে তারা বলবে, আমরা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট ঢাকার নির্দেশ আর মানবো না। তারপর তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করায় ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকবে দিল্লী। দিল্লী সঙ্গে সঙ্গে তাকে রিকোগনেশন দিয়ে দিবে। মানতে হবে, তাই মানতেছে, তাদের কোন ইন্ডিপেডেন্ট, স্বাধীন কোন ভূমিকা নাই।

আবদুল হাই শিকদার ঃ স্বাধীন কোন ভূমিকা নাই বলতে চাচ্ছেন, কিন্তু আপনারা যারা বিরোধী দলে আছেন, তাদের কাছ থেকেও তো আমরা তেমন কোন কার্যকর, যেমন জনসভার কথা বলতে পারি আমরা, জনসভার ব্যাপারে কিছু প্রেসক্রিপশন দিয়েছিল গভর্নমেন্ট, এখানে করতে পারবে, এখানে করতে পারবে, এখানে করতে পারবে না, রাস্তায় নামলে লাঠিপেটা এবং প্রচুর সংবাদপত্রের উপর দমন হয়েছে, দৈনিক বাংলার মত পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অনেকে আমরা ছুরিকাহত হয়েছি, কাউকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এ রকম টোটাল বাংলাদেশে মানবাধিকারের উপরে যুক্তরাষ্ট্রের যে পররাষ্ট্র দফতর তারাও একটা রিপোর্ট পেশ করেছে, কিন্তু ৭ দল থেকে এ রকম কার্যকর মানবাধিকারের ব্যাপারে আপনাদের ভূমিকাটা আপনি বলবেন? এগুলো প্রতিরোধের ব্যাপারে আপনারা কি করছেন ?

অলি আহাদঃ মন্তব্য করার সময় আসে নাই।

আবদুল হাই শিকদারঃ না, আমরা যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা হলো যে, টোটালী আপনারা কি করতে যাচ্ছেন, রাজনীতি গণতন্ত্র ও দেশের জন্য।

অলি আহাদঃ করতে তো চাই একুশে ফেব্রুয়ারীর মত ,পারছি কোথায়?

আবদুল হাই শিকদারঃ তাহলে আপনি কি আশাবাদী না হতাশ?

অলি আহাদঃ আমি যখন বাচ্চাকাল থেকে বিভিন্ন আন্দোলনে সংগ্রামী ভূমিকা মোটামুটি রেখে আসছি, আমার তো হতাশ হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

আবদুল হাই শিকদারঃ আচ্ছা আর একটা ব্যাপার এই পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে যেহেতু প্রসঙ্গটা এসে গেছে, ঐ প্রসঙ্গেই কথা বলি, সেটা হলো যে পার্বত্য চট্টগ্রামের চুক্তিটাকে আপনারা বলেছেন যে এটা স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং সংবিধান বিরোধী, এখন এ চুক্তি প্রতিরোধের ব্যাপারে একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে আপনার নিজের দল এবং বিএনপি, জামায়াতসহ ৭ দলের তেমন কোন কার্যকর ভূমিকা আমরা দেখলাম না। আপনারা হরতাল করেছেন অবশ্যই, কিন্তু জাতীয়ভাবে যেদিন চুক্তিটা হলো সে দিন থেকে শুরু করে কথা ছিল যে, বাতিল না হওয়া পর্যন্ত হরতাল চলবে, অর্থাৎ সেদিন হরতাল থাকবে। এবং ঈদের পরে কঠোর কর্মসূচী দেবেন, তো আমরা কোথাও কোন পর্যায়ে এরকম কোন আলামতও দেখছি না। এর মানে কি এই যে আপনারা এটা মেনে নিয়েছেন, নাকি?

অলি আহাদঃ এর উপরে মন্তব্য করার সময় এখনো আসে নাই।

আবদুল হাই শিকদার ঃ তাহলে এটা কি আমরা এটুকু আশ্বস্ত হতে পারি, এই যে, আপনারা এ চুক্তিটাকে মেনে নিচ্ছেন না, নাকি মেনে নিয়েছেন?

অলি আহাদঃ মেনে নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। মেনে না নেওয়ার পরে যে ধরনের সক্রিয় কাজ অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারীর মত করা সেটা হয়ত আমরা করতে পারি নাই। বা করি নাই। কিন্তু মেনে নেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

আবদুল হাই শিকদারঃ বর্তমান সরকারকে এ পার্বত্য চুক্তি করার পরে আপনি মানে

www.pathagar.com

আপনাকে যদি বলতে বলা হয়, এ ব্যাপারে টোটাল একটা মন্তব্য করেন, তো এ সরকার সম্পর্কে আপনি কি বললেন? এ চুক্তি শত বিরোধিতা সত্ত্বেও তো তারা করলো।

অলি আহাদঃ দিল্লীর বশংবদের পক্ষে আর কি উপায় ছিল ? এ সরকার দিল্লীর বশংবদ এটা মানেন কি-না ? এটা মানার উপর নির্ভর করবে সব কিছু। আমি মনে করি এ সরকার সেবাদাস সরকার। আমি এটা মনে করি, সেবাদাস সরকারের পক্ষে, যেমন মীর জাফরের পক্ষে সম্ভব ছিল না ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার যেমন চেষ্টা করে ওঁ আঁ করেও (মীর জাফরের জামাইটার নাম কি ভুলে গেলাম) মীর কাসেম, চেষ্টা করে ও আঁ করেও শেষ পর্যন্ত মাইনা নিতে হয়েছিল। এ জন্যই শেষ পর্যন্ত মাইনা নিতে হয়েছে। টিকে নাই। আমার বক্তব্যটা হলো; এখন ধরেন সিকিমে লেন্ডুপ দর্জি যে অপজিশানটা বিল্ডআপ করে, তারাও পার্লামেন্টে আসে, সে পার্লামেন্ট দিয়েই সিকিমকে ভারতের অংশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। আজ এখানেও শেখ হাসিনা লেন্ডুপ দর্জির যে ভূমিকা সে ভূমিকাতে অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ তার পক্ষে বা দিল্লীর দালালের পক্ষে অন্য কিছু চিন্তা করার কোন স্থানই নাই।

আবদুল হাই শিকদারঃ এই যে পানি চুক্তি যেটা হয়ে গেল, এর আগে এই পানি চুক্তি করিডোর, ট্রানজিট এসব নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে, আপনার নিজের বক্তব্যও আমরা পাঠ করেছি, তা এই সবটা টোটাল বিচারে বাংলাদেশের বর্তমান সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপারে আপনার মূল্যায়নটা আমরা জানতে চাচ্ছি।

অলি আহাদঃ সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা হলো, বিদেশের দালালী করা যা দিল্লী সিদ্ধান্ত করে দেবে, তাই তাদের। দিবে এ জন্য যে, দিল্লীর এই চিটাগাং পোর্টের প্রয়োজন আছে। বে অফ বেঙ্গলের উপর যে চিটাগাং পোর্ট এই চিটাগাং পোর্টের তাদের প্রয়োজন আছে। তাদের এই সেভেন সিস্টার-এর ৭টা রাজ্য, এই ৭টা রাজ্যের জন্য ইমপোর্ট বলা হউক এক্সপোর্ট বলা হউক, এগুলো সম্পূর্ণ চিটাগাং পোর্টের মারফতে করতে হবে। সুতরাং চিটাগাং পোর্টকে তাদের প্রয়োজন আছে। এখন তারা একটা পর্যায়ে গিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাধীনতা পর্যন্ত দেওয়ার পরে চিটাগাং পোর্ট আমাদের ব্যবহার করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সেটা লিখে দিবে। এখানে বিগ ব্রাদার এটিচুড যেটা সে বিগ ব্রাদার এটিচুডটাই কাজ করবে যা আমাদের সমূহ ক্ষতি। বাংলাদেশকে পরাধীন করার জন্য এটা একটা সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র এবং এই ষড়যন্ত্রই কার্যকরী হতে যাচ্ছে। কোশ্চেন অব টাইম, কত দিনে হবে সেটা হলো বক্তব্য।

আবদুল হাই শিকদারঃ বাংলাদেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? কি হবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ, একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ? বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তের দেশের প্রবীণতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কণ্ঠে এর মূল্যায়ন কি হবে একটা ভবিষ্যদ্বাণী জানতে চাই।

অলি আহাদঃ বাংলাদেশের কিছু ভবিষ্যৎ নেই। আপামর চরিত্রহীনতায় ভরা। স্বার্থপর চরিত্রহীনতা কোন দিনও জাতিকে গড়তে দেবে না। এটা আমি জানি, আমার এ কথাতে অনেকে খুব রাগ হবে, গালাগালিও করবে, তারপরেও আমি যে অবস্থা দেখছি, চারিত্রিক পরিবর্তন না আসলে, আসবে বলে আমি দেখতেছি না, এ দেশের পরিবর্তন হবে না। হ্যাঁ, পরিবর্তন একটা হয়েছিল, ১৫ আগষ্ট। সেই বীররা যদি, তারা বীর কি-না জানি না, লেখাপড়া কতদূর জানতো জানি না। তবে ১৫ আগষ্টে যে পরিবর্তন আসছিল, সে পরিবর্তন ধরে রাখলে আজকে এ অবস্থা হতো না। ১৫ আগস্টের আগে ও পরে যে সকল সরকার আসছে, সবাই চোর ছিল এবং লুটপাটের পুরা অংশীদার ছিলেন। লুটপাটও করবো, আর্দশও প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

করবো, জাতিও বাঁচাবো, সেটা কখনো হয় না। অতএব, আমার এ সকল মন্তব্য থেকে আপনারা বুঝে নেন, কি বলতে চাই আমি।

আবদুল হাই শিকদারঃ এখানে তাহলে একটা কথা আপনি নিজে বলেছেন যে, আপনি আজীবন আশার রাজনীতি করেছেন। কিন্তু আপনি এখন যে মন্তব্য করলেন, এটার মধ্যে আমরা আশার কোন আলো দেখতে পাচ্ছি না।

অলি আহাদঃ কারণ, আমি সেই কায়দে আযমের নেতৃত্বও দেখি না, যে নেতৃত্বে পাকিস্তান করেছি। আমরা জয় প্রকাশের নেতৃত্বও দেখছি না, যে নেতৃত্বে চরিত্রও দেখা যায়। আমরা আবুল হাশিম সাবের নেতৃত্বও দেখি না, যে নেতৃত্বে আমরা আদর্শ শিখেছি। আদর্শের যে হাওয়া ছিল, সেটা পুরা পুরি বিদায় নিয়েছে। এখন রাজনীতির অর্থই হলো চরিত্রহীনদের রাজনীতিক কাজ। এ হলো সাধারণ লোকের ধারণা। সাধারণ লোকের ধারণা হউক আর না হউক, যে অবস্থায় আছে, সেখান থেকে চরিত্রহীনতা প্রকাশ পাচ্ছে। এ হলো দেশের অবস্থা এ অবস্থায় দেশের কাছে কোন পরিবর্তন আশা করাটা অন্যায়। সেই একনিষ্ঠ সংগ্রামী চরিত্র, সেই চরিত্রবান পুরুষের স্থান কোথায়? কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ থাকলে এবং এই আন্দোলনে তিনি গাইড করলে পরে তাহলে হয়ত চরিত্র আমরা কিছু দেখতে পেতাম। আন্দোলন মানে পাকিস্তান হওয়ার পরও কিছুকাল যদি বেঁচে থাকতেন, শেখ সাহেব দূর্নীতির দায়ে তো তখন তারও মামলা হয়েছিল, সাজাও হয়েছিল। শেখ সাহেবের সময় ৩ পয়সার পোস্টকার্ডে দুর্নীতি দমন করা হবে, গ্রেফতার করা হবে বলা হয়েছিল, ৩ পয়সার পোস্ট কার্ড বহু লেখা হয়েছিল। কোন কিছু হয় নাই মধ্যে থেইকা যারা চিঠি পোস্টকার্ড লিখেছিল, বরং তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেলেন। এ রকম চরিত্রহীনতা, সেই দেশে বৈপ্লবিক চিন্তা করা, চরিত্রের কথা চিন্তা করা, আদর্শের কথা চিন্তা করা, খোলাফায়ে রাশেদিনের সমাজ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা, সে কথা কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।

আবদুল হাই শিকদারঃ উদ্ধারের উপায়টা কি ? একটা নির্দেশনা আমরা আপনার কাছে চাই। কি রেখে গেলেন পরবর্তী নিশানবরদারদের জন্য।

অলি আহাদঃ যারা জিয়াউর রহমানের সরকার করেছেন, শেখ সাবের সরকার করেছেন। উল্টিয়ে দে মা লুটেপুটে খাই, এ অবস্থা শেখ সাবের সময় হয়েছে। শেখ সাবের পরে জিয়াউর রহমান সাহেব। খন্দকার মোস্তাকের অল্প কয়দিন ৮৩ দিন এটা হইলো স্বর্ণযুগ। আবার সাত্তার সাবের সময়, তখন একটা এডমিনিস্ট্রেমন এসেছিল। তারপর তাকে বিদায় দেয়া হলো। জিয়াউর রহমানের সময় কোন এডমিনিস্ট্রেশন ছিল না। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সৎ ছিলেন এর মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। আমরা যতটুকু শুনেছি। কিন্তু এডমিনিস্ট্রেশনে ছিল চোর, দুর্নীতিবাজ। আবার এরশাদের সময় তো এটা প্রশ্নই উঠে না দুর্নীতি ছাড়া তো কোন কথাই ছিল না। সেখানে তারপরের সরকার, আমার বলার দরকার নাই, আমি না বললেও যারা বুঝার, যারা জানার তারা জানে। আমি সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করবো না। তারপরে যে সরকার, একজনে তো এক মন্ত্রী ৮০০ কোটি টাকা হোয়াটইট করে নিয়েছেন। কোথায় পাইলো টাকাটা ? ৮০০ কোটি টাকা হইয়া গেল কেমনে ? উনি তো কার পোলা আমি জানি, তিনিও জানেন। কি আরম্ভ হয়েছে। বিশেষ করে গ্যাস এবং তেলের ব্যাপার নিয়া, টাকার খেলা কি জিনিস-সে জিনিসটা আর কিছু দিন পরে, সবাই জানতে পারবে। এটা জানার বোধ হয় বিশেষ বাকীও নাই বর্তমানে। বর্তমানে সেই জন্য আমি বলেছি যে, এ সরকার গণভোট

www.pathagar.com

দিলে ৯০% ভোট তার বিরুদ্ধে যাবে। মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে থাকবে। তার পক্ষে ভোট পড়বে না একটাও। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে। মাফ চেয়ে পার পাওয়া যাবে না। এর মধ্যে নিদের্শনা একটাই, এখন সেই চরিত্র চাই, কিভাবে আসবে আমি জানি না। আমি কোন পথ দেখি না। আর কি বলবো।

আবদুল হাই শিকদারঃ আরেকটা কথা, আপনি আজাদ বাংলার কথা বলছিলেন, দেশ স্বাধীনতার পরে। সে আজাদ বাংলার কারণ ছিল কি, ফিলোসোফিটা কি ছিল?

অলি আহাদঃ আজাদ বাংলার ফিলোসফিটা ছিল যে, হিন্দুস্তানের পদতল হতে বের করা এবং আজাদ শব্দটা একটা কনোটেশন আছে। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের কনোটেশান একটা শব্দই কেরি করে। তার সাথে জীবনের মূল্যবোধ জড়িত আছে। তার সাথে আরো অন্যান্য মূল্যবোধ জড়িত। সব মিলাইয়া সামাজিক মূল্যবোধ, জীবনের মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক মূল্যবোধ, এসব কিছু মিলেই আজাদ শব্দটার আমরা ডাক দিয়েছি। আমরা তখনকার দিনে, ভারতের যে দাপট আমাদের ওপর দেখতে পেরেছি, সেই দাপটকে বাধা দেয়ার জনা একটা শ্লোগান দেয়ার দরকার ছিল। একটা অল্প শব্দে, এটা আজাদ বাংলা শব্দটাতে ডাক দিয়েছিলাম। দিল্লীর দাসত্ব হতে মুক্তি চাই। দিল্লীর দাসত্ব এসে গিয়েছিল বলেই আজাদ বাংলা শব্দটা এসেছিল।

আবদুল হাই শিকদারঃ সে প্রেক্ষাপট কি এখনো আছে বলে মনে করেন? নাকি শেষ হয়ে গেছে ?

অলি আহাদঃ না না শেষ হয় নাই। শেষ হয়েছিল, ১৫ আগস্টের পরে কিছু কাল। স্থগিত ছিল। বর্তমানে পুরোপুরি আবার সেই দাসত্ব।

আবদুল হাই শিকদারঃ এখন কি আপনি আবার আজাদ বাংলা আন্দোলন শুরু করবেন?

অলি আহাদঃ আমি তো চাই। আজাদ বাংলার ডাক আমি দিতে চাই। কিন্তু আমি ডাক দিলেই কি বিএনপি শুনবে? কারণ, তাদেরই টাকা আছে। এখনকার সংগঠন মানে টাকা, যার টাকা নাই সে সংগঠন করতে পারবে না। সংগঠন না করতে পারলে ডাক দেয়া যাবে না। ডাক দিলে সে ডাক কার্যকরী হবে না। আমার ডাক দেয়ার খুব ইচ্ছা আছে, কিন্তু আমার দেয়ার ওপর ইচ্ছার ওপর সব কিছু নির্ভর করে না

আবদুল হাই শিকদারঃ আপনার জীবনের শেষ ইচ্ছা কি?

অলি আহাদঃ জীবনের শেষ ইচ্ছা ? শেষ ইচ্ছাটা হল, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এই হইল আমার জীবনের শেষ ইচ্ছা।

আবুদল হাই শিকদারঃ অর্বিভক্ত ভারতের '৪৭ -এর আগে যেসব জাতীয় নেতৃবৃন্দ ছিলেন, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, জওহরলাল নেহরু, লিয়াকত আলী খান, গান্ধী, শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী এদের মধ্যে গান্ধীজি ও কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র মধ্যে যদি তুলনা করতে বলা হয়, তাহলে কি রায় হবে আপনার ?

অলি আহাদঃ কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী- জিন্নাহ ছিলেন সত্যবাদী, স্পষ্টভাষী। ধোঁকা কাকে বলে তা তিনি জানতেন না। গান্ধীজি, পন্ডিত জওহরলাল নেহরুসহ ভারতের নামকরা প্রায় সব রাজনীতিবিদেরই জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তারা ছিলেন প্রতারক। মিথ্যা কথা বলতেন হরদম। ওয়াদা করেন একটা করে আর একটা। তারা অখণ্ড ভারত চেয়েছিলেন। গান্ধীজি মাউন্ট ব্যাটনকে বলেছিলেন, জিন্নাহকে বলার জন্য, তাকে প্রধানমন্ত্রী

www.pathagar.com

করলে তিনি রাজি আছেন কি-না ? উত্তরে জিন্নাহ বলেছিলেন, গান্ধীজিকে জিজ্ঞাসা করুন, তার নেহরু এবং প্যাটেল রাজি আছে কি-না? উত্তর সেখানেই হয়ে গেল গান্ধীও যা বুঝার বুঝলেন। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অখণ্ড বঙ্গদেশ স্বাধীন সার্বভৌম চেয়েছিলেন। পাকিস্তানের অংশ হতে হবে তাও তিনি বলেন নাই। কিন্তু গান্ধীজি অখন্ড ভারত চেয়েও খণ্ড বঙ্গদেশ চেয়েছিলেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ১৯০৫ সাল থেকে শুরু করে বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে ১৯১১ সাল পর্যন্ত আন্দোলন করে এবং বঙ্গ বিভাগ রদ করে। অথচ সেই কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই পরে'৪৭-এ বঙ্গভঙ্গের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন। সুতরাং কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সমস্ত অখণ্ড ভারতে একমাত্র নেতা কোন প্রসঙ্গেই যার মধ্যে কোন দোদুল্যমানতা ছিল না। ছিল স্পষ্টবাদিতা, ছিল সত্যবাদিতা। ধোঁকা কাকে বলে তা তিনি জানতেন না। আমরা তার নেতৃত্বে কাজ করেছি। কায়েদে আযমের নেতৃত্বে কাজ করে আমাদের দুঃখ যে তাঁর প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে আমরা কাজ করেছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে পরবর্তীকালে সে মানের নেতৃত্ব আমরা পাইনি। ফলে যা হবার দেশের তাই হয়েছে।

আবদুল হাই শিকদারঃ আপনি কি নিজেকে রাজনৈতিকভাবে কোন বিশেষ রাজনৈতিক নেতার অনুসারী মনে করেন?

অলি আহাদঃ একমাত্র কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অনুসারী আমি।

আবদুল হাই শিকদারঃ মওলানা ভাসানী সম্পর্কে আপনার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন চাই।

অলি আহাদঃ দেশপ্রেমিক।

আবদুল হাই শিকদারঃ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

অলি আহাদঃ ক্ষমতা প্রেমিক।

আবদুল হাই শিকদারঃ শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক ?

অলি আহাদঃ ক্ষমতা প্রেমিক।

আবদুল হাই শিকদারঃ জিয়াউর রহমান ?

অলি আহাদঃ জিয়াউর রহমান সম্পর্কে কমেন্ট করতে হবে এটা শুনেই তো আমি আশ্চর্য হচ্ছি। তিনিও ক্ষমতা প্রেমিক।

আবদুল হাই শিকদারঃ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

অলি আহাদঃ যদি আমরা বাংলাদেশে বাস করি , আর এর নাগরিক হই, তাহলে জাতীয়তাবাদ তো বাংলাদেশী হবেই। আবার আমি মনে করি বাঙালী জাতীয়তাবাদও হতে পারে। বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মধ্যে কোন কনটেস্ট আছে বলে আমি মনে করি না। এটা শেখ হাসিনা মনে করে।

আবদুল হাই শিকদারঃ আপনার স্নেহভাজন ভাতিজী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য আপনার কোন উপদেশ আছে কি-না?

অলি আহাদঃ অরণ্যে রোদন, তা হবে অরণ্যে রোদন মাত্র।

আবদুল হাই শিকদারঃ অশেষ ধনাবাদ আপনাকে।

অলি আহাদঃ আপনাদেরও অসংখ্য ধন্যবাদ।

[বিঃদ্রঃ সাক্ষাৎকারটি তিন কিস্তিতে বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারী'২৫শে ফেব্রুয়ারী ও ৪ঠা মার্চ ১৯৯৮ ইং দৈনিক ইনকিলাবে ছাপা হয়। কিছু মূদ্রণ প্রমাদ ছিল এখানে তা সংশোধন করে ছাপা হয়েছে। - সম্পাদক]

www.pathagar.com

একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিহাস ॥ সত্যাগ্রহীর সাক্ষ্য

আমীর আলী

যদি বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে একথাগুলো আমাকে না লিখতে হতো তাহলেই বোধকরি ভালো হতো। কারণ এ লেখায় আমি নিজেও একটি চরিত্র। যেসব সত্যাগ্রহী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কারাবরণ করেছিল তাদের কথা গত সাতচল্লিশ বছরের মধ্যে কেউ লেখেনি। কোনো প্রতিষ্ঠান (বাংলা একাডেমীসহ) এদের স্মরণ করেনি। একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে এদের ভাষা সম্পর্কে কোনো ঐতিহাসিক, কোনো সাংবাদিক বা কোনো বুদ্ধিজীবীই উৎসাহ তো দূরের কথা ঔৎসুক্য পর্যন্ত দেখাননি। একুশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ভূমিকা শহীদদের। তারপরেই এই সত্যাগ্রহীদের। ঘটনাচক্রে এদের দলের পেছনে আমিও ছিলাম।

একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে বাংলাদেশে যথেষ্ট লেখা ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও আরো হবে। এই লেখকদের মধ্যে যাঁরা একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন অলি আহাদ (জাতীয় রাজনীতি ঃ ১৯৪৫ থেকে '৭৫, ঢাকা); আবদুল মতিন (বাঙালী জাতির উৎস সন্ধান ও ভাষা আন্দোলন, ঢাকা, ১৯৯৫); গাজীউল হক এবং এম আর আখতার মুকুল (বাহান্নর ভাষা আন্দোলন) ও এম আর আখতার মুকুল (একুশের দলিলঃ ঢাকা, ১৯৯০)। এরা সবাই ছিলেন একুশের নেতা। অলি আহাদ আর আব্দুল মতিন ছিলেন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য। গাজীউল হক আমতলার সেই ঐতিহাসিক সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন। এম আর আখতার মুকুল গাজীউল হকের নাম সভাপতি হিসেবে প্রস্তাব করেছিলেন। একুশের আন্দোলনে অলি আহাদ আর আবদুল মতিন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

এঁদের বই ছাড়াও বাংলাদেশে একুশে ফেব্রুয়ারির ওপর আরো অনেক বই লেখা হয়েছে। বেশ কয়েকটি বই আমিও পড়েছি। তবে সব কটি বই নিয়ে আলোচনা এই লেখার পরিসরে সম্ভব নয়। কিন্তু একটি বইকে উপেক্ষা করলে এই লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বইটি হচ্ছে বদরুদ্দিন উমরের 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, তৃতীয় খণ্ড, চট্টগ্রাম, ১৯৮৫।

ওপরে যাঁদের কথা বলেছি তাঁদের অধিকাংশই ভাষা আন্দোলনে হয় নেতৃত্ব প্রদান করেছেন অথবা নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দাবিদার। উমর এ দাবি করেননি। তবে ভাষা আন্দোলনে এঁরা এবং আরো যাঁরা একুশের ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদের ভাষ্যের ভিত্তিতে উমর তাঁর ইতিহাস রচনা করেছেন। এর মধ্যে শুধু রাজনৈতিক নেতারাই যে ছিলেন তা-ই নয়, ছিলেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিক্ষক, পুলিশ ও বিভিন্ন সরকারি আর বেসরকারি কর্মচারীরা। উমরের বইটি এঁদের সবারই ভাষ্যকে ভিত্তি করে রচিত।

ঘটনাচক্রে ভাষা আন্দোলনের এই ছাত্রনেতাদের সবার সঙ্গেই পরিচিত হওয়ার এবং কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অলি আহাদ আর আমি দুজনই ১৯৫৬ সালে 'কমিটি ফর ডেমোক্রেটিক কনস্টিটিউশন'-এর সদস্য ছিলাম। সেই সময় পাকিস্তানে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের জন্য এই কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এর সভাপতি ছিলেন মওলানা

www.pathagar.com

আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (আওয়ামী লীগ)। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান ও অলি আহাদ (আওয়ামী লীগের)। অলি আহাদ সে সময় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। উপদেষ্টা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আবদুল মোমিন তালুকদার ও আবদুল আউয়াল (ছাত্রলীগ), মোহাম্মদ সুলতান (যুবলীগ) ও প্রাণেশ সমাদ্দার (গণতন্ত্রী দল), সুফিয়া খানম ও কামরুন্নাহার লাইলী (ছাত্রী সংসদ) এবং আবদুস সাত্তার, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও আমি আমীর আলী (ছাত্র ইউনিয়ন)। এই কমিটিতে আওয়ামী লীগের পাঁচটি ভোট ছিল। বাকি সবারই একটি করে। আবদুল মতিন ১৯৫৫-৫৬ সালে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। আমি ছিলাম সহকারী সম্পাদক। গাজীউল হক আর আমি দুজনই ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এম আর আখতার মুকুল আর আমি পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি। এঁরা সবাই আমার সহকর্মী বা বন্ধু ছিলেন। উমরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সমসাময়িক। কিন্তু তখন তিনি ছিলেন আমার বিপক্ষ শিবিরে। তিনি তখন মুসলিম সম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতি করতেন।

আমরা ইতিপূর্বে 'পার্টিসিপেটরি অবজারভেশন' বা 'অংশগ্রহণকারীর পর্যবেক্ষণ-এর কথা উল্লেখ করেছি। এই পদ্ধতি অনুযায়ী কোনো প্রপঞ্চ বা ঘটনায় অংশগ্রহণকারী সেই প্রপঞ্চ বা ঘটনাকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছে তার খতিয়ান। অলি আহাদ, আবদুল মতিন, গাজীউল হক, এম আর আখতার মুকুল এই পদ্ধতিটিই ব্যবহার করেছেন। অপরদিকে উমর যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন সেটাকে 'কী ইনফর্মেন্ট' বা 'বিশিষ্ট তথ্য সরবরাহকারী' পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী লেখক বা গবেষকের কোনো প্রপঞ্চ বা ঘটনাতে অংশগ্রহণ করা অপরিহার্য নয়। এতে বিশিষ্ট অংশগ্রহণকারী বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 'ইন্টারভিউ' বা সাক্ষাৎকার অবলম্বন করে একটি অ্যাকাউন্ট বা খতিয়ান প্রণয়ন করা।

এ দুটি পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হচ্ছে 'ইমপর্টেন্ট' বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ওপর এর নির্ভরশীলতা। অংশগ্রহণকারীরা শুধু নিজেদেরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে মনে করেন না, ওই ঘটনায় অন্য ব্যক্তিদেরও 'ইমপর্টেন্ট' ব্যক্তি বলে মনোনীত করেন। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তিশীল ব্যক্তিরাই মনোনয়ন লাভ করেন। উল্লিখিত ছাত্রনেতাদের বইগুলোতেও এই প্রবণতাগুলো লক্ষ্য করা যায়। অলি আহাদ তার বইতে যে চিত্র উপস্থাপিত করেছেন তাতে এ কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, একুশের আন্দোলনে তিনি নিজেকেই নেতা হিসেবে মনোনীত করেছেন। তিনি যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তার সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও এ কথা কারো বুঝতে কষ্ট হয় না। অবশ্য তিনি একা ছিলেন না। তার সঙ্গে ছিল একটি 'ফেসলেস' অবয়বহীন 'সাধারণ ছাত্র' ও 'জনতা'।

আবদুল মতিনের লেখায় ঘটনাপঞ্জি আর কিছু বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে ঘটনাপঞ্জি আর বিশ্লেষণের সঠিক সংশ্লেষণ ঘটেনি। আর তাছাড়া আব্দুল মতিন তার লেখার সিংহভাগ নিয়োজিত করেছেন বায়ান্ন সালের আন্দোলনের ওপর নয়, '৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের ওপর। বায়ান্নর একুশের আন্দোলনে তার নিজের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তার কোনো উল্লেখ তার লেখায় নেই। তিনি অলি আহাদকে নেতা হিসেবে মনোনীত করেছেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা বা না করার আদর্শগত বিরোধকে আবুল হাশিম আর অলি আহাদ এই দুই নেতার ব্যক্তিগত মতবিরোধ বলে তার কাছে প্রতিভাত হয়েছে।

www.pathagar.com

অপরপক্ষে গাজীউল হক আর এম আর আখতার মুকুলের রচনায় তাদের নিজেদের ভূমিকা ছাড়াও অন্যদের ভূমিকার উল্লেখ রয়েছে। তারা নেতা হিসাবে '১১ জন প্রগতিশীল ছাত্রনেতাকে মনোনীত করেছেন। তাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে ফজলুল হক হলের পুকুর পাড়ে ১১ জন প্রগতিশীল ছাত্রনেতার গোপন বৈঠকে। এই '১১ জন প্রগতিশীল ছাত্রনেতা'র মধ্যে তিনজন-গাজীউল হক, কমরুদ্দিন শহুদ এবং স্বয়ং এম আর আখতার মুকুল পরের দিন গাজীউল হককে আমতলার সভায় সভাপতি করার মাধ্যমে একুশের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিলেন। এম আর আখতার মুকুলের ১১ জন প্রগতিশীল ছাত্রনেতার' মধ্যে পরবর্তীকালে ১০ জনই তাদের নিজস্ব এলাকায় প্রভাব, প্রতিপত্তি, যশ, খ্যাতি অর্জন করেছেন। করেননি শুধু একজন, আনোয়ার হোসেন। মুকুল 'পরিচয় অজ্ঞাত' বলে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আর তাছাড়া তার 'নেতা' শব্দটির প্রয়োগও এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

এই 'হিস্ট্রিওগ্রাফি'র অনুক্রম বদরুদ্দিন উমরের বই। কিন্তু যেহেতু ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বের তিনি একটি ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, এই পদ্ধতিকে 'কী ইনফর্মেন্ট মেথড' বলা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে যাদের ভাষ্যের ওপর উমর নির্ভর করেছেন তারা শুধু 'কী ইনফর্মেন্ট'ই নন তাদের নিজস্ব এলাকায় এলিটও বটে। ফলে উমরের ক্ষেত্রে একটি ডবল নমিনেশন ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়েছে। তার লেখার জন্য কারা গুরুত্বপূর্ণ সেটা উমর প্রথমে নিজেই নির্ধারণ করেছেন। পরে উমরের নির্বাচিত ব্যক্তিরা শুধু অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিই নয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তার লেখায় বিস্ময়করভাবে কিছু নন-ইস্যু ইস্যু হিসেবে গুরুত্ব লাভ করেছে কিন্তু সত্যিকারের ইস্যুগুলো কোনো গুরুত্ব লাভে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে একটি নন-ইস্যু আওয়ামী লীগ বা কমিউনিস্ট পার্টি একুশে ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা ভাঙার ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছিল কি দেয়নি- সেটা তার লেখার একটি প্রধান বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। যারা সত্যিই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েই বসে থাকেনি, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছিল, তারা অনুরূপ গুরুত্ব লাভে অসমর্থ হয়েছে। আমাকে তার যে বক্তব্য সবচেয়ে বিস্মিত করেছে সেটি হচ্ছে এ লাইনটি; 'এই পরিস্থিতিতে হাবিবুর রহমান শেলীর নেতৃত্বেই প্রথম ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী স্কোয়াডটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ে। (পৃঃ ২৭০)। বিস্মিত এই জন্য হয়েছি যে, শেলী যে স্কোয়াডে বেরিয়েছিলেন সে স্কোয়াডে আমিও বেরিয়েছিলাম। এই স্কোয়াডের অন্য সদস্যদের তালিকা আর আনুক্রমিক অবস্থান সম্পর্কে তথ্য আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই দিচ্ছি। এখানে আমি শুধু 'নেতৃত্ব' শব্দটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। একুশে ফেব্রুয়ারিতে যে অবস্থা বিরাজ করছিল সেই পরিস্থিতিতে এমনকি হাবিবুর রহমান শেলীও যদি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার বিরোধিতা করতেন তাহলেও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হতো। একুশে ফেব্রুয়ারীতে দুপুর ১২টা থেকে ১টার মধ্যে নেতৃত্বের প্রশ্নটি অবান্তর হয়ে পড়েছিল। কারণ নেতারা সবাই আমাদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার বিরুদ্ধে আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। একুশে ফেব্রুয়ারির বিদ্রোহ শুধু সরকার বা সরকারি দলের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ছিল না, বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ছিল। এ বিদ্রোহে নেতারাই জনসাধারণের পেছনে ছিলেন। উমরের মতো মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর নজরেও ব্যাপারটা পড়েনি। আমার বক্তব্য হচ্ছে, এথনোগ্রাফিক পদ্ধতি নেতা বা নেতৃত্ব

www.pathagar.com

ছাড়া কোনো ঘটনার কথা চিন্তাই করতে পারে না। উমরসহ উপরোক্ত সব-লেখকই নিজেদের অজান্তেই এ পদ্ধতির বলি হয়েছেন।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে ইতিহাস রচিত সেটা এলিটিস্ট ইতিহাস। অলি আহাদ, আব্দুল মতিন, গাজীউল হক, এম আর আখতার মুকুল এমনকি বদরুদ্দিন উমর একুশের যে ইতিহাস রচনা করেছেন সেটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং একাডেমিকদের দৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। এখানে সাধারণ মানুষ এবং সাধারণ কর্মী যারা সত্যিই একুশের ইতিহাস রচনা করেছিল তাদের কোনো ভূমিকা নেই। আর সে কারণেই একুশের সত্যাগ্রহীরা এই ইতিহাস থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। অবশ্য ব্যতিক্রম হচ্ছেন আবদুস সামাদ আজাদ, হাবিবুর রহমান শেলী আর এস এ বারী এটি পরবর্তীকালে যারা ক্ষমতা এবং প্রসিদ্ধ দুটোই অর্জন করেছেন। আর বাদবাকি সবাই হারিয়ে গেছেন। আমি তাদেরই কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করেছি। এ কথা আমি অবশ্যই দাবি করছি না যে, আমি একুশের একটি বিকল্প ইতিহাস রচনা করেছি। একটি গণভিত্তিক ইতিহাসের তথ্য সরবরাহের এটা একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র।

আমার কাহিনী শুরু বায়ান্ন সালের ২০ ফেব্রুয়ারির অপরাহ্নে। আমি তখন জগন্নাথ কলেজে ইন্টারমিডিয়েট আর্টসের ছাত্র। আমার সহপাঠী আর বন্ধুদের মধ্যে ছিল আনিসুজ্জামান (অধ্যাপক/সাহিত্যিক), নেয়ামাল বসির (প্রয়াত/বেতার ঘোষক), আব্দুর রহিম (সাংবাদিক), সৈয়দ আহমদ হোসেন (ইউনা সেক্রেটারি জেনারেল প্রয়াত), মৃণাল বারুরী (যুবলীগ কর্মী/প্রয়াত), খোন্দকার আলী আশরাফ (সাংবাদিক), আনোয়ার হোসেন (বর্তমান পেশা অজ্ঞাত) ও আনোয়ারুল ইসলাম (ব্যবসায়ী) ও যতদূর মনে পড়ছে তোফাজ্জল হোসেন (তথ্য কর্মকর্তা) ও মশিউর রহমান (ব্যাংকার)। আমরা সবাই তখন জগন্নাথ কলেজ রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের সদস্য অথবা কর্মী ছিলাম। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের তরফ থেকে ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী, সদরঘাট ও নবাবপুর অঞ্চলে পরের দিন একুশে ফেব্রুয়ারি হরতাল ও ধর্মঘট সফল করার জন্য আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমরা সেই উদ্দেশ্যে ২০ ফেব্রুয়ারী দু'টিমাত্র চোঙা সম্বল করে প্রচারে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী আর সদরঘাট অঞ্চলে প্রচারকার্য সম্পাদন করে আমরা প্রায় বেলা সাড়ে ৩টার দিকে রথখোলার মোড়ে এসে পৌছাই। আমাদের মধ্যে নেয়ামাল বসির ভালো উর্দু জানত। রথখোলা অঞ্চলে তখন বেশকিছু উর্দুভাষী অবাঙালি বাস করত। নেয়ামাল বসির এই উর্দুভাষীদের সুবিধার্থে চোঙা সহযোগে উর্দু ভাষায় একুশে ফেব্রুয়ারিতে হরতাল ও ধর্মঘট পালন করার প্রয়োজনীয়তা ও মাহাত্ম্য প্রচার করছিল। ঠিক এই সময় আমাদের সামনে একটা জিপ গাড়ি এসে দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে মাইকযোগে ঘোষণা করা হলো যে, ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (কোরায়শী) পরের দিন একুশে ফেব্রুয়ারী থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। এই ধারাবলে ঢাকায় জনসভা, মিছিল, ধর্মঘট, হরতাল ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এই ঘোষণা একবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। এই পরিস্থিতিতে আমরা আদৌ প্রচারকার্য চালাব কিনা সে সম্পর্কে আমাদের মনে সংশয় দেখা দিল। কিছুক্ষণ চিন্তা করে আমরা ঠিক করলাম যে আমরা প্রচার চালিয়ে যাব। যেসব স্থানে জিপ থেকে ১৪৪ ধারার ঘোষণা করা হচ্ছিল, ঘোষণার কিছুক্ষণ পরেই আমরা সেই সব স্থান থেকেই পরের দিন ধর্মঘট আর হরতাল পালনের আহবান জানাচ্ছিলাম। বেলা ৫টার দিকে আমাদের প্রচার শেষ করে নবাবপুর

www.pathagar.com

রোড লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে ক্যাপিটাল রেস্টরেন্টে এসে উপস্থিত হই। পরের দিনের কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশের জন্য আমরা আনোয়ার হোসেনকে অলি আহাদের কাছে পাঠাই। আনোয়ার হোসেন যুবলীগ কর্মী ছিল। অলি আহাদ ছিলেন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে যুবলীগের প্রতিনিধি। কথা হলো যে আনোয়ার হোসেন যদি ঘন্টাখানেকের মধ্যে নির্দেশ নিয়ে ক্যাপিটাল রেস্টুরেন্টে ফিরে আসতে না পারে তাহলে কাছেই বামাচরণ চক্রবর্তী রোডে আনিসুজ্জামানের বাড়িতে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। আনোয়ার হোসেন যুগীনগর লেনে ইয়ুথ লীগ অফিসে অলি আহাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। যুগীনগর লেন বামাচরণ চক্রবর্তী রোডের কাছেই ছিল।

এক ঘন্টার মধ্যে আনোয়ার হোসেন ফিরে এলো না। আমরা আনিসের বাসায় নিজেদের স্থানান্তরিত করলাম। তবুও আনোয়ার হোসেন এলো না। যাহোক রাতের দিকে আমরা রণে ভঙ্গ দিলাম। আমি আর আহমদ হোসেন আনিসের বাড়ি থেকে নবাবপুর রোডে আওয়ামী লীগ অফিসের দিকে রওনা হলাম। আওয়ামী লীগ অফিস পর্যন্ত যেতে হলো না। নবাবপুর রোডের ওপরেই অলি আহাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অলি আহাদ বললেন, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরের দিন একুশে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা যাবে না। বললেন যে যারা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন তারা ছিলেন, অলি আহাদ (যুবলীগ), আবদুল মতিন (বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি), গোলাম মওলা (মেডিকেল কলেজ) আর শামসুল আলম (ফজলুল হক মুসলিম হল)। পরে শুনেছিলাম যে, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় আসার আগে ফজলুল হক হলের সাধারণ ছাত্রদের এক সভা হয়েছিল। এই সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিলো যে ফজলুল হক হলের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষপাতী। সভায় শাহাবুদ্দীন আহমদের এক প্রস্তাবে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে ফজলুল হক হলের প্রতিনিধি সামসুল আলম আর আনোয়ারুল হক খানকে ফজলুল হক মুসলিম হলের এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়ার ম্যান্ডেট দেওয়া হয়। এই সাহাবুদ্দীন আহমদই বর্তমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম মোহাম্মদ তোয়াহা কোনদিকে ভোট দিয়েছেন। অলি আহাদ বললেন, তোয়াহা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তের পক্ষে ভোট দেননি। আমার তাই বহুদিন ধরে ধারণা ছিল যে, মোহাম্মদ তোয়াহা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সপক্ষে ভোট দিয়েছেন। আসলে তিনি ভোটাভুটির সময় 'নিরপেক্ষ' ছিলেন। অলি আহাদ আরো বললেন, 'আমরা ইডা মানি না মিয়ারা। ফাইল তৈয়ার হৈয়া আইও'। কথা ছিল সংগ্রাম পরিষদের এই সিদ্ধান্ত পরের দিন একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমতলার ছাত্রসভায় ঘোষণা করা হবে।

পরের দিন একুশে ফেব্রুয়ারী দুপুর ১২টার দিকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় উপস্থিত হলাম। সভায় যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল সেটা বর্ণনা করার মতো শক্তিশালী ভাষা আমার জানা নেই। সভা শুরু হলো গাজীউল হকের সভাপতিত্বে। সভারম্ভে গাজীউল হক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হককে আহবান জানালেন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে। শামসুল হক ঘোষণা করলেন যে, যেহেতু সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করে তাই তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা অনুচিত হবে। মুসলিম লীগ সরকার নির্বাচন পিছয়ে দেওয়ার জন্য একটা অজুহাত খুঁজছে। যদি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হয় তাহলে মুসলিম লীগ নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার জন্য এই অজুহাতটিই ব্যবহার করবে। আমি অগ্নিগিরির

www.pathagar.com

বিস্ফোরণ দেখিনি। কিন্তু শামসুল হকের বক্তৃতার ফলে যা ঘটল সেটা অগ্নিগিরির বিস্ফোরণের থেকে বিন্দুমাত্র ভিন্ন বলে আমার মনে হয়নি। আমার বন্ধু প্রয়াত কবি হাসান হাফিজুর রহমান। 'ইউ ট্রেইটর' হুঙ্কার দিয়ে শামসুল হকের দিকে ধাবিত হলেন। কে যে তাকে সংযত করল এখন আর মনে করতে পারছি না। সভার মাঝ থেকে একজন যুবক তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। প্রায় ছয় ফুট লম্বা। পরনে পাজামা, হাতকাটা শার্ট আর হাতকাটা সোয়েটার। গর্জন করে বললেন, 'আমরা প্রেসক্রিপশন চাই না, সাজেশন চাই।' পরে খবরের কাগজে সেই যুবকের ছবি দেখেছিলাম। তিনিই শহীদ আবুল বরকত। যা হোক এই প্রতিবাদ আর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শামসুল হক তার বক্তৃতা শেষ করলেন। আমাদের তখন কোনো চেতনা বা সম্বিত বলে কিছু ছিল না। আমরা শুধু 'না' 'না' বলে চিৎকার করছি। এই অগ্নুৎপাতের মধ্যে গাজীউল হক ঘোষণা করলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি একটি ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সেই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার জন্য তিনি আব্দুল মতিনকে আহবান জানালেন। আব্দুল মতিন উঠে দাঁড়ালেন। পরনে শাদা মাখনজিন্সের ট্রাউজার আর শাদা শার্ট। কিছুটা ইতস্তত করে তিনি তার বক্তৃতা শুরু করলেন। তিনি বললেন যে, ১০ জনের ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে হবে। ভঙ্গকারী সত্যাগ্রহীদের উদ্দেশ্য হবে পূর্ব পাকিস্তান বিধান পরিষদের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা। আবদুল মতিন যা বলছিলেন সেটা আমাদের সবারই মনের কথা ছিল। কিন্তু তিনি এমন নিরুত্তেজ, নির্বিকার আর নিস্তেজভাবে বলছিলেন যে, তার কথা আমাদের ওপর কোনো রকমের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। আমরা তখন এত উত্তপ্ত যে বক্তাদের কাছ থেকে চরম উত্তেজনা ও নাটকীয়তা আশা করছিলাম। আব্দুল মতিন সে উত্তেজনা, সে নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি। ইতিহাস সে দায়িত্ব অর্পণ করেছিল গাজীউল হকের ওপর। তিনি তার সভাপতির চেয়ারের ওপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দুহাত একসঙ্গে আকাশের দিকে জুড়ে গর্জন করে উঠলেন, 'আমরা ১০ জন ১০ জন করে বেরিয়ে যাব। আমরা দেখতে চাই পূর্ব বাংলা সরকারের কত জেল আছে।' আজ প্রায় ৫০ বছর পরেও এ কথাগুলো স্মরণ করে রোমাঞ্চিত হই। বায়ান্ন সালে কী হয়েছিল আশা করি সে কথা বলে বোঝাতে হবে না। অনেকে দাবি করেছেন যে, গাজীউল হকের পরে আরো কয়েকজন বক্তৃতা করেছিলেন। কথাটা আদৌ সত্যি নয়। গাজীউল হকের বক্তৃতার পর কোনো রকমের বক্তৃতা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল। এই বক্তৃতার পর দুর্বর লাভাস্রোতের প্রবাহ নামল। কেউ বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, তবে বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে কে আগে ১৪৪ ধারা ভাঙবে এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কিন্তু সত্যিই যেন একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এখানে একটা বিষয়ের উপস্থাপনা প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি। পরবর্তী সময়ে যারা একুশের ইতিহাস রচনা করেছেন তাদের ইতিহাসে কে কোন গ্রুপে বের হয়েছিল এ নিয়ে একটা বিতর্ক লক্ষ্য করেছি। এদের সংজ্ঞা অনুযায়ী সত্যাগ্রহীরা যে গ্রুপে বেরিয়েছিল তাদের সেই গ্রুপেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আমার ধারণা এই বিতর্ক অর্থহীন। কারণ, যেভাবে গ্রুপগুলো বেরিয়েছিল তারা ঠিক সেভাবে ধরা পড়েনি। গ্রুপ সম্পর্কে আমার সংজ্ঞা হচ্ছে, যারা একসঙ্গে বেরিয়ে একই সঙ্গে ধরা পড়েছিল। আমার হিসাব অনুযায়ী আমি দুনম্বর গ্রুপে বেরিয়েছিলাম কিন্তু অন্যদের হিসাবে সেটা তিন নম্বরেও হতে পারে। আবার চার নম্বরও হতে পারে।

www.pathagar.com

যেটাকে প্রথম গ্রুপ বলা হয়ে থাকে সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট থেকে বেরই হতে পারেনি। পুলিশ এদের ধাক্কা দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই গ্রুপের সত্যাগ্রহীরা পরে দুই নম্বর বা তিন নম্বর (চার নম্বর) গ্রুপের সঙ্গে যোগদান করে গ্রেপ্তার হয়। এই বিভ্রান্তির আরো একটা কারণ হচ্ছে এই গ্রুপগুলো সম্পর্কে যারা রেকর্ড রাখছিলেন, সেই মোহাম্মদ সুলতান আর হাসান হাফিজুর রহমানের স্মৃতিক্ষীণতা।

এ নিয়ে বিতর্ক বাড়িয়ে লাভ নেই। পূর্বের কথায় ফিরে যাই। বিশ্ববিদ্যালয় গেটের বাইরে আমাদের জন্য অপেক্ষমাণ পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ঢাকার পুলিশ সুপরিনটেনডেন্ট ইদ্রিস আর ঢাকার সিটি এসপি মাসুদ। প্রথম গ্রুপটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় গ্রুপটি বের হয়। এই গ্রুপে ছিলেন ইব্রাহিম মোহাম্মদ তাহা (সলিমুল্লাহ মুসলিম হল/ব্যবসায়ী/প্রয়াত), আনোয়ারুল হক খান (ফজলুল হক মুসলিম হল/মুজিবনগর সরকারের তথ্যসচিব), এস এ বারী এটি (সলিমুল্লাহ মুসলিম হল/ উপপ্রধানমন্ত্রী/প্রয়াত), সাইয়ীদ আতিকুল্লাহ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/লেখক প্রয়াত), জাকারিয়া খান চৌধুরী (সলিমুল্লাহ মুসলিম হল/ বিএনপি পার্লামেন্টারি ক্যান্ডিডেট), মীর হোসেন (যুবলীগ কর্মী), মোহাম্মদ মর্তুজা (যুবলীগ কর্মী); জহির রায়হান (ঢাকা কলেজ/চিত্র পরিচালক), মোতাহার হোসেন ভূইয়া (ঢাকা কলেজ/ লন্ডন প্রবাসী শিক্ষক), নেয়ামাল বসির (জগন্নাথ কলেজ/ বেতার ঘোষক/ প্রয়াত) ও মজরুল (নজরুল নয়) ইসলাম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) । এই গ্রুপটিকে গ্রেপ্তার করে লালবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পরের গ্রুপে বেরিয়েছিল ছাত্রীরা। এদের মধ্যে ছিলেন শফিয়া খাতুন, সুফিয়া ইব্রাহীম, হালিমা খাতুন, শামসুন্নাহার ও আরো অনেকে যাদের নাম এখন আমার মনে পড়ছে না। এই গ্রুপটিকে পুলিশ প্রথমে কর্ডন করে রাখে। পরে ছেড়ে দেয়।

এর পরের গ্রুপে আমরা বের হয়েছিলাম। আমাদের গ্রুপে ছিলেন আবদুস সামাদ আজাদ (সলিমুল্লাহ মুসলিম হল/বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী), হাবিবুর রহমান শেলী (সলিমুল্লাহ মুসলিম হল/বিচারপতি/ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা), খাজা (ফজলুল হক মুসলিম হল/এর আসল নামটি এখন আর মনে করতে পারছি না), আলী তৈয়ব (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), আবদুল হালিম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), আজহারুল ইসলাম (মেডিকেল কলেজ), আজহারুল ইসলাম (ভেটেরিনারি কলেজ), মনিরুল ইসলাম পাটোয়ারী (ভেটেরিনারি কলেজ), মোহাম্মদ বখতিয়ার (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ও আমি আমীর আলী (জগন্নাথ কলেজ)। যিনি আমাদের গ্রেপ্তার করলেন তিন ছিলেন আমার বাবার বন্ধু আবদুল জব্বার, ঢাকা সিটি ডিএসপি। আমাদের গ্রেপ্তার করে তেজগাঁও থানায় নিয়ে যাওয়া হলো।

পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি একটি টাউন সার্ভিসের বাসে কাউন করে বিচারের জন্য আমাদের ঢাকার জেলা কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ ধর্মঘটের ফলে জজ ম্যাজিস্ট্রেট কেউই সেদিন কোর্টে এসে উপস্থিত হতে পারেননি। ফলে আমাদের বিচারের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। ঠিক করা হয় যে, আমাদের বিচারাধীন বন্দি হিসেবে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হবে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ট্রান্সপোর্ট নিয়ে। ঢাকায় তখন একটি মাত্র প্রিজন ভ্যান ছিল। সেটা এতই ব্যস্ত ছিল যে, আমাদের জেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেটা সময়মতো পাওয়া গেল না। যে টাউন সার্ভিসের বাস আমাদের কোর্টে নিয়ে গিয়েছিল সে বাসের ড্রাইভার আমাদের জেলে নিয়ে যেতে অস্বীকার করল। তাকে বলা হয়েছিল যে,

www.pathagar.com

তেজগাঁও থানা থেকে কিছু আসামিকে কোর্টে নিয়ে যেতে হবে। কোর্টে নিয়ে যাওয়ার সময় সে আমাদের আসল পরিচয় জানতে পারে। ফলে সে আমাদের জেলে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে। তাকে পয়সার লোভ দেখানো হলো। গাড়ির লাইসেন্স কেড়ে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হলো। পরে পুলিশ কর্তৃক বেদম পিটুনি দেওয়া হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের জেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে রাজি করানো গেল না। তার একটাই কথা, 'আমি এই পোলাগো কোর্টে আইন্যা, ভুল করছি। জেলে লইয়া গুনা করুম না।' প্রিয়জন ভ্যান পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের ঢাকা জেলা কোর্ট প্রাঙ্গণে বেলুচ রেজিমেন্ট দিয়ে ঘিরে রাখা হলো। বেলা দেড়টার দিকে আমাদের প্রিজন ভ্যানে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এর মধ্যে আমরা জানতে পারি যে, কোর্টের কাছেই 'মর্নিং নিউজ' অফিস ও প্রেসকে বিক্ষুব্ধ জনতা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করেছে।

ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আমাদের-২৬ নম্বর ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল। এই ওয়ার্ডের ওপারেই ছিল উর্দু রোড। এই রাস্তার ওপর একটি মসজিদের মিনার থেকে লোকেরা আমাদের প্রত্যেক দিন খবরের কাগজ, খাবার-দাবার এমন কি কাপড়চোপড়ও ছুড়ে দিত। একদিন আমার পরিবারের লোকদের সঙ্গে জেল গেটে দেখা করতে যাওয়ার সময় পুরানা হাজত ওয়ার্ডে আমার অকৃত্রিম বন্ধু মশিউর রহমানের (ব্যাংকার) সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। সে যে জেলে ছিল সেটা আমি জানতাম না। সে বললো যে, নারায়ণগঞ্জের এসডিও সানাউল হকের (সিএসপি অফিসার/কবি) নির্দেশক্রমে তাকে আর তার সহকর্মীদের নারায়ণগঞ্জ থানায় নিয়ে বেদম মার দিয়ে ঢাকা জেলে পাঠানো হয়। একুশের আন্দোলনে অনেকেই ধরা পড়েছিল। কিন্তু কাউকেই পেটানো হয়নি। মশিউর আর তার সহকর্মী মোয়াজ্জম হোসেন জামিল (চাঁদ) আর শামসুজ্জোহাকে পিটিয়ে সানাউল হক সাহেব বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন। মশির পিঠে বহুদিন পর্যন্ত এই পিটুনির দাগ ছিল। এই সানাউল হকই পরবর্তীকালে বেলজিয়ামে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নির্বাচিত হয়েছিলেন। যা হোক প্রায় দেড় মাস জেলে থাকার পরে আমরা ছাড়া পাই।

[আমীর আলীঃ ১৯৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারীদের একজন। বর্তমানে লন্ডনে বসবাসরত। নিবন্ধটি ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০০ থেকে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য নিবন্ধে ভাষা আন্দোলনের অনেক তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে বিধায় এখানে সংযোজন করা হল।]

www.pathagar.com

খালেদা জিয়া আমার কথা শুনলে অনেক আগেই হাসিনা পড়ে যেতো

অলি আহাদ

প্রবীণ রাজনীতিক জনাব অলি আহাদ জাতীয় সংসদের আগামী অধিবেশনে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার যোগ দেয়া উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বিরোধী দলীয় নেত্রীর উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক আহবানের ব্যাপারে বর্ষীয়ান জননেতা জনাব অলি আহাদের মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি মনে করি, শেখ হাসিনার ডাকে সাড়া দিয়ে সংসদে গিয়ে খালেদা জিয়ার বলা দরকার, প্রধানমন্ত্রীর কথায় সংসদে এসেছি। অমুক তারিখের মধ্যে আমরা ইলেকশন চাই। এখন সরকারকে এই মুহূর্তে পদত্যাগ করে ওই তারিখের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ খোলাসা করতে হবে। বিরোধী দল অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ এবং জাতীয় সংসদের নির্বাচন আগাম অনুষ্ঠানের যে দাবি তুলেছে সে সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি দু'টি পৃথক অনুষ্ঠানে অঙ্গীকার করেছেন যে, বিরোধী দলীয় নেত্রী সংসদে এসে যে তারিখে ইলেকশন চাইবেন সেদিনই নির্বাচন দিতে সরকার প্রস্তুত। জনাব অলি আহাদ মনে করেন, বিরোধী দল এ কথার সুযোগ নিলেই প্রমাণ হবে যে, প্রধানমন্ত্রী তার অঙ্গীকার রাখেন কি-না।

ডেমোক্রেটিক লীগ প্রধান, সাত দলীয় জোটের অন্যতম শীর্ষনেতা জনাব অলি আহাদ গত ২২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার তাঁর বাসভবনে একান্ত আলাপচারিতায় ব্যক্ত করেছেন ওই মতামত। ভাষা শহীদের মাসে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা জনাব অলি আহাদের একটি সাক্ষাৎকার সাপ্তাহিক ঊষার পাঠকদের জন্য নেয়ার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছিলাম। তবে প্রচারবিমুখ এই প্রাজ্ঞ রাজনীতিকের যে খানিকটা অনীহা রয়েছে পত্রপত্রিকায় হুটহাট করে সাক্ষাৎকার দেয়ার ব্যাপারে, সে কথাও জানা ছিলো। আর তাই জনাব অলি আহাদের স্নেহভাজন ও বিশ্বস্ত একজন সাংবাদিকের সহায়তা নেয়া।

'ষাটের দশকের খ্যাতিমান ছাত্রনেতা ওই সাংবাদিক ফোন করলেন অলি আহাদ ভাইকে। কিন্তু তাতেও সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে সম্মতি মিললো না। তবে তাঁর বাসায় গিয়ে আলাপ করার অনুমতি দিলেন।

কথামতো বিকেল তিনটায় আমরা পৌঁছলাম ল্যাবরেটরি রোডে জনাব অলি আহাদের চারতলার ফ্ল্যাটে। তখন লিফ্‌ট চালু ছিলো না। হেঁটে উঠে ডোর বেল বাজাতে নিজেই দরোজা খুললেন 'বায়ান্নোর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অগ্রসেনানী অলি আহাদ। ইতিহাসের অনেক চড়াইউৎরাই পেরিয়ে এখন তিনি প্রৌঢ়ত্বের ছায়ায় এসে পৌঁছেছেন। পাকিস্তানী শাসনামলের গোড়ার দিকে ছাত্র অবস্থাতেই রাজনীতিতে হাতে খড়ি হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এই কৃতি সন্তানের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নপর্বে তখনকার নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির যুবশাখা পূর্বপাকিস্তান যুব লীগ গঠনে পালন করেন নেতৃস্থানীয় ভূমিকা। সেই থেকে এ ভূখণ্ডের

www.pathagar.com

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাজনৈতিক ইতিহাসের মোড়ে মোড়ে বারবার সাহসের ফুলকি হয়ে জ্বলেছেন তিনি। নির্যাতন, কারাবরণ ও ত্যাগের জীবন্ত এক দীর্ঘ উপাখ্যান জনাব অলি আহাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভ্রূকুটি ও হাতছানি দুই-ই অবহেলা ভরে উপেক্ষা করেছেন বারবার। অভিজ্ঞতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, আদর্শনিষ্ঠা ও সততা তাঁকে করেছে খানিকটা অহংকারমণ্ডিত। স্পষ্টবাদিতা তাঁর চরিত্রে রুক্ষতা ও কাঠিন্যও এনে দিয়েছে কিছুটা। অবয়বে বয়সের ছাপ নিয়েও নিজস্বতায় অটল, দীর্ঘদেহী ও ঋজু এই ব্যক্তিত্বের পিছু পিছু আমরা তাঁর ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসলাম। হেসে বললেনঃ স্ত্রী অসুস্থ। নিজেই বাসনকোসন ধুচ্ছিলাম। কাজটা সেরে আসি। ভেতরে গেলেন তিনি। ছিমছাম, ছোট্ট ড্রয়িংরুমে বসা আমরা। অল্প ফার্নিচার, সুরুচির ছাপ স্পষ্ট। দেয়ালে টাঙানো বিদেশী পেইন্টিং। এককোণে বাঁধাই করা একটি পারিবারিক ফটোতে স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে জননেতা অলি আহাদ। মিনিট দশেকের মধ্যেই তিনি এলেন। সাক্ষাৎকারের কথা আরেকবার বিনীতভাবে তুলতেই প্রবল আপত্তি করে বললেনঃ না না। ওসবে কোনো লাভ নেই। এমনিই বসে কথা বলি।

আমরা বললামঃ ঠিক আছে। সাক্ষাৎকার দরকার নেই। কিন্তু আপনার কথা তো মূল্যবান। দেশবাসী জানতে চায়---

বাজে কথা। কেউ জানতে চায় না। আর আমার মূল্য কি আছে না আছে সেটা আমি বেশ ভালো বুঝি। তাছাড়া সাংবাদিক তো আজকাল অনেকেই অসৎ। লিখবে কী ?

একটু থেমে বললেন, এই যে, দেখেন এটা একটা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া। এখানে রোগী থাকতে পারে, পরীক্ষার্থী আছে, নানা রকম সমস্যার মানুষ থাকতে পারে। অথচ এখানে প্রচণ্ড শব্দে রাতভর নির্মাণ কাজ চলছে। আমার এখন ৭৩ বছর বয়স। সারারাত ঘুমাতে পারি না ভয়ংকর শব্দের জন্য। মেয়ের পরীক্ষা সে পড়তে পারে না। কিন্তু হু কেয়ার্স ? এখানে সিভিক সেন্স আছে ক'জনের ? ক'জন আইন মানছে ? রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ায় এরকম কাণ্ড এতোদিন ধরে চলছে, কেউ দেখছে? এভাবেই প্রতিটি ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে সব অন্যায় সকলের গা-সওয়া হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবাদ করতে পারছে না কেউ। করলেও লাভ হচ্ছে না।

উপরে ওঠার সময় আমরা দেখে এসেছিলাম, সামনেই অনেকখানি জায়গা উঁচু টিন দিয়ে ঘিরে নির্মাণ কাজ চলছে। বিশাল বহুতল ভবন হচ্ছে। নিচে শপিং সেন্টার এবং ওপরে অ্যাপার্টমেন্ট হবে। টিনের ঘেরাওয়ের গায়ে বড় বড় ইংরেজি হরফে লেখা আছেঃ 'মাল্টিপ্লান লিমিটেড।' কিন্তু রাতভর কাজ ! জনাব অলি আহাদের কথায় বিস্মিত আমরা। কিন্তু এই মহানির্মাণযজ্ঞের নামে এলাকার বাসিন্দাদের রাতের ঘুম হারাম করার অধিকার তারা কোথায় পেয়েছে--- সে প্রশ্নের জবাব আমরা দিতে পারিনি। তাই প্রসঙ্গ দ্রুত পাল্টে রাজনীতির কথা তুললাম। সঙ্গে সঙ্গে গগণে আগুনের আঁচ পেলাম। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ রাজনীতিক তিক্তকণ্ঠে বললেনঃ রাজনীতিতে আর কোনো নীতি-নৈতিকতা আছে কি? কি লাভ হচ্ছে বারবার সরকার বদল করে? আমরা মস্তবড় মুক্তিযুদ্ধ করলাম। অথচ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীরা আমাদের গলার মালা। আওয়ামী লীগ এতো অপকর্ম করলো। তাদেরকে কি বাদ দেয়া গেলো? এরশাদের বিরুদ্ধে এতো দীর্ঘ আন্দোলন হলো। আবার সব পক্ষের কাছেই সে গ্রহণযোগ্য হয়ে গেলো সহজেই। বিএনপির ড. মোশাররফ সেদিন ধানাই পানাই করছিলো। আমি বললাম, মিয়া বেশি বড় বড় কথা বোলো না। মিনিস্টার থাকতে ৩০টির মধ্যে

www.pathagar.com

সাংগুভ্যালিসহ ৮টি গ্যাস ফিল্ড তোমরাই বিদেশীদের ইজারা দিয়েছো। ঘুষ কতো খেয়েছো জানি না। সাইফুর রহমানই কি ইন্ডিয়াকে কম কনসেশন দিয়েছেন? এই সব সত্য কথা বললে আমাকে কে পছন্দ করবে ? মওলানা মান্নানের ইনকিলাবও এখন পলিটেক্সে ফ্যাক্টর হতে চায়। ভেবেছিলো, আমি তাদের সমর্থন দেবো। আমি সেই লোক নই। সাদ্দামের বিরুদ্ধে কথা বললাম, অমনি ওরা পিছিয়ে গেলো। সাদ্দাম তো ওদের গডফাদার। বাগদাদ থেকে দিল্লীতে ফোন আসে, দিল্লী থেকে হাসিনার কাছে--মওলানা মান্নানের যেন অসুবিধা না হয়। এসব খেলা আমার জানা আছে। আমি শুনেছি, সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরীকে এরশাদ সবার সামনে জিজ্ঞাসা করেছে, আমার টাকায় বাড়িটা হয় নাই? সেই গিয়াস কামাল আবার খালেদা জিয়ার কাছ থেকে চাকরি নিয়েছে, বেনিফিট নিয়েছে। এখানে নীতি-আদর্শ কোথায়? খালেদা জিয়ার সঙ্গেও তো আমার যথেষ্ট খাতির আছে। কিন্তু আমার ওপর দুষ্কৃতকারীরা গুলি করার পর উনি একটা স্টেটমেন্টও তো দিলেন না। বলেন, এখন কার সাথে বসবো?

কিন্তু আপনি তো বেগম জিয়াকে আপনার নেত্রী বলে মেনে নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন।

গাঁইয়্যা চালাকি করবেন না। আমিও গাঁয়ের পোলা। খালেদা জিয়াকে আমি আমার নেত্রী বলি নাই। বলেছি, দেশনেত্রী। দেশের বর্তমান মুহূর্তে জনগণ তার নেতৃত্ব চায়, সে কথা বলেছি। আমার নেতা তিনজন। এক. ইমাম আবু হানিফা (রঃ)। রাজার কথায় প্রধানমন্ত্রী হননি, নির্যাতন সয়েছেন। দুই, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। গান্ধীর মতো হাঙ্কিপাঙ্কি করেন নি, ফজলুল হকের মতো সুবিধাবাদীও ছিলেন না। তিন. মওলানা ভাসানী। রাষ্ট্রচালাবার যোগ্যতা তার ছিলো না। তবে দেশপ্রেম ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সততা ও আন্তরিকতা ছিলো।

মওলানা ভাসানীর কথা উঠতেই কিছুটা স্মৃতিকাতর হয়ে গেলেন জনাব অলি আহাদ। অর্ধশতাব্দিব্যপ্ত রাজনৈতিক জীবনে 'হুজুরের' সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা টুকরো স্মৃতি রোমন্থন করলেন। হিরন্ময় সেসব স্মৃতিকথা শুনতে ভালোই লাগছিলো। মাঝে একবার বেগম অলি আহাদ অসুস্থ শরীর নিয়েই আমাদের জন্য নিয়ে এলেন চা-বিস্কুট। বিদুষী পত্নীকে দেখে খানিকটা অনুযোগ করলেন অলি আহাদ। বললেনঃ আমাকে ডাকলেই হতো, চা নিয়ে আসতাম। কঠিন মানুষটির কথায় মমত্ববোধ ও ভালোবাসা ঠিকরে বেরুলো। আমরা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে শুনছিলাম তার কথা। বললেনঃ মওলানা ভাসানী ছিলেন শিক্ষিতেরও বাবা। হয়তো হ্যারল্ড লাস্কি খুলে পড়েননি। তবে তাঁর 'সিক্সথ সেন্স' ছিলো প্রখর। জেলখানায় তাকে নিয়মিত দেখেছি 'স্টেটস্‌ম্যান' কাগজ পড়তে। যা' হোক হুজুর লেখাপড়া কতটুকু জানতেন সেটা বড় কথা নয়, তাঁর প্রজ্ঞা ও জ্ঞান ছিলো অনেকের চেয়ে বেশি।

প্রচণ্ড এন্টিএস্টাব্লিশমেন্ট হিসাবে খ্যাত চিরবিদ্রোহী রাজনীতিক অলি আহাদ নিজের সম্পর্কে বললেন, আমি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের জানবাজ লোক। ১৯৭১-এ গোলাম আযমের চাচাতো ভাই শফিকুর রহমান আমাকে মারতে চেয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে এদেশে মুক্তিযুদ্ধের নামে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিলের যে খেলা চলছে তাতে ব্যথিত হই। শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে রাজনীতি করেছেন। জিয়াউর রহমানও সেটা করেছেন। কিন্তু পাবলিক কোনো সুবিধা পায়নি। তবে একটা কথা সত্য, এরশাদ ও খালেদা জিয়ার সরকার মুক্তিযুদ্ধ ব্যাপারটা একেবারে আড়ালে ঠেলে দিয়েছিলো। হাসিনার সময়ে আর কিছু না হলেও মুক্তিযুদ্ধের কথা লোকে শুনছে।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ জিয়ার অবদানের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে জনাব অলি আহাদ অকপটে বলেন, আমি জিয়াউর রহমানের যতো বিরোধিতাই করি, একথা সত্য যে, জিয়াই রেডিওতে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। সেই দুঃসময়ে সাংবাদিক, আবদুল গাফফার চৌধুরী প্রথম আমাকে এ সংবাদ দিয়েছিলো। গাফফার এসে বললোঃ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। রেডিওতে মেজর জিয়া ঘোষণা দিচ্ছেন।' গাফফারই রেডিও খুলে আমাকে জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার বক্তৃতা শোনালো। তখন জিয়াকে চিনতাম না আমি। কিন্তু দেখলাম, তার ঘোষণা শুনে মানুষ আপ্লুত। সবাই তার প্রশংসা করছে। এমনকি আমি আগরতলা যাবার পথে, লঞ্চে যানবাহনে সবখানে লোকমুখে শুনছিলাম জিয়ার সুখ্যাতি। তাঁর ঘোষণা লোকজনকে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করেছিলো।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রধান স্থপতি হওয়া সত্ত্বেও অলি আহাদ রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতির কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান, মর্যাদা ও স্বীকৃতি পাননি। এরজন্য তাঁর কোনো খেদ বা গ্লানি নেই। নিজেকে ব্যর্থ রাজনীতিকও মনে করেন না তিনি। বললেনঃ আমাকে কে কি দিলো, না দিলো সেটা কোনো ভাবনার বিষয় নয়। জিয়া এবং হাসিনার একুশে পদক দেয়ার প্রস্তাব আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। জিয়াউর রহমান এস. এ বারী এটি কে আমার বাসায় পাঠিয়েছিলেন। আমি তখন বাসায় একা। চা খাওয়াবার লোকও নেই। বাসায় ছিলো বসার মতো চারটা বেতের চেয়ার মাত্র। ওগুলো আমাকে প্রেজেন্ট করেছিলো তাহের উদ্দীন ঠাকুর। তো, বারী আসলো আমার বাসায়। বললো, জিয়াউর রহমান পাঠিয়েছেন তাকে। আমাকে একুশে পদক দিতে চায়। আমার তো আবার ঘাড়ের রগ ত্যাড়া আছে। বললাম, বারী তুমি তো একসময় আমার ওয়ার্কার ছিলে। ধান্ধাবাজ মশিউর রহমানের লোক হয়ে এখন জিয়ার প্রস্তাব নিয়ে এসেছো আমার কাছে। এরকম প্রস্তাব আমাকে মুজিব ভাই দিলে কথা ছিলো। তার সঙ্গে রাজনীতির মিল ছিলো না। ঝগড়া-মারামারি হয়েছে। তবুও তার কথা আলাদা। আর, আমাকে কথা বলে রাজী করাতে পারতেন মওলানা ভাসানী। হুজুর বললে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক সময় তার কথা মানতাম। তোমার কথায় আমি রাজী হবো ভাবলে কি করে?

হাসিনাও ক্ষমতায় এসে আমাকে একুশে পদক দেয়ার চেষ্টা করেছিলো। একদিন গাজীউল হক গাঁইগুঁই করে বলার চেষ্টা করলো। পরে ফোন করলো মোস্তফা সরোয়ার। ওকে ছোটো ভাইয়ের মতো স্নেহ করি। ফোনে বললোঃ 'অলি আহাদ ভাই, আপনাকে পদক দিতে চায় হাসিনা। কেউ প্রস্তাব নিয়ে আপনার কাছে যেতে সাহস পায় না। আবার অনুমতি ছাড়া দিলে আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন, সেটা সবাই বোঝে। তাই, আপনার সম্মতি চাই।' আমি ওকে বললাম, আমি এখন-হুঁ-না কিছুই বলবো না। ঘোষণার পর বলবো নেব কি-না। আমার এই কথার পর, আর দেয় নাই। তবে, হাসিনার আমলে একুশে উপলক্ষে আমাকে টেলিভিশনে প্রতিবারই দেখিয়েছে। খালেদা জিয়ার আমলে একবারও দেখায় নাই।

বেগম জিয়ার সরকার আপনার সঙ্গে কখনো কোনো যোগাযোগই রাখেনি?

উনি আমাকে কেন পাত্তা দেবেন ? রান্নাঘর থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত হতে তো উনার কোনো সাহায্য নিতে হয়নি আমার কাছ থেকে। কাজেই ক্ষমতায় থেকে আমাকে কেন কেয়ার করবেন ? অবশ্য কোনো যোগাযোগ কেউ করেনি তা' ঠিক না। বেয়াদব নাজমুল হুদা একবার আমাকে ফোন করে বললোঃ অলি আহাদ ভাই, আমরা আপনাকে ইউজ করতে চাই।' আমি ফোন রেখে দিলাম। হুদা আসলে লোক খারাপ নয়। ওর অনেক গুণও আছে।

www.pathagar.com

তবে কথাটা ভালো করে বলতে জানে না। মীর্জা আব্বাসও একবার আমাকে ফোনে কি কি জানি সব বলার চেষ্টা করেছিলো, ভুলে গেছি। তাছাড়া বিএনপি'র আবদুল্লাহ আল নোমান জাতীয় কেউ কেউ আমার বাসায় এসে বিভিন্ন সময়ে নানারকম কথা বলেছে, পরে কথা রাখতে পারেনি, আর আসেওনি। শুনেছি, বিএনপি'র কেউ কেউ নাকি খালেদা জিয়াকে প্রস্তাব দিয়েছিলো জাস্টিস সাহাবুদ্দীনের বিরুদ্ধে আমাকে প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট করার। ওরা বলেছিলো, সাহাবুদ্দীন সাহেব জিতলে জিতুন, তবুও আমাদের উচিত হবে অলি আহাদ ভাইকে দাঁড় করানো। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তারা ক্যান্ডিডেট না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আমার কাছেও কেউ প্রস্তাব নিয়ে আসেনি।

শেখ হাসিনার সরকার একুশের পদক দেয়ার প্রস্তাব ছাড়া আর কোনো ব্যাপারে কি কখনো আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে?

করেছে। তবে আমি ডিটেইল বলবো না। শুধু এটুকু বলবো, গাড়ি-ঘোড়ায় বসে আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার কথা পরিষ্কার। কোনো আলোচনার আগে আমার টার্মস মানতে হবে। টার্মস্ মানলে পরে আলোচনা। আমি সাফ বলেছি, শেখ হাসিনা আমার ভাতিজী হিসাবে যে কোনো সময় আমার বাসায় বেড়াতে আসতে পারে। তবে আমার সঙ্গে কোনো ব্যাপারে আলোচনা করতে হলে তাকে আগে আমার টার্মস্ মানতে হবে।

দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জনাব অলি আহাদের স্পষ্ট অভিমত হচ্ছে, আমরা এখন ইন্ডিয়ার পায়ের তলে চলে গেছি। সেখান থেকে বের হওয়া কঠিন। আমার অর্থ নেই। টাকার অভাবে জনসভা করতে পারি না। কিন্তু আমি জানি, তিন মাসের মধ্যে আমি যদি ৭/৮টি জনসভা করতে পারি তাহলে দেশের রাজনীতির চেহারা পাল্টে যাবে। খালেদা জিয়াও তখন মরিয়া হয়ে ময়দানে নামবেন। অথচ উনি যদি আমার কথা শুনতেন তাহলে দেশের অবস্থা এতোটা খারাপ হতো না। অনেক আগেই ক্ষমতা থেকে হাসিনা পড়ে যেতো। কিন্তু একটার পর একটা মিস্ট্রেক করলেন খালেদা জিয়া। গ্রাসরুট ইলেকশন বর্জনের আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত নিলো বিএনপি'র মতো একটা পার্টি। সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর কথায় পার্লামেন্ট থেকে রিজাইন করার মারাত্মক ভুল উদ্যোগও একবার নেয়া হয়েছিলো। সে সময় বদরুদ্দোজা চৌধুরীরা বেঁকে বসলেন। পদত্যাগপত্র সাবমিট করা হবে না--এই শর্তে পরে তারা সই করলেন। এগুলো কি পার্লামেন্টারি পলিটিক্স ? সাধারণ লোক পার্লামেন্ট বর্জন পছন্দ করেনি। আর আন্দোলন করতে পারলে, গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করতে পারলেও একটা কথা ছিলো। যাদের পার্টির ১১৬ জন এমপি তারা ১৪৪ ধারা ভাংতে পারে না---এটা কোনো কথা হলো ? ওই রকম শক্তি-সর্মথন ও অর্থ আমার থাকলে আমাকে কেউ আটকাতে পারতো না।

মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তীব্র রাজনৈতিক বিরোধ ছিলো জনাব অলি আহাদের। তবুও মুজিবের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা তাঁর। বললেন, আমার নেতা মওলানা ভাসানীর জন্য মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আমার অনেক ঝগড়া হয়েছে, মারমার কাটকাট হয়েছে। তবুও মুজিব ভাই মুজিব ভাই-ই। উনি আমাকে জেলে পর্যন্ত দিয়েছেন কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিলো অটুট। হুজুরকে ছেড়ে গিয়ে একাই সফল হয়েছিলেন মুজিব ভাই। তাঁরও সিক্সথ্ সেন্স ছিলো প্রখর। নেতৃত্বের যোগ্যতা ছিলো। আমি রাজশাহী জেলে। মুজিব ভাই জনসভা করতে গিয়ে রাজশাহীতে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এখানে আমার নেতা অলি আহাদ কারাগারে।' এমন কথা

www.pathagar.com

কেবল তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব। মুজিব ভাই বিভিন্ন সময় আমাকে দেখতে জেলখানায় যেতেন ভাবীকে সঙ্গে নিয়ে। ভাবী নিজ হাতে তৈরি খাবার নিয়ে যেতেন। কেবিনেটে নেয়ার জন্য তিনি আমাকে কম টেনেছেন ? তিনি বলতেনঃ 'এই মুজিব ভাই ছাড়া তোমাকে কেউ কিছু দেবে না।' কথা তো সত্য। আমার নেতা ভাসানীও তো আমারে না জিগাইয়া আইয়ুবের সঙ্গে কথা বলতে চলে গেছেন।

শেখ মুজিবের শাসনামলে জনাব অলি আহাদ 'আজাদ বাংলা'র ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর আহ্বান ছিলোঃ 'দিল্লীর দাসত্বের শিকল থেকে এ বাংলাকে আজাদ করতে হবে।' তিনি বলতেনঃ 'পিণ্ডির গোলামীর শৃঙ্খল ভেঙ্গেছি, দিল্লীর শেকলও ছিঁড়তে হবে।' ওই আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি কারারুদ্ধ হয়েছেন। সে সব প্রসঙ্গ তুলতেই জনাব অলি আহাদ বললেন, আমি বরাবর দিল্লীর আধিপত্যের বিরুদ্ধে। আর সে কারণেই মুজিব ভাইকে রেসপেক্ট করি। তিনি না আসলে ভারতীয় সৈন্য এখান থেকে যেতো না। উনি না আসলে আমাদের যে সমস্ত অফিসার '৭১-এ ভারতে যায়নি তারা সবাই ডিস্‌মিস্‌ড্ হতেন। শূন্যস্থান পূরণ করতো ভারতীয় অফিসাররা। প্ল্যানমাফিক তারা বর্ডারে এসে পৌছেও গিয়েছিলো। বাঙ্গালী মুসলমানদের শতকরা ৯৫ জন চাকরি হারাতেন। আমি মুজিব ভাইকে শ্রদ্ধা করবো না তো কাকে করবো? জনাব অলি আহাদ বললেন, হাতির আসল দাঁত থাকে ভেতরে। সেগুলো দেখা যায় না। বাইরে যে দু'টো দাঁত দৃশ্যমান থাকে তা' শোভামাত্র। এ দু'টোকে আসল ভাবলে ভূল হবে। রাজনীতিতেও এরকম ব্যাপার আছে। মুজিব ভাই ক্ষমতায় থাকতে রাতের বেলা গাড়ির ফ্ল্যাগ নামিয়ে চুপিসারে টাঙ্গাইলে যেতেন মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করতে, হুজুরের পরামর্শ নিতে। '৭৫-এর ক্যু'র পর আমি জেল থেকে বেরুবার সময় পুলিশ এস্কর্টের লোক আমাকে সে কথা বলেছে। তখন তো মুজিব ভাই নেই। পুলিশের কোনো লাভও নেই মিথ্যা বলে। আমি তার কথা বিশ্বাস করেছি। তাছাড়া অন্য প্রমাণও পেয়েছি আমি। হুজুর বিভিন্ন বিষয়ে মুজিব ভাইকে সাপোর্ট করতেন। আমরা ক্ষুব্ধ হতাম। পরে বুঝেছি, হুজুর ঠিক কাজই করেছেন। তাঁর সঙ্গে মুজিব ভাইয়ের গভীর সম্পর্ক ছিলো।

কিন্তু আপনি তো কিছুদিন খন্দকার মোশতাক আহ্‌মদের সঙ্গেও দল করেছেন।

হ্যাঁ, করেছি। একত্রে ডি. এল করার আগে তাকে আমি খুব ভালো চিনতাম না। দিল্লীর বিরোধিতার প্রশ্নে আমি মোশতাককে সমর্থন দিই। পরে দেখলাম, মোশতাক একটা আস্ত চোর। রাজনীতি নয়, ষড়যন্ত্রই তার কাছে মুখ্য।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে জনাব অলি আহাদের মন্তব্যঃ ওর সাহস আছে। ভুল-শুদ্ধ যাই হোক, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সিদ্ধান্ত কার্যকরও করতে চায় তাড়াতাড়ি। বাবার প্রতি তার ফিলিংও প্রবল। এটা দোষের কিছু নয়, মানবিক ব্যাপার। পাকিস্তানের বেনজীরেরও সেটা আছে। তবে বেনজীর 'মোর পলিটিক্যাল।' পরিবার ও নিজের লোকের প্রতিও হাসিনার একপ্রকার গভীর ভালোবাসা ও আবেগ আছে। মিছিলে গুলি করে, মানুষ মারায় নেতৃত্ব দেয়া সত্ত্বেও ডাক্তার ইকবালকে সে ধরতে পারছে না তার ছোট বোনের জন্য। অবশ্য সব কিছুর ঊর্ধ্বে থেকে কঠোরভাবে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনেক বড় প্রশাসক হতে হয়। হাসিনা তো সেটা নয়। এখানে ব্যক্তি সম্পর্কের ভিত্তিতে সবকিছু চলে। কিন্তু দেশ ভালোভাবে চালাতে চাইলে মেরিটএর ভিত্তিতে সিলেকশন এবং পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে সব ক্ষেত্রে। নিক্তিটা ঠিক রাখতে হবে। কিন্তু কেউ

www.pathagar.com

সেটা ঠিক রাখছে না। এখানকার চীফ জাস্টিস পর্যন্ত বেশি কথা বলেন, ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারেন না। কারণ হাবিবুর রহমান শেলীর মতো লোক জিয়ার আমলে জজ হন। অন্যদের আমলেও একই রকম ঘটনা ঘটেছে, ঘটছে। এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। কেননা পরিবর্তনের কথা যারা বলে তাদেরও লক্ষ্য, পরিকল্পনা ঠিক নেই। কনসেপশন ক্লিয়ার নয়।

তাহলে কী করা দরকার?

সেটা আমি বলবো কেন ? বললেই সেটা শুনবে কে? আর এরকম কাগজে আমার কথা ছাপা হলেই বা কয়জন পড়বে? যুগান্তরের মতো একখানা কাগজ বের করেন, তারপর--

কিন্তু যুগান্তরের সম্পাদকীয় নীতির সঙ্গে তো আপনার আদর্শ মেলে না।

এইসব ইংরেজী-বাংলা কথা আমারে বুঝাইয়েন না। আমি বুঝি। দিনকালের মতো লিফলেটে কাম হইতো না। শয়তানি-বাঁদরামি যাই করুক, অপোজিশনের একমাত্র কাগজ এখন ইনকিলাব। এরপর যুগান্তর। ডাঃ ইকবালের নেতৃত্বে বিরোধী দলের মিছিলে গুলি চালাবার ফটো ছাপলে সেই গুলি যে হাসিনার বুকেই লাগে সেটা আমি বুঝি না মনে করেন? যুগান্তর অলারাও বোঝে। বুইঝাই ছাপছে। আপনি কইবেন, সার্কুলেশন ধরার জন্য। যে জন্যই হোক, সেটা জাইন্যা আমার কাম নাই। ছাপছে, ব্যস।

ঠিক আছে। অলি আহাদ ভাই এখন বলুন দেশের বর্তমান যে সংকটজনক অবস্থা সেখান থেকে মুক্তির পথ কি?

বললাম তো, কথায় কাজ হবে না। মুক্তির জন্য কাজ করতে হবে। এখন এখানে আমরা 'র' এবং 'আইএসআই'-এর, খেলার মধ্যে পড়ে গেছি। দু'দিকে দুই পক্ষ। ছাগলের তিন বাচ্চার দুইটা দুধ খায় আরেকটা তিড়িং বিড়িং করে লাফায়। আমি সেই লোক নই। আমাকে গভর্নমেন্টে বসান। দেখবেন, সমস্যা দ্রুত, সমাধান হবে। উপদেশে কাজ হবে না। কাজ করে দেখাতে হবে।

ক্ষমতায় বসে কী করবেন আপনি?

কী করবো আপনাকে বলে লাভ কী ? আগে বসান, তারপর দেখেন কী করি। আমি জানি কী করতে হয়। কিন্তু আমাকে কেউ ক্ষমতায় বসাবে না। লোকজন আমার জন্য কাজও করবে না। জনসভা করার জন্যও আমাকে কেউ টাকা দেবে না। কেননা সবাই জানে অলি আহাদ ক্ষমতায় গেলে ব্যক্তিসম্পর্ক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে না। চাকরি, ব্যবসা, ফেভার বিতরণ করবে না। কাজেই আমার কাছে লোক আসবে না। যারা ক্ষমতায় গেলে ফেভার করবে, মানুষ তাদের কাছেই যাবে। কাজেই তারা ক্ষমতায় আসবে। আমি কথা বলে লাভ কী? উপদেশে তো কাজ হবে না। ভেরি আন্ডারডেভলপ অ্যান্ড করাপ্ট কান্ট্রি আমাদের। এখানে চোর, ডাকাত, মুর্খরা পার্লামেন্টে বসে। সফিস্টিকেটেড পার্লামেন্টারি সিস্টেম এখানে চালানো কঠিন। আমি প্রধানমন্ত্রী হতে পারলে অবশ্য পরিস্থিতির উন্নতি করতে পারতাম। তবে আলটিমেটলি আমি প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমের পক্ষে। তবে এসব কথা এখন বলে লাভ নেই। ক্ষমতায় যেতে পারলে সুবিধামতো সময়ে সেটা করার পক্ষপাতি আমি।

একনাগাড়ে কথা বলছিলেন জনাব অলি আহাদ। মাঝে মধ্যেই আমাদের দু'একটি প্রশ্নের টোকায় রাজনীতির এই বীণায় ঝংকার উঠছিলো; কখনো উচ্চ কখনো ধীরলয়ে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপির ব্যাপারে অনেক ক্ষোভ তাঁর। বললেন, বিএনপি বলবেন না,

www.pathagar.com

বলুন খালেদা জিয়া। বিএনপি কিছু না। খালেদা জিয়ার প্রতিই মানুষের যা কিছু আস্থা। দেখেন, বিএনপি আমাকে একুশের আলোচনায় টেলিফোনে দাওয়াত করে। আমি যাইনি। নোমানকে বললাম, দায়সারা দাওয়াতে যাওয়ার লোক আমি নই। আমি ৭ দলে আছি। পল্টনের জনসভার পোস্টার, পত্রিকার বিজ্ঞপ্তিতে আমার নাম থাকে না। আমাকে ফোনে ডাকে। আমি যাই না, চেয়ার খালি থাকে। ঘরোয়া মিটিং টিটিংয়েও কম যাই। আজেবাজে লোক আর মোল্লাদের সঙ্গে বসে কথা বলে লাভ কী? খামোখা সময় নষ্ট করা। আমি তো মওলানা ভাসানী, নাজিমউদ্দিন, সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করেছি। ফজলুল হককেও ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি। তবে তাকে ঘৃণা করতাম। বর্তমানে দেশের জন্য খালেদা জিয়ার কিছুটা আন্তরিকতা আছে বলে মনে করি। উনি ক্ষমতায় থাকতে আমার খবর না রাখলেও এখন মাঝে মাঝে খোঁজ নেন। আমার কথা তেমন না শুনলেও যোগাযোগ রাখেন। কেন রাখেন জানিনা, সেটা তিনিই ভালো বলতে পারবেন। খালেদা জিয়ার সঙ্গে কথায় বুঝেছিলাম, এরশাদ ও মোল্লাদের ব্যাপারে তার রিজার্ভেশন আছে। উনি নিজে আমাকে বলেছিলেন, মোল্লাদের সঙ্গে নিলে ক্ষমতায় আসা যাবে না। ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড সমর্থন করবে না। পরে তাদের সঙ্গে জোট কেন করলেন বুঝি না। আমার ধারণা, বিএনপিতে এখন রাজাকাররা আপার হ্যান্ডে আছে। ওরা বেগম জিয়াকে কব্জায় রাখতে চায়। আমি মান্নান ভূঁইয়াকে বলেছি, 'ও মিয়া, তুমি তো মুক্তিযোদ্ধা। অন্যেরা যাই করুক। তোমরা রাজাকারদের লগে দহরম-মহরহম করো কিভাবে? মান্নান ভূঁইয়া আমারে কয়, 'অলি আহাদ ভাই, এই বয়সেও আপনার যে সাহস সে সাহস আমার নাই।' আসলে এরা পদ-পদবীর জন্য কম্প্রোমাইজ করে চলছে। তবে, আমি মনে করি, ক্ষমতায় থাকতে খালেদা জিয়া যাই করুন এখন উনি অনেক বেশি মেচিউরড্। শেষ পর্যন্ত উনি রাজাকারদের কব্জা থেকে বেরিয়ে আসবেন।

চলমান রাজনীতি সম্পর্কে জনাব অলি আহাদ বললেন, এখন সময় বদলে গেছে। শুধু জিয়ার নামে রাজনীতি চলবে না। মওলানা ভাসানীর আদর্শকে সামনে রাখতে হবে। আমি মনে করি, দিল্লীর আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক হচ্ছেন মওলানা ভাসানী। ভাসানী-জিয়া-খালেদার নামে রাজনীতি হলেও আমার আপত্তি নেই। তবে হুজুরকে বাদ দিয়ে নয়। তাছাড়া এতোটা জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা পাবার ক্ষেত্রেও জিয়ার পেছনে ছিলো হুজুরের সমর্থন।

জনাব অলি আহাদ বলেন, জিয়া রাজনীতি শুরুর আগে মোশতাকের পক্ষ থেকে ন্যাশনাল ইউনিটির একটা প্রস্তাব নিয়ে আমি আর মশিউর রহমান গিয়েছিলাম সন্তোষে। হুজুর আমার কম বুদ্ধিমান তো ছিলেন না। আমাদের দেখেই মতলব বুঝে ফেলেছেন। কথা পাড়ার আগেই বললেন, 'জিয়া আইছিলো হেলিকপ্টার লইয়া। কাইল আবার আইবো।' আমরা বুঝে গেলাম, মোশতাকের প্রস্তাবে কোনো কাজ হবে না। জিয়া আগেই হুজুরের সমর্থন ও আর্শীবাদ পেয়ে গেছেন। সেই ইশারাই তিনি আমাদের দিলেন। কাজেই, প্রস্তাবে ক্ষ্যান্ত দিয়ে হুজুরের বাড়িতে ভাত খেয়ে আমরা চুপচাপ ফিরে এলাম।

কিন্তু অলি আহাদ ভাই, খালেদা জিয়া এখন বিরোধী দলের নেত্রী। আপনিও বললেন, জনগণের যা কিছু আস্থা সেটা তার ওপরেই। তাঁর সাফল্যের ওপর দেশের ভবিষ্যৎও অনেকখানি নির্ভরশীল। সুতরাং আপনার মতে কী করা উচিত তাঁর?

www.pathagar.com

সে সাজেশন আমি কেন দেবো ? আমি তো তার উপদেষ্টা নই। সোহরাওয়ার্দীকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো লিয়াকত আলীর এখন কী করা উচিত? সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব বললেন, 'আই অ্যাম নট হিজ অ্যাডভাইজার। উনি সরে যাক, আমাকে ক্ষমতায় বসাক। আমি করে দেখিয়ে দেব কী করতে হবে।'

কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন লিয়াকত আলীর প্রতিদ্বন্দ্বী। আপনি তো আর বেগম জিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী নন।

সেইটা ঠিক কইছেন। কিন্তু কথা হলো উনি আমার কথা শুনবেন কেন? দেখেন, এর আগে যতো কথা কইছি শোনেন নাই তো। আমি বলেছিলাম, পার্লামেন্টারি পলিটিক্স যদি করেন তাহলে এক কথা। না করলে আপনাকে গণঅভ্যুত্থানের পথে যেতে হবে। কোনোটাই করবেন না কিংবা দু'টোই খাপছাড়া ও আনাড়িভাবে করতে যাবেন, হবে না। আমি বেগম জিয়াকে বলেছিলাম, পার্লামেন্টে গভর্নমেন্টের 'বিরুদ্ধে নো-কনফিডেন্স' মোশান মুভ করার প্রস্তুতি নিতে। আমি নিজে খোঁজখবর করে দেখলাম, নানা কারণে ক্ষুব্ধ ট্রেজারি বেঞ্চের ৪০ থেকে ৪৫ জন এমপি পাওয়া যাবে। অবশ্য গোড়াতেই তারা খালেদা জিয়ার সঙ্গে বসার ঝুঁকি নিতো না। আমি কাদের সিদ্দিকীকে বললাম, 'ডোন্ট রিজাইন।' ওরা ৪০/৪৫ জনকে একত্র করতে পারতো। কিন্তু বেগম জিয়াই আগালেন না। বললেন, ওতে লাভ হয় না। ওরাও আমাদের আমলে 'নো কনফিডেন্স' প্রস্তাব এনে ফেল করেছে। আমি বললাম, খেলায় হারজিত থাকে। শতকরা একশ' ভাগ সাফল্যের গ্যারান্টি নিয়ে কেউ খেলতে নামে না।

তারপর অপোজিশন পার্লামেন্টে থাকতে পারলো না। আমি মনে করি, থাকা উচিত ছিলো। বিদেশেও পার্লামেন্টে কতো উত্তেজনা, হট্টগোল হয়। বিদেশের অনুকরণ দরকার নেই। প্রতিবাদের নিজস্ব ধারা তৈরি করে সরকারের ওপর চাপ রাখার জন্য পার্লামেন্টে বিরোধী দল থাকলেই ভালো হতো। যা হোক, তারা পার্লামেন্ট ছাড়া হবার পর আমি বললাম গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টির পথে আগাতে। বললাম, আপনাদের কমপ্লেইন হচ্ছে সরকারী সন্ত্রাসের ভয়ে নেতা-কর্মীরা রাস্তায় নামতে পারে না। ঠিক আছে, প্রেসক্লাবের মতো কোনো জায়গায় আপনি আমরণ অনশন শুরু করেন। নেতা-কর্মীরা সেখানে ভিড় করবে। তিনদিন, পাঁচদিন, সাতদিন অনশন করুন। দেখবেন ১০-২০-৫০ করে লাখো লোক জড়ো হয়ে যাবে। তাদের বলুন এখানে এসে আমাকে চেহারা দেখিয়ে লাভ নেই, রাস্তায় নামো। তারা নামতে বাধ্য হবে। আপনার অনশন আন্তর্জাতিক সংবাদ হবে। সারা দেশে নাড়া পড়ে যাবে। সরকারের ভিত কাঁপবে। আমি খালেদা জিয়া হলে তাই করতাম। কিন্তু তিনি শুনলেন না। পরে বললাম, ঠিক আছে অনশন না করেন পল্টনে জনসভা করার ব্যবস্থা করে দেন আমাকে। আমি সভা করবো। আপনি থাকবেন চিফ গেস্ট। আপনার জন্যই সভায় লোক আসবে। একের পর এক সভা হবে। সভা থেকে কর্মসূচি দিয়ে আন্দোলনকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নেয়া হবে। সেটাও উনি করলেন না।

তাহলে বিরোধী দল ব্যর্থ হয়েছে বলে কি আপনি মনে করছেন?

ব্যর্থ বলবো না তবে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। তারা ভুল না করলে সরকার অনেক আগে পড়ে যেতো। এটা আমার বিশ্বাস। কারণ, আওয়ামী লোকের পেছনে মানুষ নেই। তবে তাদের শক্ত কিছু পকেট আছে। এনজিও, সাংস্কৃতিক সংগঠন, নারী সংগঠন, সংখ্যালঘু, মিডিয়া ও অফিসার পকেট। এদের দিয়ে ছক সাজিয়ে আওয়ামী লীগ নেক্সট ইলেকশনেও

www.pathagar.com

মিডিয়া ক্যু করে জিততে চায়। এরকম একটি সরকারকে সংসদে অনাস্থার মাধ্যমে কিংবা রাস্তায় গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অনেক আগেই নামানো যেতো। বিরোধী দল সেটা করতে পারেনি সাহস ও সঠিক পরিকল্পনার অভাবে। তবে, আমার ধারণা পরবর্তীতে ক্ষমতায় যাবার ব্যাপারে খালেদা জিয়ার প্ল্যান ঠিকই আছে। নৈতিক প্রশ্নে জাপা-জামায়াতের সঙ্গে জোটকে আমি সমর্থন না করলে কি হবে? ক্ষমতায় যাবার ব্যাপারে এটা একটা মোক্ষম কৌশল। বুদ্ধি করে খালেদা জিয়া জাপা-জামায়াতকে আটকে রেখেছেন। এখনো ওরা কেউ দেড়শ' কেউ ৮০ সীট নিয়ে দরকষাকষি করছে। কিন্তু তিনশ' সীটে বিএনপির নিজেদেরই অন্ততঃ দু'হাজার প্রার্থী আছে। ঠিকমতো গেইম খেলতে পারলে জাপা-জামায়াত জিরো হয়ে যাবে। তাছাড়া খালেদা জিয়ার একটা বড় শক্তি হলো বিরাট জনসমর্থন আছে তার। তার মাথায় এখন ভোটের পলিটিক্স, ক্ষমতায় যাবার চিন্তা। ভোটের সময় গুণ্ডা এবং টাকা লাগে। খালেদা জিয়ার তাও আছে। ভুট্টোর মতো ওই শক্তিও তিনি কাজে লাগাবেন এবং জিতে আসবেন। নৈতিকতার প্রশ্নে এগুলো আমাদের কাছে ভালো না লাগলেও নির্মম বাস্তবতা হচ্ছে এটাই।

নিজের রাজনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে জনাব অলি আহাদ বলেন, আমি নিজে থিওক্র্যাটিক লোক নই। মোল্লাতন্ত্রে বিশ্বাস করি না। পিওর ডিমোক্রেসি চাই আমি। ইসলামিক স্টেট চাই না। তবে দেশে মুসলমানের স্বার্থ চাই- জিন্নাহ্ সাহেবের মতো। বাংলাদেশে এখন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বলতে গিয়ে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম বারবার আসে ভারতকে খুশি করবার জন্য, অথচ প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাসেমের নাম থেকে যায় অনুচ্চারিত। এই মনোবৃত্তি দুঃখজনক। এটা ইতিহাসের বিকৃতি তো বটেই, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধেরও পরিপন্থী। কেননা এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই মুসলমান।

লেখক, সাংবাদিক, অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ সম্পাদক জননেতা অলি আহাদ বললেন, নাজিমুদ্দিন, নুরুল আমিনের মতো লোক দিয়ে রাজনীতি হয় না এদেশে। অতোটা নিরীহ, কোমল, ভদ্রলোক দিয়ে সুবিধা হবে না। সফিসটিকেশন আমারও আছে। তবে সেটা অজায়গায় দেখিয়ে লাভ কী? এদেশে প্রভাবশালী লোকেরা নিজের স্বার্থটা ভালো বুঝলেও তাদের মুর্খতা প্রকট। 'আ' বললেই যদি আকাশ' না বোঝে তাহলে সেসব 'মোটা মাথার' লোকের সঙ্গে কথা বলা আমি পছন্দ করি না।

কথায় কথায় অনেক সময় গেলো। তিনটায় এসেছিলাম, ঘড়িতে তখন সোয়া ৬টা। সোয়া তিন ঘন্টা সময় এর মধ্যে চলে গেছে টেরই পাইনি আমরা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শেষবারের মতো বললামঃ অলি আহাদ ভাই, দেশ এক মহাদুঃসময় পার করছে। চারদিকে আতঙ্ক, মানুষ অসহায়। এই দুর্দিনে আপনার মতামত ও পরামর্শ খুবই মূল্যবান। রাজনৈতিক অঙ্গনে অর্ধশতাব্দি ধরে বিচরণ করে আপনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তার নিরিখে আপনি বলুন, বিরোধী দলের এখন কী করা উচিত ?

বিনয় কাজে লাগলো। কিছুটা নরম হলেন তিনি। বললেন, খালেদা মাস্ট গো টু দ্য পার্লামেন্ট। হাসিনার আহ্বানের পর যে সুযোগ এসেছে সেটার সদ্ব্যবহার করতে হবে। উনি পার্লামেন্টে গিয়ে বলবেন, তুমি বলেছো, আমি এসেছি। আমি ভোট চাই অবিলম্বে।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যদি না মানেন?

হাসিনা না মানলে? খালেদা জিয়া সব বিরোধী দল থেকে প্রতিনিধি নিয়ে আমার নেতৃত্বে

www.pathagar.com

সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি করে দেবেন। ক্ষমতায় উনিই যাবেন। শুধু আন্দোলনটা আমার নেতৃত্বে করার নির্দেশ দেবেন সবাইকে। দেখুন আমি কি করি।

প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো বলেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বললেনঃ অনেক কথা হয়েছে, আর নয়। আমার আসরের নামাজও কাজা হয়ে গেছে।

দুঃখ প্রকাশ করে এরজন্য দায় স্বীকার করলাম আমরা। অলি আহাদ ভাই বললেন, ঠিক আছে, আপনারা দায়ী নন। তবে শোনেন, নামাজ কাজা হলে আল্লাহ মাফ করতে পারেন কিন্তু মোনাফেককে মাফ করেন না। আমাদের দেশে মোনাফেকের সংখ্যা বেশি।

সিঁড়ির গোড়া পর্যন্ত আমাদেরকে এগিয়ে দিয়ে বিদায় জানালেন। চার তলা থেকে নিচে পর্যন্তই আসতে চাচ্ছিলেন। স্পষ্টভাষী মানুষটির সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে আমরাই আপত্তি করলাম। রাস্তায় নামতেই ফাগুনের দক্ষিনা হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে গেলো। ব্যক্তিত্বের প্রখরতায় আচ্ছন্ন আমরা দু'জন প্রেসক্লাবের উদ্দেশে রিকশা নিলাম। চারদিকে তখন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার ফুঁড়ে একের পর এক জ্বলে উঠছে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো। সব কোলাহল ছাপিয়ে মসজিদের নগরীর দিক-দিগন্ত মুখর করে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ভেসে আসছে সুউচ্চ আজান ধ্বনি হাইয়্যা আলাল ফালাহ্। কল্যাণের পথে এসো।

[২৩ ফেব্রুয়ার, ২০০২ সাপ্তাহিক উষা পত্রিকায় সাক্ষাৎকারটি ছাপা হয়। পত্রিকার সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক মারুফ কামাল খান সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন।]

www.pathagar.com

দৈনিক ইনকিলাবের গোল টেবিল বৈঠকে অলি আহাদ

[১৫ই মে '৯৯ জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভি,আই,পি লাউঞ্জে দিনব্যাপী "বাংলাদেশঃ রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্কট" শীর্ষক দৈনিক ইনকিলাবের গোল টেবিল বৈঠকে অংশ নিয়েছেন দেশের বরেণ্য রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমরনায়ক ও সাংবাদিক যাঁরা বক্তব্য রাখেন তাঁরা হলেনঃ সর্বজনাব অলি আহাদ, কাজী জাফর আহমদ, আনোয়ার জাহিদ, সাদেক খান, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, হাসানুল হক ইনু, লেঃ জেঃ (অবঃ) মাহবুবুর রহমান, প্রফেসর আবদুল গফুর, প্রফেসর ডঃ মাহবুব উল্লাহ, প্রফেসর ডঃ আফতাব আহমদ, মোবায়দুর রহমান, প্রফেসর আবদুন নূর, ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রব। স্বাগত ভাষণ রাখেন- এ.এস.এম. বাকী বিল্লাহ, সমাপনী বক্তব্য রাখেন-এ,কে,এম মহিউদ্দিন, গোল টেবিলের মডারেটর ছিলেন আবদুল হাই শিকদার।]

আবদুল হাই শিকদারঃ আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান জননেতা চিরবিদ্রোহী, আপষহীন অলি আহাদের বক্তব্য আশা করছি।

অলি আহাদঃ মাফ করবেন, একটু সময় নিলাম। আমার তো ক্রনিক ব্রংকাইটিস। ফলে আমার লাঞ্চ কাজ করে না, কষ্ট হয়। আজকে শ্রদ্ধেয় গুণীজন, বিজ্ঞজন, আপনারা উপস্থিত। আপনাদের বক্তব্য শুনতে পেরে আমি নিজেকে এডুকেটেড ফিল করি। আমার তরফ থেকে আপনাদের দেয়ার কিছু নেই। শেখাবার মত কিছু নেই। আমার শিখবার ছিল, আমি শিখেছি। একটি কথা আজকে বলতে হয়, ইনকিলাব- আজাদী যুদ্ধে কায়দে আযমের নেতৃত্বে যেদিন আমরা পাকিস্তান আন্দোলন করি, ছাত্র অবস্থায় তখন আজাদ ছিল সমগ্র মুসলমান বাঙালীদের একমাত্র পত্রিকা এবং সেই পত্রিকা ঘরে ঘরে আলো জ্বেলে দিয়েছিল। যে স্বাধীনতা-আজাদীর ফলে আমরা পাকিস্তান লাভ করি। পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনি করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে একটি পত্রিকার আবির্ভাব হয়, তার নাম ইত্তেফাক। দৈনিক ইত্তেফাক, মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা। সেই পত্রিকাও ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে ঘরে ঘরে পৌছে গিয়েছিল এবং স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত, ৬ দফা আন্দোলন পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়ে গেছে এবং জনগণ তার বাণীকে গ্রহণ করেছে। সে অনুযায়ী একাত্তরের যুদ্ধে জয়লাভও করেছে। আজকে আবার যখন ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, আগ্রাসনবাদের বিরুদ্ধে, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের জনগণ সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে তখন একটি পত্রিকার আবির্ভাব আমাদের চোখের সামনে সেটি হল দৈনিক ইনকিলাব। দৈনিক ইনকিলাব না হলে, যেভাবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ দেশকে গ্রাস করে ফেলেছে, এমনকি ইত্তেফাককে পর্যন্ত গ্রাস করে ফেলছে, সেখানে বাংলার জনগণের কথা বলার কোন সুযোগ থাকত না এবং সেই কথা ঘরে পৌছাবারও কোন সুযোগ থাকত না। সেই ইনকিলাব আজকে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, জাতীয় অস্তিত্ব এই প্রশ্নে একটা গোলটেবিল বৈঠক আজকে ডেকেছে, ইনকিলাবের কর্তৃপক্ষকে, ইনকিলাবের সাথে যারা জড়িত সেই বন্ধুদেরকে, শ্রদ্ধেয় বন্ধুদেরকে আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং ধন্যবাদও জানাই।

www.pathagar.com

প্রতিপাদ্য বিষয়ে আমি যা বলব তার চেয়ে অনেক বেশী বলে ফেলেছেন জ্ঞানী ব্যক্তিরা, আমি তো জ্ঞানী নই। কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন সময়ে রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম বলে আমার নিজের ব্যক্তিগত কিছু কিছু ধ্যান-ধারণা কিম্বা-চেতনা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেন, একটি কথা মনে রাখতে হবে ৬ দফা আন্দোলনে যখন সমগ্র বাংলাদেশের জনগণ ভোট দিয়ে সমর্থন জানিয়ে গণপরিষদ অর্থাৎ জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদে সদস্যদের পাঠিয়ে তখনি ৬ দফা ঘরে ঘরে পৌছে গেল। এখন এই ৬ দফাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে গ্রহণ করার বাধা আসার ফলে, সামরিক জান্তাদের কারণেই পাকিস্তান ভেঙ্গে গেল। এখন আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ে আমি যাই, মুক্তিযুদ্ধ যখন মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়, ৬ দফার শান্তিপূর্ণ আন্দোলন জনগণের আন্দোলন সশস্ত্র যুদ্ধে পরিণত হয়, তখনি আসে ইন্দিরা গান্ধী আমাদের চোখের সামনে। হানাদার বাহিনী ২৫শে রাতে আঘাত হানার পরে গণপরিষদ সদস্যরা একে একে দেশ থেকে হিন্দুস্থানে আশ্রয় গ্রহণ শুরু করে, তার সাথে কিন্তু হানাদার বাহিনীর আক্রমণের সামনে তাদের বিরুদ্ধে বৈদ্যনাথপুরের গণপরিষদের শপথনামায় সেখানে বলা হয়েছে, আমরা গণপরিষদের সদস্য যারা জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলাম এবং প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলাম; সমন্বিতভাবে একটা গণপরিষদ গঠন করেছি। সেই গণপরিষদের শপথনামায় এই স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। তার মধ্যে লেখা ছিল, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। এ কথা সর্বৈব মিথ্যা। এ কথা তিনি ঘোষণা করেননি। তা সত্ত্বেও এই মিথ্যা কথাটা ক্রমাগত প্রকাশ করা হয়। তিনি আত্মসমর্পণ করেন হানাদার বাহিনীর কাছে এবং পাকিস্তানের ভূখণ্ডে চলে গেলেন। আমাদের সামনে তখন সংগ্রামের যুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের তৎকালীন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যরা, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর সদস্যরা, পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা, আনসার বাহিনীর সদস্যরা মিলিতভাবে সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর নেতৃত্বে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে মার্চ মাসের ৩০ তারিখে বনগাঁয়ে জনাব তাজউদ্দিন সাহেব গিয়ে উপস্থিত হলেন। খবর পাওয়া মাত্র বিএসএফ এসে স্যালুট দিয়ে বললেন, স্যার আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। তারপর স্যারকে দিল্লীর আদেশে হেলিকপ্টারে করে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়। ২ তারিখে মহারানী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা হয় তার। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, কে প্রধানমন্ত্রী হবে, প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের কে রাষ্ট্রপতি হবে। ইন্দিরা গান্ধী ভাল করেই জানতেন শেখ মুজিবুর রহমান আত্মসমর্পণ করেছে এবং পাকিস্তানে আটকে আছে, তা সত্ত্বেও ইন্দিরা গান্ধী সিদ্ধান্ত করে দিলেন রাষ্ট্রপতি হবে শেখ মুজিবুর রহমান। আর সিদ্ধান্ত করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী হবেন জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ। কলিকাতার ১নং ক্যার্মাক স্ট্রিটে ৬৭৬ জন সদস্যের যে সভা হয়, সে সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল, শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি, আর বাকি ৫ জন হবে এডভাইজার। কিন্তু দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন এখানে নেমে এসে তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাহির করে দিলেন এবং ইন্দিরা গান্ধীর আদেশের অনুসরণ করলেন। অর্থাৎ তিনি সিলেকটেড হয়ে গেলেন ইন্দিরা গান্ধীর দ্বারা। আমার মনে পড়ে ১৭৫৭ সালে সেই আম্রকাননে যেখানে মীর জাফর আলী খানের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবকে পরাজিত হতে হয়। তারপরের ইতিহাস আপনাদের জানা। এরপরের ইতিহাস পরাধীনতা আমাদের। সে ছিল ক্লাইভের মনোনীত, ঠিক তেমনি ইন্দিরা গান্ধীর রাষ্ট্রপতি এবং ইন্দিরা গান্ধীর মনোনীত প্রধানমন্ত্রী তার ফল যা হবার তাই হয়েছে। তার ফল হল, আমরা আমাদের

www.pathagar.com

ভাগ্য নির্ধারণের অধিপতি নই। বদ্যনাথপুরে গিয়ে যে শপথনামা নেয়া হয়, তার সেই সদস্যদের মেনে নিতে হয়, তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী আর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে। বাকী চারজন মন্ত্রী। এজন্যই আমরা যুদ্ধ করেছি, অর্থাৎ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর নেতৃত্বে আমরা সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলাম, আমাদের প্রতিপক্ষ শক্তি ছিল সশস্ত্র বাহিনীর পাকিস্তানের সর্বাধিনায়ক ইয়াহিয়া খান। আর তার প্রতিভূ হিসেবে এখানে ছিল জেনারেল নিয়াজী। সেজন্যই এই মুক্তিযুদ্ধের পরে অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের পরে ঐ যে কথাটি আমি বলে আসলাম, ইন্দিরা গান্ধীর মনোনীত প্রধানমন্ত্রী ১৬ তারিখে ঢাকায় আসেননি। তার শক্তি ছিল না কথা বলার। সশস্ত্র যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে জেনারেল ওসমানী, এই সর্বাধিনায়কের সাথে ১৬ তারিখের আত্মসমর্পণের যে অনুষ্ঠান, সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী আর তাদের তরফে জেনারেল নিয়াজী আর সহকারী হিসেবে জেনারেল অরোরা। জেনারেল অরোরা হল সহকারী শক্তির নেতা। ভারতীয় সৈন্যরা আমাদের সাহায্য করেছে, এ নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সহায়ক শক্তি হিসেবে, প্রধান শক্তি হিসেবে নয়। এখানে আরম্ভ হল বিড়ম্বনা। এভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে দিল্লীশ্বরীর পায়ে নৈবেদ্য হিসেবে দিয়ে দেয়া হয়। তারই ফল পরবর্তীকালে এসে দাঁড়ায়। ২০ তারিখে আসলেন তিনি। তাজউদ্দিন সাহেব তো দালাল। কিন্তু তার আগে জেনারেল ওসমানী সর্বাধিনায়ক, তিনি সেই আত্মসমর্পণ করার ডকুমেন্টে সই করার জন্য তার যে উপস্থিতি দরকার ছিল, তিনি তাতে আসেননি। এসেছেন জেনারেল অরোরা। অর্থাৎ এখানে আমার বলার অর্থ হল পেশীশক্তি মাসল পাওয়ার ইজ পাওয়ার উইথ মেটার। যার ফলে নৈতিক শক্তি জনগণের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও সেখানে পরাজিত হয়ে যায়। জেনারেল অরোরা আসে হিন্দুস্থানের রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে এবং পাকিস্তানের রিপ্রেজেনটেটিভ জেনারেল নিয়াজীর সাথে আত্মসমর্পণের ডকুমেন্টে সই করার জন্য। এর চেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার আর কিছু হয় না। সেই দুঃখ নিয়েই জেনারেল ওসমানী পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। সেই দুঃখ নিয়ে আমরাও এখনো বেঁচে আছি। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে যখন তাজউদ্দিন সাহেব এসে ক্ষমতা নিলেন ২০ তারিখে, পহেলা জানুয়ারী প্রথম কাজটি তিনি করলেন। আমাদের মুদ্রামানকে হ্রাস করে দিলেন ৬৬% ভাগ। আর এ ফলে দাঁড়িয়েছে কি? যেখানে আমাদের টাকার মূল্য ভারতীয় টাকার চেয়ে অনেক বেশী ছিল, হঠাৎ করে তা কমে গিয়ে শেষে দেখা গেল মুদ্রাস্ফীতি আমার দেশে, এই অর্থনীতি আজো গড়ে উঠে নাই। তারপরে তিনি ঘোষণা করলেন, ভুলে যান আমরা পাটের রাজা ছিলাম। হ্যাঁ আমরা পাটের রাজা ছিলাম-এটা তো ভুলে যেতেই হবে, দালালী নিয়ে যখন এসেছেন। প্রধান দালালী হলো। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পরে পাক-ভারত যুদ্ধের পর ভারতের রফতানী করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভারতকে তার মিল চালাবার জন্য ১০ থেকে ১৫ লক্ষ বেল পাট প্রতি বছর আমাদের নিকট থেকে সিঙ্গাপুরের মাধ্যমে আমদানী করতে হয়েছে। তার মিল প্রায় সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

সর্ব উৎকৃষ্ট পাটের অভাবে তখনি এ ঘোষণা আসল যে, আমরা ভারতে পাট রফতানী করতে পারব এবং এর উপর কোন নিষেধাজ্ঞা থাকবেনা। মারোয়ারী লুটেরা এসে গেল। ফল হল সেখানকার পাট কলগুলো যেগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দুই/ তিন শিফটে সেগুলো পরিচালিত হতে লাগল। ফল হল আমার এখানে এমন সব লোককে দায়িত্ব দেয়া হল, যারা

www.pathagar.com

লুটেরা, যারা পাট বলতে পাটের কিছুই জানে না। ইন্ডাস্ট্রি জানা তো দূরের কথা। ফলে কলকারখানা ধ্বংস হয়ে গেল। তারপর তিনি ঘোষণা করলেন, ইন্দিরা গান্ধীর কথা নিয়ে আমি যাব না। আমার প্রধানমন্ত্রী আমার দেশে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, আমারা কমপ্লিমেন্টারী ইকনমী, আমরা কোন কমপিটেন্ট ইকনমী নয়। ভারতের সাথে পাকিস্তান জুট এক্সপোর্ট কমপিটিশিনে ভারত অনেক বাজার দখল করে নিয়েছিল। সেই বাজারগুলো পুনরায় তারা উদ্ধার করে। ভারতের সাথে চামড়া আমরা রফতানী করি তারাও রফতানী করে, আমরা হলাম কমপিটেটিভ। এই ভাবে কমপিটেটিভ ইকোনমীটাতে যা ভারত উৎপাদন করে, আমরাও উৎপাদন করি, আমরাও রফতানী করি, তারাও রফতানী করে। সুতারাং সেটা কমপিটিটিভ মার্কেট ছিল।

বস্ত্রের যে তুলার প্রয়োজন, তুলা ভারত আমদানী করে, আমরাও আমদানী করি, সেখানে দামেও কমপিটিশনের প্রশ্ন আছে। অতএব কমিপটিটিভ ইকনোমীটাকে ধ্বংস করে দেয়া হল, অর্থাৎ মাড়োয়ারী আসলো এই মিলগুলো দখল করে, এ মিলগুলো ধ্বংস করল। তারপর তাজউদ্দিন সাহেব ঘোষণা করলেন, ভারতে কোন অস্ত্র যায় নাই। ঐ দালাল তো তখন জানতো, অমৃতবাজার পত্রিকা রিপোর্ট অনুযায়ী দুইশত হতে আড়াইশত ওয়াগন ভরা অস্ত্র-শস্ত্র, আধুনিক অস্ত্র হিন্দুস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। অথচ এই দালালেরই অন্য মন্ত্রী আবার তখন বলে, তাহের উদ্দিন ঠাকুর ভারতে আমাদের অস্ত্র নিয়ে গেছে। অস্ত্র এখন ফেরত দেয়ার প্রস্তাব হয়েছে। লুটেরা, ভারতীয় সেনাবাহিনী এসেছে লুট করার জন্য মনে হয়। শুধু সফরই সেদিন করে নাই, আমার মুক্তি বাহিনীকে কেবল নাকচ করে দেয় নাই। আমার জেনারেল ওসমানীকে শুধু নাকচ করে নাই। আমার জেনারেল জিয়াকে শুধু নাকচ করে নাই, আমার জেনারেল শফিউল্লাকে শুধু নাকচ করে নাই, আমার জয়নাল আবেদিনকে শুধু নাকচ করে নাই। তাদের সবাইকে নাকচ করে দিয়ে, তাদেরকে অপমান করে হিন্দুস্থানের কাছে আমার স্বাধীনতাকে বিক্রি করে দেয়া হয় সেদিন। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে পরবর্তী কালে তাজউদ্দিন সাহেব দেশটাকে সম্পূর্ণ বিক্রি করে দেয়। আসলেন শেখ মুজিবুর রহমান। কি বিক্রি করলো? ঐ যে আমি বলেছি আমরা যে আমদানী করি বিদেশ হতে, সে আমদানীকৃত মাল সেগুলোকেও ট্রাকে ভরে হিন্দুস্থানে নিয়ে গেছে। অর্থ কোথাকার ? এখানকার মাল কেনার জন্য এখানকার টাকা। ঐ ৯৩, ০০০ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর লোক যারা লুট করেছিল আমাদের ঘরে ঘরে, সোনা-দানা, টাকা পয়সা সব কিছু তাদের সেই সোনা, দানা টাকা পয়সা নিয়ে এরা দেখা গেল শেষ পর্যন্ত, এ টাকা দিয়ে বায়তুল মোকাররম প্রভৃতি এলাকা হতে সোনা কিনে কিনে, চট্টগ্রাম বন্দর হতে, খুলনা বন্দর হতে কিনে কিনে হিন্দুস্থান পাঠিয়ে দেয়। এভাবে সম্পদ চলে গেল। টাকা রয়ে গেল। মুদ্রাস্ফীতি হতে বাধ্য। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এমনকি আমার কলকারখানার মাল পর্যন্ত তখন লুট করে নিয়ে যায়, যন্ত্রপাতি পর্যন্ত লুট করে নিয়ে যায়। তারপরে তারা সর্বস্তরে লুট করে দেশটাকে একটা ফোঁকড়া দেশে পরিণত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। এবং তাই হয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে। ১০ তারিখে পাকিস্তান থেকে ফিরে এলেন জনাব শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব। শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব লন্ডন হতে কমেট বিমানে সরাসরি আমার ঢাকা না এসে দিল্লীতে নামতে বাধ্য হয়েছিলেন। 'ইন্দিরা গান্ধী, মা দেবী, তোমাকে সালাম না করে যেতে পারি না।' এবং মা দেবীকে সালাম করে তাকে আসতে হয়েছিল। সেখানে তার কানে মন্ত্রণা দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞ শেখ মুজিবুর রহমান, আত্মসমর্পণকারী শেখ মুজিবুর রহমানকে ইন্দিরা গান্ধী গ্রহণ করে নিয়েছে, আর বাংলাদেশের রাজত্ব যায় কোথায় ? সুতরাং কৃতজ্ঞ শেখ মুজিবুর রহমান দেশেই ফিরে আসলেন। ফিরে আসার পরে তাজ উদ্দিন সাহেব যে কাজগুলো করেছেন, সেগুলোর উপরে তার সীল-ছাপ্পর দিয়ে দিলেন। কিন্তু ক্ষমতার খেলা। তিনি জানেন যে, কনস্টিটিউশান করা হয়েছে। গণপরিষদের প্রভিশনাল কনস্টিউটিশনে আছে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা। অতএব তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্যই চারপাশে ঘুরতে ফিরতে আরম্ভ করলেন। কিছুতেই রাষ্ট্রপতি তিনি আর থাকবেন না। তখন জ্যাস্টিস আবু সাঈদ চৌধুরীকে এনে রাষ্ট্রপতি করা হয়, আর তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাজ উদ্দিন সাহেবের হাতে অর্থমন্ত্রীর ভার দেন। ফাইনান্স মিনিস্টার করেন। তার কাজ হলো ১৯ মার্চে ২৫ সালা চুক্তি সই করা । দাসত্ব চুক্তি যাকে আমরা বলেছি। আমার মজলুম নেতা মওলানা ভাসানী যাকে দাসত্ব চুক্তি বলেছেন। পার্ক-মার্কিন সামরিক চুক্তিকে, সিয়াটো সেন্টো, বাগদাদ চুক্তিকে আমরা একদিন আমেরিকার বশংবদ দালালদের এগ্রিমেন্ট মনে করতাম। সাম্রাজ্যবাদের একটা প্রতিভূ হিসাবে মনে করতাম। সেই সাম্রাজ্যবাদ যেটা করেছিল তার জন্য পাকিস্তানে বলা হয় এখন, তার যে প্রচার মন্ত্রী যিনি আছেন, তিনি এখন বলেন, ব্রড কাস্টিং এন্ড ইনফরমেশন মিনিস্টার 'পাকিস্তান ওয়াজ রুল বাই আমেরিকান ভাইসরয়' অনেকে হয়ত ভাইসরয় কি তা জানেন না। ভারত বর্ষ যখন ইংরেজদের দখলে ছিল, ইংরেজদের তরফ থেকে যিনি শাসন করতে আসতেন, সমগ্র ভারতে তার নাম ছিল ভাইস রয়। পাকিস্তানেও ৪০% টাকা আর্মী চালাবার জন্য আমেরিকা দেয়ার ফলে তাকে এগ্রিমেন্ট করতে হয়েছে তার কথামত চলার। ফলে ৫৪ সালের নির্বাচন বাতিল হয়ে যায়। ফলে ৫৪ সালে আরম্ভ হয় আমাদের বিরুদ্ধে আঘাত। এর পরবর্তীকালে যা আছে সব তাকেই লক্ষ্য করে বলেছেন। পাকিস্তান ওয়াজ রুলড বাই আমেরিকান ভাইস রয়। এখানেও শেখ মুজিবুরের সময় ইন্ডিয়ান হাই কমিশনার ওয়াজ দি ভাইস রয়। ফলে তাদের কথাই, তাদের স্বার্থেই সব কিছু করতে হয়েছে। তারই ফলশ্রুতিতে ৭ দফা চুক্তিতে সই করে এসেছেন জনাব তাজউদ্দিন সাহেব। সেই আদলেই ২৫ সালা চুক্তিকে ১৯ মার্চে মহরাণী ভারতের প্রধানমন্ত্রী দিল্লীশ্বরীর সাথে শেখ মুজিবুর রহমান সই করেন।

তার পরবর্তী কাজ কিছুকাল পরেই ২৭ মার্চে বাংলাদেশ এবং ভারতীয় সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি সই করা হয়। অবাধ বাণিজ্য চুক্তি। তার ফলে যে স্মাগলিং অবারিতভাবে আমার বাংলাদেশে আসতে থাকে, তা আজো বন্ধ হয়নি। সেজন্য একটা কথা আছে আমার গ্রামে। আমি তো গ্রামের লোক। 'হাসতে হাসতে পাগল হইলাম ভালো আর হইলাম না' হিন্দুস্থানের কাছে এমনভাবে বিক্রি করে দিলাম আর দেশের অর্থনীতি উদ্ধার করার প্রশ্নই ওঠে না। তারপর শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসের ২১ তারিখে সই করলেন ট্রায়াল ওপেনিং অফ দ্যা ফারাক্কা বাঁধ। ট্রায়াল ওপেনিং করে দিয়ে ফারাক্কা বাঁধকে আর কোন দিন সেটা বন্ধ হয় নাই। ইন্দিরা গান্ধীর চালে হউক, নিজের ভয়-ভীতির জন্য হউক, দালালীর কারণে হউক-এই ফারাক্কা বাঁধকে ট্রায়াল ওপেন করে দেয়া হল ৩১ মে পর্যন্ত সময়ের জন্য। কিন্তু সেটা আর কোন দিন বন্ধ হয় নাই। এর ফলশ্রুতিতে দাঁড়িয়েছে কি? ইতিহাসে শেখ মুজিবকে বার বার জবাব দিতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে মরুকরণ আরম্ভ হয়েছে। গঙ্গা বাঁধ যে তৈরী করার দরকার ছিল, নির্মাণ করার দরকার ছিল, ব্রহ্মপুত্র বাঁধ

www.pathagar.com

করার দরকার ছিল, পাকিস্তানের সময় যে প্ল্যান করা হয়, সিক্সটিতে সেটাকে কার্যকরী করা হল না। বিএম আব্বাস সাহেবের শত চেষ্টা সত্ত্বেও মধ্য থেকে মরুকরণ কেবল নয়, পানির অভাবে, দেখা গেল যে এখন, ঢাকা শহরে যেখানে ১৬ থেকে ২০ ফুটের মধ্যে নলকুপ বসানোর পরে পানি পাওয়া যেত, এখন ৬০ থেকে ৭০ ফুট বসানোর পরেও পানি পাওয়া যায় না। তার অর্থ হল আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন্ড অব ওয়াটার রিসিট করে-গেছে, অনেক নিচে নেমে গেছে। এর ফলে আজকে আর্সেনিকের দোষ আসছে। তাহলে প্রয়োজন কি? প্রয়োজন সার্ভিস অর্ডারকে ব্যবহার করা। এবং সার্ভিস অর্ডার ব্যবহার করতে হলে কি দরকার? গঙ্গা বাঁধকে নির্মাণ করার জন্য একটি মাত্র পুরুষ এ পর্যন্ত যত সরকার হয়েছে, তার মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন যদিও সামরিক বিভাগ থেকে এসেছেন, তিনি জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি গঙ্গা বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ১৯৮০ সালে। সেবারেই তাকে হত্যা করে ফেলা হয়। গঙ্গা বাঁধ আর হল না। গভর্নমেন্টের পর গভর্নমেন্ট এসেছে, একটি পয়সা কেউ বাজেট হতে দেয় নাই গঙ্গা বাঁধ করার জন্য। জেনারেল জিয়াউর রহমান একমাত্র লোক, গঙ্গার পানি পাওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টার কথা আপনারা বলেছেন তার সাথে একটু যোগ করতে হয়। তিনি পাঁচ বছরের যে চুক্তি করেছেন, তার মধ্যে গ্যারান্টি ক্লজ ছিল। জেনারেল এরশাদ সেপ্টেম্বর মাসে ১৯৮২ সালে গিয়ে রেড কার্পেট অভ্যর্থনা নিলেন ইন্দিরা গান্ধীর হতে এবং সেখানে পানি চুক্তি নবায়ন হয়েছে বটে। কিন্তু গ্যারান্টি ক্লজকে তুলে দিয়ে আসলেন। ফলে পানি আমরা পাই না। তারই ফলশ্রুতিতে আজকে ৩০ সালা চুক্তি এসেছে,গ্যারান্টি ক্লজ ছাড়া। কোন দেবদূতে কি বলল আর কে সেখানে কি করেছে- এটা আমার বিবেচ্য বিষয় নয়। আমার বিবেচ্য বিষয় হাসিনা সরকারের সময় যে চুক্তি সই করা হয়েছে, সেই চুক্তিতে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসের চুক্তিতে গ্যারান্টি ক্লজ আছে কি নাই । গ্যারান্টি ক্লজ নাই। অতএব এখানে পানি পাব না। এবং পানি না পেলে অবস্থা যা হওয়ার, আরো খারাপ হবে। এ থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। এর একটাই মাত্র উপায়। গঙ্গা বাঁধকে অবিলম্বে নির্মাণ করা। তার পরে দেখুন, দেশের অর্থনীতি একে একে ধ্বংস করার পরে এখন দেখা গেল আমার দেশ মোটামুটিভাবে হিন্দুস্থানের খপ্পরে পড়ে গেছে। এরপর ঐ যে করিডোরের প্রশ্ন আসে। এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে যে চুক্তি, আমি যদি আজকে প্রশ্ন করি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করার ফলে যদি আমার কনস্টিটিউশান ভায়লেটেও হয়ে থাকে, তাহলে আপনারা কনস্টিটিউশান ভায়োলেশনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা অংশকে আগামী দিন তাদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার যদি দিতে পারেন, তাহলে আগামী দিনে বাংলাদেশকে তাদের হাতে তুলে দিলে নোবেল প্রাইজ দিবেন নাকি। আজকে সেই অবস্থায় দেশটাকে নিয়ে আসা হয়েছে। আমি যদি পাশাপাশি একথা তুলি, সেভেন সিস্টারসের কথাটাও নিশ্চয়ই আসে। তারা আমার মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছে। আমি তাদেরকে সাহায্য করতে চাই। তাদের মুক্তিযুদ্ধে আমি অংশিদার হতে চাই। বয়স আমার ৭০-এর উপরে, শরীর ভাল নয়; তো মন এখনো আমার সে দিকে আছে। আজকে আমার পাশাপাশি যদি ত্রিপুরা রাজ্যের কথা বলি। সেখানে আন্দোলন হচ্ছে। ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব টিপরা। সে আন্দোলনে তারা মরেছে। যে মুক্তিযুদ্ধ তাদের। সে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করতে আপনারা কেন কার্পণ্য করেছেন? ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে আমার এই প্রশ্ন, প্রশ্ন ইংল্যান্ডের কাছে। আমার এ প্রশ্ন বৃটিশদের কাছে। আমার প্রশ্ন আমেরিকানদের কাছে। আপনারা পাবর্ত্য চট্টগ্রামে কনস্টিটিউশনকে রেইড করার পরে ইউনাইটেড স্টেটকে ভেঙ্গে ফেডারেল

www.pathagar.com

স্টেট বানাবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়ায় আগামী দিন কাজী লেনদুপের মত সিকিম যেভাবে, কাশ্মীর যেভাবে; কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লাহ বেশী লাফালাফি করেছিল, স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। স্বাধীনতা ইন্দিরা গান্ধী তাকে দিয়ে দিয়েছে। জেলে রেখে দিয়েছে বার বার। ঠিক তেমনি সিকিমে স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে আজকে ভারতের অংশ বানানো হয়েছে। আমার প্রশ্ন হল আগামী দিন যদি-অবশ্য দুর্জয় শক্তি জনতার আছে। একথা আমি বিশ্বাস করি। সুতরাং দেশকে রক্ষা করার জন্য, স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য জনগণের আজকে নেমে আসা প্রয়োজন।

ইন্দিরা গান্ধীর কাছে শেখ মুজিবুর রহমান বেরুবাড়ী তুলে দিলেন, আনলেন কি 'নাকের বদলে নোরন' কি সেটা ৩ বিঘা। ৩ বিঘাও যখন সুপ্রীম কোর্ট শেষ পর্যন্ত আদেশ দিয়ে দিল বাংলাদেশকে হস্তান্তর করার জন্য, কিন্তু সে ৩ বিঘা হস্তান্তর করে নাই। আমার সরকাররা দয়া করে সেই ৩ বিঘা দিয়ে আসলেন কয়েক ঘন্টার মাঝে আল্টিয়ে পাল্টিয়ে এখানে আসা যাওয়ার জন্য। ওরা সিকিউরিটি বুঝে, আমরা বুঝি না। তেমনি বাংলার অর্থনীতিকে ভারত '৭২ সাল থেকে '৯৮ সাল পর্যন্ত ২৭০০০ কোটি টাকা তারা এখানে রফতানী করেছে। সরকারীভাবে সারপ্লাস ২৭০০০ কোটি টাকা বেসরকারীভাবে স্মাগলিং হিসাবে। তাদের আর একটি হিসাব আমার কাছে আছে। ২৭০০০ থেকে ৩০০০০ কোটি টাকা। এর জন্য দায়ী কে। সরকার এটা বলুক। দায়ী আমাদের সরকার। সাপটা এগ্রিমেন্ট। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সার্ক। ফাইনান্স মিনিস্টার সাইফুর রহমান সাহেব সাপটা সই করলেন। শুল্ক ট্যারিফ যেটাকে বলা হয়, সেটাকে যে পরিমাণে আমরা কমিয়ে দিলাম, ভারত তার কাছেও যায় নাই। ফলে ভারতীয় দ্রব্য বিনা শুল্কে আসে। বিনা ট্যারিফে আসে, তার এক্সপোর্ট আমার দেশে বাড়ে, আমার এক্সপোর্ট তার দেশে বাড়ে না। এর জন্য দায়ী কে? সে জন্যই প্রশ্ন করেছিলাম তখন মাহবুব উল্লাহ সাহেবকে। রাজনৈতিক দল যদি স্বচ্ছ না হয়, চরিত্রবান না হয়, নেতৃত্ব যদি চরিত্রবান না হয়, নেতৃত্বই মেটার করে, নেতৃত্বই দেশকে বিক্রি করে, যেমন শেখ মুজিব বিক্রি করেছে। যেমন কাজী লেন্দুপ দর্জি বিক্রি করেছে। যেমন তাজউদ্দিন আহমদ বিক্রি করেছে। সুতরাং নেতৃত্বের উপরই সব কিছু নির্ভর করে। জনগণ নিরাপরাধ, জনগণ নিরূপায়, তারা নেতৃত্বের ওপর ভার দিয়ে দেয়। এখন আমার একটা প্রশ্ন এই গোলটেবিলে উপস্থাপন করা প্রয়োজন মনে করি। কোটি কোটি টাকা খরচ করে, যারা নির্বাচিত হয়ে গিয়ে সরকার গঠন করেন বা অপজিশনে যান, পার্লামেন্ট দখল করেন বা পার্লামেন্টে বিরোধী দল হিসেবে থাকেন, তারা কি দেশকে কিছু দিতে পারে? যে ৪ কোটি, ৫ কোটি, ১০ কোটি টাকা খরচ করে, সে উপার্জন করে সেই পথে এবং সেই পথেই পরবর্তীতে সবকিছু করবে দেশকে। আজকে কে শাসন করে? এক দিকে কোটিপতিরা আর একদিকে সরকারী-বেসরকারী দুই আমলা মিলে। গুটি কয়েক এক্সপ্লোশন যাদেরকে ব্যতিক্রম বলা হয়। বলে হিন্দুস্থানের পক্ষে তাদেরকে কিনে নেয়া কিছু কঠিন নয়। যখন ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাইয়ের জন্য রাউজানে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসানো হয়, দেখা যায় ১০০ মেগাওয়াটের ওপর উৎপাদন উঠতে পারে না, সেখানে ২০০ মেগাওয়াট লেখা আছে। কারণ যে টাকা জিয়াউদ্দিন বাবলু থেকে আরম্ভ করে সবাই খেয়েছে, তারা যে টাকা লুট করেছে, সেই পরিমাণে মেশিনারী খারাপ আনতে হয়েছে। আবার যেই টাকা লুট করেছে, কাফকোর নামে সেই এগ্রিমেন্ট সবাই আপনারা দেখতে পারছেন। হাজার কোটি টাকা এভাবে উপার্জন করবেন, আর দেশের অর্থনীতি থাকবে তার প্রশ্নই উঠে না। দেশের অর্থনীতি

www.pathagar.com

এখন নেই। অতএব আমরা নিজেরাই নিজেদের অর্থনীতি হিন্দুস্থানের হাতে তুলে দিচ্ছি। সাঙ্গুর যে এগ্রিমেন্টে হয়েছে, সেই এগ্রিমেন্টের গ্যাস আমরা সেভেনটি নাইন পার্সেন্ট পাব না। টুয়ান্টি ওয়ান পার্সেন্ট পাব এক হিসেবে, এক হিসেবে সেভেনটি সিক্স পার্সেন্ট পাবে তারা, আমরা পাব মাত্র টুয়ানটি ফোর পার্সেন্ট। আমার দেশের গ্যাস আমি উত্তোলন করি, আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারবো না, আমার টাকা লুট করে এখান থেকে নিয়ে যাবে। এভাবে অর্থনীতি চালালে পরে হিন্দুস্থানকে মোকাবিলা করার জন্য যে মানসিক শক্তি ও শারীরিক শক্তি দু'টা প্রয়োজন এটা কি সম্ভব? অতএব প্রশ্ন হলো আজকে এদেশে প্রেসিডেন্ট নাসের ক্ষমতা দখল করেনি, যে সুয়েজ খালের জন্য মন প্রাণ দিয়ে জান বাজি রেখে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পাশে এসে গিয়েছিল সোভিয়েত রাশা। সুতরাং আজকে প্রশ্ন পরিস্কার আমি কখনো সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে ছিলাম না, এখনো না। কিন্তু কসোভো আমার। কসোভোতে যারা বাস করে তারা আমার মত, ধর্ম বাদ দিলেও তাদের প্রতি যে নির্যাতন করা হচ্ছে, বাড়ী হতে তাড়ানো হচ্ছে, মারা হচ্ছে, রেফ করা হচ্ছে, এদের পক্ষে কেউনা কেউ দাঁড়াতে হবে। শক্তিশালী হিসেবে আমেরিকা ন্যাটো দাঁড়ানোয় আমি খুব খুশী এবং ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কে দাঁড়িয়েছে আজকে। সোভিয়েত, রাশা, ভারত। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় চীন। সুতরাং আন্তর্জাতিক ন্যায়নীতি কোথায় সেটা আমরা দেখতে পাই। এখানে যেমন গণতন্ত্র হয় না, কয়েকজনের লুটপাটের ব্যবস্থা হয়, ঠিক সমগ্র পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক আইনেও বড়দের পক্ষেই থাকে। আজকে যদি সোভিয়েত রাশা পারত তাহলে প্রিমাকভ সাহেব চুপ করে থাকতেন না। উনি শ্লোভাকদের নাম দিয়ে পরিস্কারভাবে সৈন্য সেখানে পাঠিয়ে 'দিতেন। পরিস্কারভাবে জেট বিমান পাঠিয়ে দিতেন। সেই শক্তি নেই বলে ন্যাটোর বিরুদ্ধে কিছু করতে তিনি সাহস পাচ্ছেন না। কিন্তু আনাগোনা তিনি করছেন। এজন্যই আজকে আমার দেশর স্বাধীনতা- সার্বভৌমত্বের রক্ষার দায়-দায়িত্ব জনগণের ওপর। আবার জনগণের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আছে, অতীতে যাদের সংগ্রামী হিসেবে জেনেছি, যেমন ড. মাহবুবউল্লাহ, যেমন ড. আফতাব আহমাদ যেমন আনোয়ার জাহিদ সাহেব, জনাব সাদেক খান সাহেব, তাদেরকে আমি নিজে দেখেছি। তাদের সাথে সংগ্রাম করার ব্যাপারটা আমার কাছে একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। তাদের ওপরও অনেকটা নির্ভর করে।

দেশে চরিত্র বলে কিছু নেই। দুর্নীতিবাজে দেশ ভরে গেছে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি। রাজনীতি স্বচ্ছ কখনো হবে না। দুর্নীতি যদি দূর না হয়। কি সব মামলা দেন, গডফাদাররা সবই বেঁচে যায় আর তরিকুল ইসলাম সাহেবের মত একজন ভদ্রলোক তাকে আসামী করা হয় রানার পত্রিকার সম্পাদক মুকুলকে হত্যা করার দায়ে। অথচ জনকণ্ঠের রিপোর্ট অনুযায়ী হাসান বলে এক লোক, গডফাদার পরিচালিত এক সন্ত্রাসী, যে হত্যা করেছে সে এখন ঢাকায় আছে। কাদের বাড়ীতে আছে সেটা বের করা হোক। মন্ত্রীর বাড়ীতে আছে কি না? এগুলো ইনভিসটিকেশন হয়ে বের হওয়া দরকার। আলমগীর কবিরের মত ভদ্রলোক এবং সংগ্রামী, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তিনি খুন করতে যাবেন? হ্যাঁ যুদ্ধে খুন করবেন। কিন্তু একটা লোককে গুণ্ডামী করার মানসিকতা নিয়ে হত্যা করবেন, এ প্রশ্ন তার বেলায় উঠতেই পারে না। কিন্তু তাকে আজকে জেল খাটতে হয়। পানি নিয়ে, বিদ্যুৎ নিয়ে ঢাকা শহরের রাস্তা থরথর করে কাঁপে। খারাপ বললেও আজকে একটি কথা বলতে হয়, যদি শেখ মুজিবুর রহমান আজকে এ অবস্থায় থাকতেন তখন তিনি জনসভা ডেকে দিয়ে স্ট্রাইক ঘোষণা করে

www.pathagar.com

দিতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত পানি পাবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুতের ঝামেলা যাবে না এবং না পারলে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পদত্যাগ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে আমার স্ট্রাইক চলবে। এ রকম কর্মসূচী আমরা দিতে পারি না। আমরা আসি সুন্দর জায়গায় ফ্যানের নিচে বসি কথা বলি, পত্রপত্রিকায় ছবি ওঠে। চলে যাই। সেরে যায়, এটা আন্দোলন নয়, এটা আন্দোলন আন্দোলন খেলা। অত্যন্ত দুঃখ লাগে '৪৮ সালের কথাই বলি, যেদিন আমাদেরকে কুফর বলতো। কাফের বলত। হিন্দুস্থানের সন্তান বলতো। সেই '৪৮ সালে যদি আমরা মাঠে না নামতাম, রাস্তায় না নামতাম, নাজিমুদ্দিন সাহেবের সেক্রেটারিয়েটকে ঘেরাও না করতাম, পিটুনী সেখানে না খেতাম, জেলে না যেতাম, তাহলে আজকের অবস্থা ফিরে আসতো না। '৫২-এর কথা তো বলার প্রয়োজনই নেই। আমি গোড়ার কথাই বলে গেলাম। তাই আজকে আমাদের কাছে প্রশ্ন সংগ্রাম করে বাঁচব, চরিত্র নিয়ে বাঁচব, চরিত্রবানদের সাথে উঠাবসা করব, নীতিনিষ্ঠ যারা তাদের সাথে উঠাবসা করব, না কি গডফাদারদের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের নিকট থেকে টাকা নিয়ে নির্বাচন করে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে তাদেরও দেব নিজেও খাব। সেটারই কি ব্যবস্থা হবে? এ রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমি মানি না।

পরিতাপের বিষয়, গত নির্বাচনে ড. কামাল হোসেন ধানমন্ডি এলাকাতে দাঁড়িয়েছিলেন, ড. কামাল হোসেনের সাথে আমার রাজনৈতিক দ্বিমত থাকতে পারে কিন্তু উনার লেখাপড়া সম্পর্কে আর জ্ঞান সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই। তিনি পরাজিত হয়েছেন। তার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সেখানে কে নির্বাচিত হয়েছেন? দুর্নীতির জন্য, চোরাকারবারের জন্য ,ব্লাক মার্কেটিংয়ের জন্য যার সাজা হয়েছিল, সেই মুকবুল আহমদ গ্রেফতার হয় না। তরিকুল ইসলামের হয়। যে না কি হত্যা করেছে সজলকে। যার মামলাও হয়েছে। গ্রেফতার হয় না বোমা রাখার জন্য, বোমা তৈরীর জন্য সুনামগঞ্জের সেই সরকারী দলের সংসদ সদস্য। এ অবস্থা শেখ হাসিনা সরকার তো করবেই। শেখ হাসিনা যে অবস্থায় দেশকে আজকে নিয়ে আসছে, যেভাবে পাবনার নির্বাচন করেছে। আমরা তো আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রি। চরিত্রও খারাপ। টাকা পয়সাও নাই। আমরা চোরও। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নেই। কিছুই নেই। ডেভেলপড কান্ট্রিতে যা হয় না আমাদের এখানে তাই দেখান হয়। সাহেব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হাবিবুর রহমান সাহেব আপনি কি লেখাপড়া মোটেই জানেন না? আমি যে তথ্য দিলাম এটা কি আপনি অস্বীকার করতে পারবেন? আপনি কি কোন দিন বলেছেন, এ নির্বাচন আমি গ্রহণ করি না। ডেভেলপড কান্ট্রিগুলো আমার সামনে উদাহরণ। আপনার চরিত্রতো আমার জানা আছে। আপনার তকদির ভাল, আমারই ওয়ার্কার ছিলেন, সেটা বলব না, আল্লাহ মাফ করুক। একসঙ্গে কাজ করেছি সেটাই বলব। আপনি সুপ্রীম কোর্টের মেম্বার কি করে হলেন? সেটাও জেনারেল এরশাদের দয়া, একটার জায়গায় দু'টা প্রমোশন দিয়ে আপনাকে সুপ্রীম কোর্টের মেম্বার করেছে। আপনি ভুলে যেতে পারেন, আইনকে ভুলতে পারেন, জাস্টিসকে ভুলতে পারেন। কিন্তু ভুলা ঠিক হয়নি।

'৯৬-এর নির্বাচনও তাই, ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন আমি সমর্থন করি না। আমার কাছে গিয়েছিল আমি অস্বীকার করেছি। কথা বলতে পর্যন্ত অস্বীকার করেছি। কাউকে কাউকে রাজাকার বলে গালিও দিয়েছি। সে আমার সাথে তো দেখা করার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু তাই বলে জনাব হাবিবুর রহমান সাহেব জাস্টিস হয়ে আপনি এই ধরনের নির্বাচন করে তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে গেলেন, আপনার কি বিবেকে লাগে নাই, সার্ভিস রুল অনুযায়ী জনতার

www.pathagar.com

মঞ্চে মহিউদ্দিন খান আলমগীর এবং অন্যেরা যারা বক্তৃতা করেছে, আন্দোলন করেছে, তারা এক দিনের জন্য এমনকি এক মিনিটের জন্যও সরকারী চাকরিতে থাকতে পারে না। তাদেরকে সাসপেন্ড করা, ইনকোয়ারি করা, তারপর ব্যবস্থা গ্রহণ করা- এটাই ছিল আপনার দায়িত্ব। হাবিবুর রহমান সাহেব, সে দায়িত্ব কি আপনি পালন করেছেন? পালন করবেন না বলে ডেইলী স্টারে দুইটা লেখা আমি দিয়েছিলাম। তার মধ্যে আপনার নামে পরিস্কারভাবে সেখানে আপনাকে বলেছি এর সাথে অবশ্য প্রশ্ন আছে জড়িত। তখনকার মন্ত্রী সভা- তাদেরও দায়িত্ব আছে। যেই মাত্র আলমগীর মহিউদ্দিন সেখানে গেল জনতার মঞ্চে, তখনই তাকে সাসপেন্ড করা উচিত ছিল। ফলে আজকে সামগ্রিকভাবে চরিত্রের ধস হয়েছে। কেবল মন্ত্রী হওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাই, মন্ত্রিত্বের ভাগ হতে লুট করতে পারলে আরো বেঁচে যাই। এর ফলটা কি দাঁড়িয়েছে? সার্বিকভাবে দেশ আজ ধ্বংস আর দেশ যখন ধ্বংস হয় আমার মত লোক গরীব মানুষ যে নাকি পালাতে পারবো না, আমাকে মরতে হবে। যুদ্ধ করার মত প্রাণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও শারীরিক শক্তি না থাকার কারণে সেটা করতে পারবো না। কিন্তু মাহবুব সাহেব উঠে দাড়ালে আমি তো তা পারব না। এই জন্য আমার প্রশ্ন, আমরা দেশকে রক্ষা করার জন্য যে দায়-দায়িত্ব বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ করি, সেই দায়-দায়িত্ব কি আমরা পালন করি? সুন্দর শব্দ কিছু শিখেছি। জনাবা প্রধানমন্ত্রী আপনি একাউন্টেবিলিটির অর্থ বোঝেন? আপনার নকলের কথা কি আপনার মনে পড়ে ? কেউ বলে দেয়, সাথে সাথে বলা শুরু করে। আবার ট্রান্সপারেন্সী এ শব্দ তো আপনার পিতাও শোনে নাই। আবার ট্রান্সপারেন্সীও বলে। সুতরাং দেশটাকে এভাবে ধ্বংস করা উচিত নয়।

আপনার বোন যখন বিচিত্রার মালিক হয়, পঞ্চাশ লক্ষ টাকার গুডউইল নিয়া কয় টাকা জমা দিয়েছেন? তখন লজ্জা করে নাই আপনার? আপনার বোন যখন বাহারাইন ব্যাংকের ডাইরেক্টর হয়, সেই টাকা কোথায় পেলেন? বাইরাইনে কি করে এ টাকা গেল ? এর উত্তর কি আপনি দিতে পারবেন? আরো আমার কাছে ফিরিস্তি আছে অনেক বড় কে কি করছেন। তারা আজকে দেশটাকে করাপশানে ধ্বংসের মুখে নিয়ে গেছে, এখন খালি টাকা চাই। স্মাগলিং চাই। গডফাডার চাই। মারো, লুটো এটাই একমাত্র কাজ। এর বিরুদ্ধে দরকার এক শক্তি গড়ে উঠার। কবি আবদুল হাই শিকদার সাহেব, আমার মত নগন্য লোক আপনাকে প্রশংসা করার উপযুক্ত নই। আপনার কলমে যা বের হয়, এ শক্তিও আমার নেই। আপনার সংবেদনশীল মন যা চায় তেমন করে কিছু করার আমার শক্তি নেই। কিন্তু আমার মনটা হয়ত কাঁদে। মনটা হয়ত চায়, কিন্তু বলার মত শক্তি আমার নেই। আমি মনে করি, এ ধরনের আরো অর্গানাইজ করবেন। কিন্তু অর্গানাইজেশনটা যেন বৃথা যায় না। এখানে আসলাম, দু'কথা বলে গেলাম, পত্রিকায় ছবি উঠলো, পত্রিকায় নাম ছড়ালো, সেটাই যেন একমাত্র লক্ষ্য না হয়। আজকে সবচেয়ে বেশী দরকার যুব সম্প্রদায়কে, যাদের বেরিয়ে আসতে হবে, তারা কেবল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি বন্ধ করলে চলবে না, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির প্রফেসরকে মারলে চলবে না। ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে নকল করতে না দিলে তার জন্য যন্ত্রপাতি ভাঙ্গতে হবে; স্ট্রাইক করতে হবে-এটা কখনো হতে দেয়া যায় না। গুণ্ডা গুন্ডাই- সে যে দলের হউক না কেন। আজকে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিকে ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এটা আলটিমেটলী ভারতের লাভ। এটা বন্ধ করার ওদের প্রয়োজন আছে। কোন পত্রিকা ছাপাবে না কথা বলবো কোথায়? আবার রোড ট্রান্সপোর্টের কথা বলেছেন, কলিকাতা

www.pathagar.com

থেকে বাস আসে , কলিকাতা বাস যায়। রোড টান্সপোর্ট এগ্রিমেন্ট হয়, আমার তো সে শক্তি নাই। সেই অর্থের জোর নাই যে আমি বাস ভরে লোক নিয়ে আসবো। আমি পল্টনে দাঁড়িয়ে বলবো এই এগ্রিমেন্ট মানি না। এই এগ্রিমেন্টের বিরুদ্ধে আমি স্ট্রাইক ঘোষণা করলাম। শক্তি যার আছে, তারাতো করেন না। তাহলে আমাকে বলেন, আপনাদের কি জবাব আছে। এর বেশী কি আমাদের কোন লাভ আছে? হয়ত একদিন শুনবেন আমিও বিদায় নিয়েছি। ইচ্ছাকৃতভাবে এভাবে বাঁচার কোন দাম নেই। যে বাঁচায় বার বার আত্মসমর্পণ করতে হয়, নিজের বিবেককে বিক্রি করতে হয়, নিজের বিবেক অনুযায়ী দাঁড়াতে পারি না, যুদ্ধ করতে পারি না, সংগ্রাম করতে পারি না, কিলাকিলি করতে পারি না। এর চেয়ে দুঃখের ব্যাপার আমার জন্য কিছু নয়। সুতরাং আজ যারা বড় বড় দল করেন, তাদের দায় দায়িত্ব রয়েছে, আমরাও বড় দল কোন দিন করেছি, যেদিন পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি নিয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে লেগে গেল, সোহরাওয়ার্দী সাহেব ক্ষমতা দিতে চাইলেন-নিলাম না। সেদিন কিন্তু বেরিয়ে এসেছিলাম, বরং আমাকে বের করে দিয়েছিল। এবং সেটাকে স্বাগত জানিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। এভাবে বাকী সব বলে লাভ নাই। কত জনে কি দিতে চেয়েছেন, কতজনে কি অফার দিয়েছেন, সেগুলো বলে লাভ নাই। এটা হলো নিজের বাগাড়ম্বর। এই বাগাড়ম্বরের মধ্যে আমি ঢুকতে চাই না। কিন্তু এটা ঠিক, দেশকে রক্ষা করার জন্য আপনাদের সাংবাদিকদের দায়-দায়িত্ব আছে। এবং কোদালকে কোদাল বলতে হবে। এটা করতে পারলেই আজকে সেভেন সিসটারকে সাহায্য করা সম্ভব হবে। সেভেন সিসটারও আমাদের সাহায্য করতে পারবে। আবার চট্টগ্রাম পোর্ট কিছুতেই হিন্দুস্থানের দখলে যাবে না। লিখিত-অলিখিত যে দলিলই থাকুক না কেন, যদি সেই তারিখে যে তারিখে সই করেছে, ডিসেম্বরের ২ তারিখে, ১৯৯৭ সালে আমরা যদি নেমে যেতাম চট্টগ্রামে ডাক দেবার পরে, তবে ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত। যখন সব স্তিমিত হয়ে যায়, মরে যায়, মনের সাহস চলে যায়, দুর্বলতা এসে যায়, তখন হঠাৎ ঘোষণা করা হয় সাধারণ ধর্মঘট। ড. মাহবুব উল্লাহ সাহেব, আপনারা তো আন্দোলন করেছেন, ড. আফতাব আপনারা তো আন্দোলন করেছেন, রক্তের বদলা রক্ত নিতে চেয়েছেন, যার জন্য বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। বাংলাদেশকে টিকানো আপনাদেরও কর্তব্য। আপনাদের দায়-দায়িত্ব ডিপ্লোমেটিক ফ্রন্টে যে রকম, পিপলস ফ্রন্টেও তেমনি। পিপলস আপনাদের পক্ষে আছে এটা হলো দুর্জয় সত্য। ভারত তার সৈন্য আনুক আর যাই আনুক না কেন, আমার জনতা যখন হাটে-মাঠে, জলে-স্থলে তাকে আঘাত করতে আরম্ভ করবে, তার পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে না। যেমন হয় নাই হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর পক্ষে। তারাও চেয়েছে তাদের চোখের সামনে ধুলা দিয়ে চলে গেছি আগরতলা। আপনারাও বার বার এসেছেন, গেছেন। কারণ পিপল ছিল আমাদের সাথে। ঘরে ঘরে আমাদের দুর্গ ছিল। সেই দুর্গ আজকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে। সে দুর্গ গড়ার উপর নির্ভর করবে আগামী দিনের সংগ্রামে আমরা বাঁচব কি বাঁচব না। হিন্দুস্থান বড় হউক, ছোট হউক, ফিজিক্যালী বড় হউক, মাসল পাওয়ার হউক, সব সত্য। কিন্তু হিন্দুস্থান শ্রীলংকাকে কি করছে? সবাই জানেন। হিন্দুস্থান ভুটানে কি করে, সেটাও আপনারাও জানেন। আমি একমাত্র বলি, আপনাদেরও বলা উচিত সবাই, ত্রিপক্ষিয় চুক্তি চাই পানির। পানির পলিসি ওয়ার্ল্ডে একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং এই কথা হচ্ছে যদি কোন যুদ্ধ হয়, ওয়াটার ফ্রন্টে যুদ্ধ হবে। পানির জন্য যুদ্ধ হবে। দেশে দেশে, এলাকায় এলাকায়। সেই পানি আজকে

www.pathagar.com

আমাদের প্রয়োজন। মরি-বাঁচি পানি আদায় করতে হবে। গঙ্গা বাঁধ করতে হবে। মরি-বাঁচি ব্রহ্মপুত্র বাঁধ করতে হবে। মরি-বাঁচি। আজকে তিস্তা ব্যারেজকে চোরেরা কোটি কোটি টাকা লুট করে ধ্বংস করে দিতে চাইছে, সেই তিস্তা ব্যারেজকে বাঁচাতে হবে। তার জন্য যা করণীয় তা করতে হবে।

নাহলে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা হবে না। দেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। অর্থনৈতিক অধিকার যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, রাজনৈতিক অধিকারের এক পয়সারও দাম নাই। রাজনৈতিক অধিকার তো সবারই আছে। যেমন আছে নেপালে। কি ভাবে ঐ ইন্ডিয়ান কারেন্সীতে আমার দেশের মাল কিনে নিয়ে যেত। আমার নিজের চোখের দেখা, সুতরাং রাজনৈতিক অধিকারের সাথে সাথে আমাদের অর্থনৈতিক অধিকার, আর্থিক শক্তি বাড়াবার জন্য যে প্রচেষ্টা, সেটা আমার চাই। কেন মিল আমার টিকবে না, কেন জুট মিল লুটেরারা লুট করে নিয়ে যাবে। কেন জুট মিলের মধ্যে স্টাইক চলবে? কেন পলিথিন চলবে? পলিথিন ব্যাগ বন্ধ করা হয়েছিল না? আদেশ দেয়া হয়েছিল বোধ হয় ১৯৯৩ সালে যে পলিথিন ব্যাগ আর ইউজ করা যাবে না। কয়েক দিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ, টাকা খেয়ে অর্ডার বদলিয়ে দিলেন। আজও পলিথিনের ব্যাগ হয়। অতএব এই যে ঘুষের খেলা, এই যে টাকার খেলা, এই যে ঘর বাঁধার খেলা, এই যে গাড়ী করার খেলা। সামান্য পুলিশ অফিসার কয় পয়সা বেতন পায়, তার নাকি এসি, দুইটা বাড়ী, দুইটা গাড়ী, ১৫ হাজার টাকা নাকি ভাড়া, ৪ হাজার টাকা নাকি সার্ভিস চার্জ। আবার আরেক পুলিশ অফিসার, সিআইডিতে চাকরি করে, ইন্সপেক্টর। তারও দেড় কোটি টাকার বাড়ী। তারও গাড়ী, ড্রাইভার। কোথা থেকে টাকা আসে এগুলো হাসিনা দেখে না? এগুলোর জন্য এমন আইন হতে পারে না? এদের জামিন দেয়া যাবে না, ফাঁসী দেয়া হবে। কয়েকটা ফাঁসী দিয়ে দেখুক। দেখি আবার সন্ত্রাস হয় কি না। দেখি আবার করাপশান হয় কি না। এভাবে সার্বিকভাবে দেশটাকে একটা রাস্তায় নিয়ে আসতে হবে। গ্যাস বিক্রি করবা? তুমি আমেরিকা, তুমি গ্যাস বিক্রি কর না কেন? তোমার মজুদ গ্যাস, তোমার মজুদ পেট্রোল বিক্রি কর না কেন? তুমি কেন আরব দেশে যাও? ওখানকার পেট্রোল লুট করার জন্য। কারণ ভবিষ্যতে যে পেট্রোল ফুরিয়ে যাবে তখন তোমার এই পেট্রোলের প্রয়োজন। তোমার এ গ্যাসের প্রয়োজন। তাই আমার দেশের গ্যাস লুট করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আজকে চেষ্টা চলছে এবং সেটা ভারতকে দেয়ার জন্য। তারা এক্সপোর্ট করার কথা বলে। আমার গ্যাস আমি এক্সপোর্ট করব কি করবো না, আমার গ্যাস আমার প্রয়োজন মিটাতে পারবে কি পারবে না, আমার বাপেক্স রয়েছে, আমার পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন রয়েছে, তারাই ভাল করে বলতে পারে, সেখানে কেন যাবে সেটা?

এই যে সার্বিকভাবে দেশটাকে বিক্রি করার জন্য নেতাদের কম্পিটিশান, ক্ষমতা দখলের কম্পিটিশান, ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট খাওয়ার কম্পিটিশান। হংকং ব্যাংকে টাকা জমা হয়। তার বিরুদ্ধে স্বয়ং ডাইরেক্টর জেনারেল নাম বলবো না এখন, তিনি একজন সিএসপি অফিসার, এখন অবশ্য হাসিনাও তাকে এডিশনাল সেক্রেটারী থেকে সেক্রেটারী কিছুতে করে না, কারণ তার পক্ষের লোক নয় সে। তিনি কারো পক্ষের লোক নয়। তিনি হলেন এডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষের লোক। তিনি তাকে প্রসিকিউট করেছেন। এভাবে তো দেশ চলতে পারে না। সেজন্য সাদেক খান সাহেব সম্পর্কে আমার বক্তব্য, একদিন আপনার সাথে আমি কাজ করেছি, এবং আপনার সিনসিয়ারেটি আমি দেখেছি। আজকের কথা আমি বলতে পারি না। তখনকার

www.pathagar.com

সিনসিয়ারেটি আমি দেখেছি। শিক্ষা সম্মেলনে আপনার যে দান, আমি তো 'ব' কলম লিখতে জানি না। আপনি লিখে দিতেন, সেগুলো আমার মনে আছে, আপনারও একটা ভূমিকা, শুধু পত্রিকায় লেখা না। অন্য জায়গাও একটু নামা দরকার হয়ে পড়েছে। আর বাঁচবেন কত। বেঁচেই বা লাভ কি ? দেশই যদি না থাকে, জনতাই যদি না থাকে, লুটেরাই যদি থাকে, লুটেরাই যদি শোষণ করে। লুটেরাই যদি বাড়ী-ঘর করে, লুটেরাই যদি অত্যাচার করে, লুটেরাই যদি রেপ করে বেড়ায়। তার বিরুদ্ধেই যদি আমরা কিছু না বলতে পারি, দাঁড়াতে না পারি, দুঃখজনক হবে। আমি আমার বক্তব্য অনেক বড় করে ফেলেছি বোধ হয় খুব অন্যায় করে ফেলেছি। আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে আমার বক্তব্য আজকে এখানেই শেষ করলাম। তো আগামী দিনে আশা করি এ ধরনের অনুষ্ঠান আরো হবে, কিন্তু অ্যাকশন প্রোগ্রাম সম্পর্কেও সবাই একটু চিন্তা করেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। খোদা হাফেজ।

আবদুল হাই শিকদারঃ অনেক দীর্ঘ এবং প্রাঞ্জল, প্রাণবন্ত, সময়োপযোগী বক্তব্যের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

১৯৮৪ সালে কারামুক্ত জননেতা অলি আহাদকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন আশুগঞ্জ মজদুর ফেডারেশনের আঞ্চলিক কমিটির নেতা কর্মিরা। বাম থেকে ৩য় আ স ম এনামুল হক, মসিউর রহমান, মাঝখানে জনাব অলি আহাদ পার্শ্বে এহসানুল হক সেলিম প্রমুখ।

www.pathagar.com

একুশ ফেব্রুয়ারি থেকে ছাব্বিশ মার্চ ইতিহাসকে ইতিহাসের মতো করে লেখা যায় না কি

নির্মল সেন

ইতিহাসকে ইতিহাসের মতো করে লিখলে কেমন হয়? প্রশ্নটি অনেকের কাছে অবান্তর মনে হবে। বলবেন, ইতিহাস তো ইতিহাসের মতো করেই লেখা হয়। নইলে তো আর ইতিহাস হয় না। একথা মেনে নিয়েই আমি বলছি- আমাদের দেশে ইতিহাস লেখা নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি এবং সংশয় আছে। সবাই বলছি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে। তারপর নিজে যা লিখছি, তাও বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের একটি মন্তব্য আছে। তিনি তার এক লেখায় Time অর্থাৎ সময়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সময় হচ্ছে ঘটনার কথামালা। আমরা যদি এমনি করে নিজের মনের মাধুরী না মিশিয়ে ঘটনার কথামালা লিখতাম তাহলে নিশ্চয়ই ইতিহাস বিকৃতির জন্য প্রায় প্রত্যেকেই অভিযুক্ত হতাম না।

একটি নির্দিষ্ট প্রসঙ্গেই আজ কথাগুলো লিখছি। দীর্ঘদিন ধরে এমন একটা কিছু লেখার কথা ভাবছিলাম। বার বার লক্ষ্য করছি বিশেষ করে শহীদ দিবস-২১ ফেব্রুয়ারী ও ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে আমরা একমত হতে পারছি না। একমত না হওয়া অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়। কিন্তু কেউ যেন অপরকে শ্রদ্ধা করতে পারছি না। প্রায়ই অবাঞ্ছিত বাক্য ব্যবহার করছি।

প্রথম ২১ ফেব্রুয়ারির কথায়ই আসা যাক। দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা কী ছিল। আদৌ কোন ভূমিকা ছিল কি-না? অনেকের লেখা পড়লে মনে হয়, তিনিই আড়াল থেকে সবকিছু করেছেন। আবার কেউ এমনভাবে লেখেন যে, শেখ সাহেবের কোন ভূমিকাই ছিল না। কিন্তু একথা কি সত্য যে, আর অনেকের মতো ১৯৪৮ সাল থেকে এই ভাষা আন্দোলনে শেখ সাহেবের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল? ১৯৪৯ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভূক্ত কর্মচারীদের আন্দোলনে নেমে গেলেন। তিনি জেলে বসেই আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক হলেন। এ ধরনের ঘটনা নিশ্চয়ই হঠাৎ করে ঘটে না। তবে দুঃখের কথা হচ্ছে- কোন ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কেউ সবকিছু বলেন না। অন্য সবাই যদি শেখ সাহেবের মতোই হতেন তাহলে তাদের মধ্যে কেউ হয়তো জেলখানায় বসে আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক হতেন। তা কিন্তু হননি। আবার যারা শেখ সাহেবকে বড় করার জন্য লেখেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের স্রষ্টা ছিলেন বা সবচেয়ে বড় নেতা ছিলেন, তারা কেউই উল্লেখ করেন না যে ওই ছাত্রলীগের প্রথম আহ্বায়ক ছিলেন জনাব নইমুদ্দিন। ১৯৪৮ সালে ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের জন্ম। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম। এই বছরখানেকের মধ্যে শেখ সাহেব আবার জেলেও ছিলেন। তাই তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের

www.pathagar.com

স্রষ্টা বা বড় নেতা হওয়ার সুযোগ কখন পেলেন? সেই কথাটা কেউ ভেবে দেখতে চান না। যারা আবার শেখ সাহেবকে জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী লীগের বড় নেতা হিসেবে আখ্যায়িত করতে চান তারা তাদের লেখায় উল্লেখ করেন না যে, আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জনাব শামসুল হক। তিন নম্বর নেতা ছিলেন জনাব শেখ মুজিবুর রহমান।

এই ইতিহাস লিখতে হলে বিভাগ পূর্ব মুসলিম লীগের রাজনীতির উল্লেখ করতে হবে। মোটামুটি ভাবে তখন তিনটি ধারা মুসলিম লীগে বিরাজ করত। একটি খাজা নাজিমুদ্দিন, দ্বিতীয়টি শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং তৃতীয়টির নেতা ছিলেন জনাব আবুল হাশিম। সেকালে ছাত্র-যুবকদের মধ্যে আবুল হাশিমের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। নাজিমুদ্দিন বিরোধী রাজনীতিতে সেকালে আওয়ামী লীগে শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ ও আবুল হাশিম গ্রুপের ঐক্য হয়েছিল আওয়ামী মুসলিম লীগে। ফলে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন আবুল হাশিম গ্রুপের জনাব শামসুল হক। আর যুগ্ম সম্পাদক হয়েছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের জনাব শেখ মুজিবুর রহমান। এই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনীতির একটি ধারা পাওয়া যায়। সেই ধারায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত সঠিকভাবে বিচার করা যায় শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা। সেই ভূমিকা নিশ্চয়ই আদৌ তুচ্ছ করার মতো নয়। ইতিহাসের এই পর্বে কোন সংগ্রাম বা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান অনুপস্থিত ছিলেন না।

প্রশ্ন ওঠে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি নিয়ে। বলা হয় তিনি তখন আড়ালে থেকে সবকিছুই পরিচালনা করেছেন। তিনি তখন জেলখানায় থেকেও যে সক্রিয় ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে সব কিছুই তিনি পরিচালনা করেছেন- একথা বললে কিছুটা বাড়াবাড়ি হয় বৈকি। তিনি ও জনাব মহিউদ্দিন আহমদ তখন ঢাকা জেলে ছিলেন। আমিও ঢাকা জেলের অন্য ওয়ার্ডে ছিলাম। তারা দুজনে মুক্তির জন্য অনশন করলে, তাদের ভিন্ন জেলে বদলি করা হয়। যে কোন প্রবন্ধকার বা লেখক নিশ্চয়ই তাদের তৎকালীন সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হবেন। সেখানে বাড়াবাড়ির অবকাশ একান্তই কম। তবে আমি ভিন্নভাবেও এ প্রশ্নটির মূল্যায়ন করি।

প্রশ্নটি হচ্ছে জেলে থাকা। আমার ধারণা, আমার জেলে থাকাও একটি রাজনৈতিক অস্তিত্ব। সেই অস্তিত্ব নিশ্চয়ই বাইরের রাজনীতিকে অনুপ্রাণিত করে এবং জেলখানায় থেকে আমি যতটুকু ভূমিকাই পালন করি না কেন, আমি নিশ্চয়ই আশা করব যে, আমার বন্ধুরা আমার সে ভূমিকাকে গুরুত্ব দেবে এবং কোনক্রমেই খাটো করে দেখার চেষ্টা করবে না। আমার দুঃখ হচ্ছে, শেখ সাহেবের ভূমিকা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এখানে অনেকেই যেন কার্পণ্য করেন। আর শেখ সাহেবের সমর্থক বলে যারা প্রায় চামচার ভূমিকায় নেমেছেন তারা প্রায় প্রতি বছর সংবাদপত্র, বেতার এবং টেলিভিশনে বাড়াবাড়ি করে এই মানুষটিকে হত্যা করেন নির্দ্বিধায়। এবারও তাই-যে লক্ষ্য করেছি। একদল তাকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের একমাত্র নেতা বানানোর চেষ্টা করেছে, অপর দল তাকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেকালের ইতিহাস তো একথা বলে না। তাই আমার প্রশ্ন- সেকালের যতটুকু ইতিহাস আমরা জানি সে ইতিহাসে যার যতটুকু অবদান আছে সে অবদানের স্বীকৃতি দিলেই তো একমাত্র অবিকৃত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাই নয় কি? ভাষা আন্দোলন নিয়ে

www.pathagar.com

বিতর্ক আর একটি ক্ষেত্রে বেদনার কারণ হয়। আমি তখন জেলে। জেলখানায় যতটুকু খবর পেতাম, তাতে শুনেছিলাম সেকালে ভাষা আন্দোলনে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন জনাব অলি আহাদ। জেলখানায় থেকে যতদুর শূনেছি, জনাব অলি আহাদ বি.কম পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। কিন্তু রাজনীতির জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেননি। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, জনাব অলি আহাদ সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও অনেকে এখন লেখালেখি করেন, অনেকে সাক্ষাৎকার দেন, তারা সবাই সযত্নে অলি আহাদের নামটা এড়িয়ে যান। এরাই আবার ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক শিক্ষক ছিলেন। রসায়ন বিভাগের জনাব নূরুল হক ভুঁইয়া। শুনেছি তিনি নাকি একসময় ভাষা আন্দোলনের সংগ্রাম কমিটির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহবায়ক ছিলেন। জেলে যাওয়ার আগে এবং পরে সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকা পড়েছি। কখনও কখনও মনে হত সৈনিক পত্রিকাই বুঝি ভাষা আন্দোলনের একমাত্র মুখপত্র। আমরা যারা আজকে লেখালেখি করি, তাদের অনেকের সঙ্গে সেদিনের সৈনিক পত্রিকার নেতাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক এখন একদম বিপরীত মেরুতে। তাই কোন পক্ষই অন্য পক্ষের ভূমিকার গুরুত্ব দিতে চাই না। সবার বক্তব্য রাজনৈতিক এবং একপেশে। অর্থাৎ সত্যিকারের ইতিহাস একেবারেই অনুপস্থিত। কিন্তু ইতিহাস তো এভাবে লেখা হয় না। সিরাজ-উদ-দৌলা বা মীরজাফর কাউকেই কিন্তু বাংলার ইতিহাস থেকে বাদ দেয়া যায় না। বাদ দিতে গেলে পুরো ইতিহাস নয় খণ্ডিত ইতিহাস লেখা হয়। আমার এ বক্তব্য সঠিক নয় কি?

আমরা একই সংকটের সম্মুখীন হই স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে। ভেবেছিলাম দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৩০ বছর কেটে যাচ্ছে, হয়তো এবার আর স্বাধীনতার ঘোষকের বিতর্কটা হবে না। কিন্তু আমার প্রত্যাশা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এবার আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ২৬ মার্চ রাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই ঘোষণা বেতারে পাঠ করেছিলেন চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুল হান্নান। সুতরাং শেখ সাহেবই স্বাধীনতার ঘোষক। কোন মেজর নয়।

এব্যাপারে আমি মতানৈক্য করছি না। কিন্তু এটাও সত্য যে, ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ আমি নিজের কানে ঘোষণাও শুনেছিলাম। এর আগে আমি আমাদের ডাক ঘরে শেখ সাহেবের ঘোষণাটি পড়েছি। আবার ২৭ মার্চ মেজর জিয়ার ঘোষণাটাও কানে শুনেছি। মেজর জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল। একটি গণ্ডগ্রামে সেই ঘোষণা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমাকে অনুপ্রাণিত করার ঘটনাটি নিশ্চয়ই মিথ্যা নয়। আর এই ঘোষণাটি সে মুহূর্তে আমার কাছে নিশ্চয়ই মহামূল্যবান ছিল। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের নেতাদের কথাবার্তায় এই ঘোষণার যৌক্তিকতা খুঁজে পেয়েছি। জানতে পেরেছি সেদিন যারা চট্টগ্রামের বেতার কেন্দ্রে ছিলেন, যারা বেতার কেন্দ্রে মেজর জিয়াকে দিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং তারা একটি নির্ধারিত কৌশল অবলম্বনের জন্যই সামরিক বাহিনীর একজন মেজরকে দিয়ে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং একথাও সত্য যে, সামরিক বাহিনীর একজন মেজর এই ঘোষণা দেয়ায় একটি ভিন্ন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণ মানুষ ভেবেছিল তাহলে সামরিক বাহিনী আমাদের সঙ্গে আছে এবং আমরা এ যুদ্ধে জিতবই।

আমার কাছে এইটুকু পর্যন্তই সেদিনের মেজর জিয়ার ঘোষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং কিছুতেই উপেক্ষা করার মতো নয়। এবং মেজর জিয়ার ঘোষণাও শেখ সাহেবের নেতৃত্ব

www.pathagar.com

মেনে নিয়েই অর্থবহ হয়। মেজর জিয়াও তার পরবর্তী ঘোষণায় শেখ সাহেবের নাম উচ্চারণ করেছেন। শেখ সাহেবের নাম যেমন বাদ দেয়ার প্রশ্ন ওঠে না, আর সে প্রচেষ্টাও মেজর জিয়া করেননি। আজকে যারা মেজর জিয়াকে স্বাধীনতার একমাত্র ঘোষক বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন, আমার মতে তারা স্বাধীনতার ঘোষণার মর্মার্থ বোঝার কোনদিন চেষ্টা করেননি। স্বাধীনতার ঘোষণা কোন অর্থেই একটি একক কর্মকাণ্ড নয়। এটা আকাশ থেকে পড়া নয়। এর অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ থাকে। তাই স্বাধীনতার ঘোষণার সঙ্গে স্বাধীনতা যুদ্ধের গতি-প্রগতি, একটি সরকার এবং একটি কাঠামোর প্রশ্নও জরুরি হয়ে ওঠে। জরুরি হয়ে ওঠে এই ঘোষণা বাস্তবায়নের বাস্তব দিকটি। সেই ক্ষেত্রে সেকালের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা অনেক অর্থবহ। ওই ঘোষণার সঙ্গে তার নাম জড়িত থাকলেই একটি দল এবং একটি কাঠামোর কথা সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারিত হয়। সে কাঠামো নির্মাণের দায়িত্ব সেই দলটির ওপর পড়ে এবং একথা স্পষ্ট যে, সেদিন কোন ঘোষণাই কাজে আসত না যদি সেদিন স্বাধীন বাংলা সরকার গঠিত না হতো। আর ওই সরকারের নেতৃত্ব কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের। বাস্তব কারণেই মেজর জিয়ার নয়। তাই যারা মেজর জিয়াকে স্বাধীনতার একমাত্র ঘোষক বলে আজও দাবি করেন, আমার মনে হয় তারা এ বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করেন না। শেখ সাহেব- তার ব্যক্তিত্ব, তার নেতৃত্ব এবং তার সংগঠনকে বাদ দিয়ে ১৯৭১ সালে কোন কিছুই চিন্তা করার অবকাশ ছিল না। সেখানে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে জিয়াউর রহমান যে ভূমিকা পালন করেছেন সে জন্য তার প্রাপ্য মর্যাদা তাকে দিতেই হবে এবং সে দিক থেকে জিয়াউর রহমানের সেই ঘোষণা নিশ্চয়ই ইতিহাসের অঙ্গ।

তাই আমি মনে করি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিকৃত ইতিহাস লিখতে হলে শেখ সাহেবের ২৬ মার্চের ঘোষণা এবং জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের ঘোষণা-এর কোনটাকেই বাদ দেয়া যাবে না। বাদ দেয়া হবে মিথ্যাচার। অথচ আমরা এই কাজটিই করছি। এই দুটি ঘটনাকে এক প্রেক্ষাপটে দাঁড় করিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা হচ্ছে না। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের চেয়ে বড় হয়ে উঠছে দলবাজির ইতিহাস।

কিন্তু কোন দল বা নেতার ইতিহাস তো কোন দেশের ইতিহাস হতে পারে না।

[নির্মল সেনঃ বিশিষ্ট সাংবাদিক, বাম রাজনীতিক। উপরোক্ত নিবন্ধটি ১২ এপ্রিল ২০০০ তারিখে দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত হয়।]

www.pathagar.com

অলি আহাদের রাজনীতি ॥ ভিন্ন মতাবলম্বীর দৃষ্টিতে

শফিকুল আজিজ মুকুল

এই তো সেদিন নির্বাচন হলো। কোন কোন আসনের স্থগিত কেন্দ্রগুলোতে নির্বাচন এখনো বাকী। কেন সে কেন্দ্রগুলোতে নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে আর কেনই বা এধরনের অন্যান্য আসনে পুনরায় নির্বাচন হবে না সে ব্যাপারে প্রশ্ন থাকলেও সারা দেশে কারা সন্ত্রাস ও গুণ্ডামির মাধ্যমে মানুষের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে, তা নিয়ে কারো মনে কোন দ্বিধা নেই। এটা কোন ঘরোয়া ব্যাপার নয় যে, চার দেয়ালের ভিতর তা সীমাবদ্ধ ছিল। সারা দেশের ভোট কেন্দ্রগুলোতে, স্কুলে, কলেজে, মক্তবে, মাদ্রাসায়, এমনকি প্রকাশ্য রাজপথেই সেই লুণ্ঠন কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনসাধারণ তা দেখেছে এবং অবাক বিস্ময়ে দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে নিতান্ত হতাশা নিয়ে ঘরে ফিরেছে।

এবারই যে প্রথম এধরনের নির্বাচন হলো-তাও নয়। সামরিক শাসনের অধীনে এর আগেও একটা নির্বাচন হয়েছে। তফাৎ শুধু সংঘাত, সংঘর্ষ ও কারচুপির সকল রেকর্ড এবারের নির্বাচন ম্লান করে দিয়েছে। এবারের এই নির্বাচনের মহরত অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেবার চট্টগ্রামের উপনির্বাচনে। সরকারী দলের প্রার্থী ছিলেন কর্ণেল অলি। ট্রাকে ট্রাকে সশস্ত্র ব্যক্তিরা তখন ঘুরে বেড়িয়েছে তার নির্বাচনী এলাকায়। ভোটারদেরই শুধু নয়, এলাকায় প্রবেশে বাধা দেয়া হয়েছে বিরোধী দলের প্রবীণ নেতৃবৃন্দকে। হাইজ্যাক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের এলাকা থেকে অনেক দূরে। দেশী-বিদেশী পত্র পত্রিকা এবং সংবাদ সংস্থাগুলো অভূতপূর্ব সে সন্ত্রাসের খবর তখন পরিবেশন করেছিল।

তাতে সরকারের টনক নড়েনি। এবারও নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ সম্পর্কে সরকার মুখ খুলছেন না। এ সবের পরিণতি কি হবে তা ভবিষ্যতই বলতে পারে। কিন্তু রাজনীতিকদের মধ্যে কেউ কেউ যখন সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে জনসাধারণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন তখন সন্দেহ জাগে, কাজটা কি তারা বুঝে শুনেই করছেন না অবুঝ তত্ত্বাগীশতায় ভুগে অজান্তেই নিজেদের 'বিদেশী সেবাদাসত্ব এবং আভ্যন্তরীণ ফ্যাসীবাদের কৃষ্ণ অধ্যায়ের' সঙ্গে যুক্ত করে ফেলছেন।

অলি আহাদ সাহেব শ্রদ্ধেয় লোক। পাকিস্তানের রাজনীতির গোড়ার দিকে তাঁর ভূমিকা এখনো জনসাধারণ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। শিক্ষা সম্মেলন থেকে শুরু করে গণতান্ত্রিক যুব আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রাম এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আপোসহীন একজন নেতা হিসেবে তিনি সে দিনের তরুণ সমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শত শত প্রতিভাবান যুবক সে সময়ই দেশের রাজনৈতিক গতি ধারার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে।

পাকিস্তানে সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে পরিচালিত সেদিনের সেই

www.pathagar.com

আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে পরম গৌরবময় অধ্যায়। সে অধ্যায়ে যেমন রয়েছে জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং শামসুল হক সাহেবের সুদৃঢ় সংগ্রামী নেতৃত্ব তেমনি রয়েছে তাজুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ, মাহমুদ আলী ও মোহাম্মদ তোয়াহা সাহেবের মতো রাজনীতিকদের নিরবচ্ছিন্ন কর্মকুশলতা। সবার ঐক্য প্রয়াসের ফলেই বাঙ্গালী সেদিন পাকিস্তানী স্বৈরশাসকদের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা একের পর এক প্রতিহত করতে পেরেছিল।

বায়ান্নতে ভাষা আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন পাকিস্তানী শাসকেরা অপপ্রচার চালায়, সীমান্তের ওপার থেকে হাজার হাজার হিন্দু লুঙ্গি পরে এসে বিরোধী দলগুলোকে মদদ জোগাচ্ছে। সে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তখন নেতৃবৃন্দ সমস্বরে আওয়াজ তুলেছিলেন। চুয়ান্নর নির্বাচনে সেই একই অপপ্রচারের পুনরাবৃত্তি করা হয়। বলা হয়, ভারত থেকে হিন্দুরা এসে যুক্তফ্রন্টের বাক্সে ভোট দিচ্ছে। নেতৃবৃন্দ সেবারও সে অপপ্রচারের যুৎসই জবাব দেন। শুধু কি বায়ান্ন আর চুয়ান্নতে? ছেষট্টিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন ছ'দফা পেশ করেন তখনো সেই একই অভিযোগ তোলা হয় বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে। পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন যখনই জোরদার হয়েছে তখনই একশ্রেণীর লোক হয় 'ইসলাম গেল' 'ইসলাম গেল' বলে রব তুলেছেন অথবা সে আন্দোলনকে ভারতের সমর্থনপুষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন। সেই একই অবস্থা চলছে তিন দশক পরেও।

বাংলাদেশ হবার পর আশা করা গিয়েছিল সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে কায়েমী স্বার্থবাদীদের সে চক্র সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস না হলেও সাময়িকভাবে পরাভব মানে। যারা একসময় দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের অনেকেই স্বাধীনতার পূর্বে রাজনীতির মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। শামসুল হক সাহেব সেই পঞ্চাশের দশকেই মারা যান। মাহমুদ আলী একবার বাম ও আর একবার দক্ষিণ পন্থী রাজনীতিতে কান্নি খেয়ে অবশেষে স্বাধীনতা সংগ্রামের চরম বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। তোয়াহা সাহেবকে তার রহস্যজনক রাজনৈতিক গতি বিধির জন্য সেই ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়েই মওলানা ভাসানীর ন্যশনাল আওয়ামী পার্টি থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। সেদিনের সেই নেতাদের মধ্যে মওলানা ভাসানী এবং তাজুদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। বাকীরা যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন তেমনি স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পরাভূত শক্তির সাথে হাত মেলান। একসময় যে শ্লোগান ছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর কণ্ঠে সেই শ্লোগানই উঠে আসে পঞ্চাশ দশকের সেই তারুণ্য দীপ্ত নেতাদের মুখে। সব কিছুর জন্য ভারতকে দায়ী করা এমনকি মুক্তিযুদ্ধে বাঙ্গালী যুবকদের অসমসাহসী ভূমিকা খাটো করে দেখিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতাকে মুখ্য করে তোলা তাদের রাজনৈতিক ষ্ট্র্যাটেজির অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। বলতে শুরু করেন জনসাধারণের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন ও মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র সংগ্রাম নয় বরং বাংলাদেশ জন্মলাভ করেছে ভারতীয় সেনা বাহিনীর ঔরসে। ঠিক একই কথা প্রতিধ্বনিত হয় পাকিস্তানী মন্ত্রিসভার সদস্য মাহমুদ আলীর কণ্ঠে। বাংলাদেশে পরাভূত প্রতিক্রিয়াশীল চক্র তাদের এককালীন প্রতিপক্ষের চেহারায় নিজেদের আদল খুঁজে পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন কিনা জানি না তবে উভয়ে যে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে পরাভূত রাজনীতি পুনর্বাসনের কাজে মরিয়া হয়ে উঠেন, তা পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে পরিষ্কার হয়ে পরে।

www.pathagar.com

মধ্য সত্তুরে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারকে উৎখাত করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাজুদ্দীন আহমদ সহ আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতারা নিহত হন। এই হত্যাযজ্ঞের যারা হোতা তারা আশ্রয় লাভ করেন অলি আহাদ সাহেবদের কাছে। মুশতাক আহমদকে নেতৃত্বে বরণ করে নিয়ে তিনি নতুন দল গঠন করেন। সে দলও বিভক্ত হয় চার ভাগে। একভাগ মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে। জনাব অলি আহাদের ভাষায়ই সামরিক সরকারের সহযোগিতায় লিপ্ত। শাহ মোয়াজ্জেম সরাসরি ঢুকে পড়েন এরশাদ সাহেবের মন্ত্রিসভায়। রউপ সাহেবের নেতৃত্বাধীন গ্রুপ রয়েছেন খালেদা জিয়ার সাত দলীয় জোটে। আর চতুর্থ গ্রুপ নিয়ে অলি আহাদ সাহেব এখনো রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

সে লড়াইয়ে জেতার জন্য নতুন নতুন চমক সৃষ্টি যদি তার উদ্দেশ্য হয় তবে তিনি নির্বাচনে ব্যাপকভাবে ভারতীয় নাগরিকদের অংশ গ্রহণের অভিযোগ তুলে ভুল করেননি। কিন্তু উদ্দেশ্যটা তার তত সরল নয়। অন্ততঃ অলি আহাদ সাহেবের গত একদশকের রাজনীতি দেখে তা মনে হয় না। তিনি দেশে যে কোন সমস্যার পেছনেই ভারতের হাত খুঁজে ফেরেন। আসল 'ভিলেন' রয়ে যায় পর্দার অন্তরালে।

ভারতের দিক থেকে আমাদের কোন সমস্যা নেই-এমন নয়। উভয়ে আন্তরিকভাবে চাইলে সে সমস্যার হয়তো সমাধানও পাওয়া যাবে। কিন্তু দেশে যা কিছু ঘটছে তার সবটাতেই ভারতীয়দের হাত রয়েছে এমন উক্তি আমাদের আত্ম-সম্মানকেই ভূলুণ্ঠিত করে। অলি আহাদ সাহেবরা নেতৃত্বের আসনে বসে বরাবর সেই অসম্মান জনক কাজটিই করে যাচ্ছেন। স্বৈর শাসকদের দিকে আঙ্গুল না তুলে তুলছেন ভারতের দিকে, সন্ত্রাসবাদীদের সমালোচনা না করে করছেন রুশ-ভারত অক্ষশক্তিকে, দেশের জন-প্রতিনিধিত্বশীল সরকারকে যারা বন্দুকের মুখে উৎখাত করলো তাদের কোলে তুলে কোশ্চেন করছেন সেই সরকারেরই বৈধতা নিয়ে। এমনি আরো অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

আগেই বলেছি, অলি আহাদ সাহেব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। গত দু'তিন দশকের রাজনীতিতে তার যে ভূমিকাই থাকুক না কেন পাকিস্তানী রাজনীতির সেই গোড়ার দিকে তার অবদান অনস্বীকার্য। ছাত্র জীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সে সময়ের রাজনীতি সম্পর্কে তার লেখা গ্রন্থও আমাকে তাঁর প্রতি কম শ্রদ্ধাশীল করে তোলেনি। স্বাভাবিকভাবে তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত আমার কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি দেশ বিদেশের ঘটনাবলী ও খবরা-খবর রাখেন। আমাদের দেশেরও যে রাখেন তো তো বলাই বাহুল্য। বিগত এক দশক ধরে বিভিন্ন সরকারের মন্ত্রীরা বলছেন, আমরা স্বাধীনভাবে কোন পরিকল্পনা নিতে পারি না, কোন কর্মসূচী প্রকল্পে হাত দিতে পারি না। আমাদের হাত আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা ও ঋণদাতা দেশগুলোর কাছে বাধা। তারা চাইলে আমাদের পরিকল্পনাগুলো কাটছাঁট করতে হয়। আবার তাদের ইচ্ছে অনুসারেই নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। তারা চাইলে দেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়াতে হয় আবার তারা চাইলে মিল কলকারখানা সব ব্যক্তি মালিকানায় ফেরত দিতে হয়। তারা চান বলেই বিভিন্ন প্রকল্পে নিজেদের দেশের যোগ্য লোকদের চাকরি না দিয়ে কয়েকগুণ বেশী বেতনে তাদেরই দেশ থেকে লোক এনে নিয়োগ করতে হয়। খোদ মন্ত্রীদের কাছ থেকে এতো কিছু শোনার পরও অলি আহাদ সাহেব কেন নতুন করে বিদেশী সেবাদাসত্ব ফিরিয়ে আনার চক্রান্ত চলছে বলে আশংকা

www.pathagar.com

প্রকাশ করছেন তা বুঝে উঠা মুস্কিল। তিনি কি তবে বলতে চান এতদিন সব ঠিক ঠাক ছিল। ঐ মন্ত্রীরা যা বলেছেন তা সব মিথ্যে।

রাজনীতি তিনি যাই করুন না কেন, তাঁর পত্রিকায় মাঝে মধ্যে সত্য কথাই লেখা হয়। এদেশে গণতন্ত্রহীনতার জন্য কারা দায়ী তা একবার তিনি স্পষ্টভাষায় লিখেছিলেনও। সে লেখায় হঠাৎ করে ঝলক দিয়ে উঠেছিলো তিন দশক আগের সেই মেধাবী বুদ্ধিদীপ্ত তরুণের চেহারা। যিনি দিন রাত পরিশ্রম করে চলেছেন দেশে সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে। যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে গড়ে তুলেছেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

সেই তরুণ আজ হারিয়ে গেছেন। পুরো এক দশক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সামরিক শাসন বলবৎ থাকার পর গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনার আন্দোলন যখন নুতন এক স্তরে উত্তীর্ণ তখন হত্যা, সামরিক অভ্যুত্থান ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি উপলব্ধি করছেন, দেশকে ফ্যাসীবাদের কৃষ্ণ অধ্যায় ফিরিয়ে নেয়ার চক্রান্ত চলছে। এটা শুধু দুঃখজনক নয়, রীতিমতো লজ্জাস্কর।

[নিবন্ধটি দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকায় বিগত ১৭ মে, ১৯৮৬ প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য বিশিষ্ট সাংবাদিক ও আওয়ামী লীগ নেতা শফিকুল আজিজ মুকুল সংবাদপত্রে "নিত্য নিয়ত" কলামে নিরঞ্জন ছদ্মনামে লিখে থাকেন।]

২৭শে আগষ্ট ৯৬ সালের "পানির বিনিময়ে ট্রানজিট শর্ত মানিনা" শীর্ষক আলোচনা সভায় ভাষনদানরত বর্ষিয়ান জননেতা অলি আহাদ। বামদিক থেকে মঞ্চে বসা অত্র বইয়ের সম্পাদক মুন্সি আবদুল মজিদ. সাইফুদ্দিন আহমেদ মনি, আজিজুল হক মুক্ত।

www.pathagar.com

একুশের ঘটনাপঞ্জী

খোন্দকার গোলাম মুস্তফা

[প্রবন্ধটি বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাবেক রাষ্ট্রদূত খন্দকার গোলাম মুস্তফার 'যেন ভুলে না যাই একুশের ঘটনাপঞ্জী প্রবন্ধের অংশ বিশেষ। প্রবন্ধটি কবি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত বহুশোক প্রথম সংকলনে প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের সামনে একুশের ঘটনা প্রবাহের চিত্র তুলে ধরার প্রয়োজনে এই প্রবন্ধটি 'দৈনিক দেশ পত্রিকার ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ প্রকাশিত হয়।]

জাতীয় স্বাধীনতার প্রধান উপাদান ভাষার অধিকার এবং বোধকরি সেই জন্যই নব্যশক্তিকে শুব্ধ করার গর্জন শোনা গেলঃ উর্দু এণ্ড উর্দু অনলি শেল বি দি স্টেট ল্যাণ্ডয়েজ অব পাকিস্তান। উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

১৯৪২ সালের ইতিহাসের বিকৃতি পর্যায়ে থেকে বৃটিশ সবকারের ৩ জুনের (১৯৪৭) ঘোষণা কাল পর্যন্ত পাকিস্তান আন্দোলনের অন্তর্নিহিত নব্য শক্তির প্রস্তুতি পর্ব। কোলকাতা সিটি মুসলিম ছাত্রলীগ, শহীদ-হাশিম গ্রুপের উদারপন্থী মুসলিম লীগ মহল এবং সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ মুসলিম তরুণ বুদ্ধিজীবীদের একাংশ সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করলেন আসন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার জন্য। পূর্ব পাকিস্তানের একটি গণতান্ত্রিক যুব সংস্থা ও একটি প্রগতিশীল ছাত্র সংস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনায় পরবর্তীকালে জন্ম দিল পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুব লীগ এবং পূর্ব পাকস্তান ছাত্রলীগ।

প্রবীণ চিন্তাধারা ১৪ আগষ্টের পর যেমন পেলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক শক্তির উৎসাহ, নবীন চিন্তাধারা পেলো সাংগঠনিক শক্তির হাতিয়ার ও উন্নততর আদর্শের ধর্ম। ফলে উভয় চিন্তাধারার স্বাধীনতা পূর্বকালের সুপ্ত দ্বন্দ্ব স্বাধীনতা উত্তরকালে সুস্পষ্ট সংকটে রূপান্তরিত হলো। এবং সে সঙ্কটের গভীরতার অভিব্যক্তি ঘটলো কার্জন হলের সেই সুধী সমাবেশে-- একমাত্র উর্দুর আস্ফালন স্তব্ধ হয়ে গেলো বজ্রকণ্ঠের "না" ধ্বনির তরংগাঘাতে।

২১শে ফেব্রুয়ারী '৫২ আন্দোলনের পথিকৃত ১১ই মার্চের ৪৮ আন্দোলন ছিল এই ঐতিহাসিক না-ধ্বনির উত্তাল তরংগ। ঢেউ লাগলো সারা প্রদেশে। স্বাধীনতাকামী জনসমষ্টির যেনো নব যাত্রা শুরু হলো। তরুণ সমাজ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর থেকে বেরিয়ে এলো রাস্তায় পুলিশের মুখোমুখী। কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে এরা পাকিস্তানের নবশক্তি স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এরা উপরতলার চক্রান্ত উপেক্ষা করে কোলকাতার দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় শান্তি মিছিলের সামিল হয়েছে, বৃটিশ বিরোধী শ্লোগানের কোলকাতার রাজপথ কাঁপিয়ে তুলেছে, ২৯শে জুলাইয়ের ১৯৪৬ সর্বাত্মক হরতাল সফল করেছে, রশিদ আলী দিবসের যৌথ নেতৃত্বে অংশ গ্রহণ করেছে।

www.pathagar.com

১০ই জানুয়ারী ১৯৭১ কুমিল্লা টাউন হলে অনুষ্ঠিত বাঙলা জাতীয় লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ভাষন দান করছেন সাধারন সম্পাদক জনাব অলি আহাদ।

১৯৮২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারী ডিডিএস মিলনায়তনে ভাষনরত ভাষা আন্দোলনের সিপাহসালার অলি আহাদ মঞ্চে বাম থেকে ভাষা সৈনিক সর্বজনাব কাজী আজিজুর রহমান, সামছুল আলম, মজদুর ফেডারেশনের সভাপতি আনিসুর রহমান, ভাষা সৈনিক মোঃ সুলতান, নারায়নগঞ্জের সফি হোসেন খান ও গাজীউল হক।

www.pathagar.com

১১ই মার্চ এদের ত্যাগের পরীক্ষা, ঈমানের পরীক্ষা, নবলব্ধ চেতনার অগ্নিপরীক্ষা। এরা জয়ী হলো চারদিন সংগ্রামের পর।

একদিকে মুখামন্ত্রী নাজিমুদ্দিন। অন্যদিকে সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। নাজিমদ্দিন সরকার অংগীকার করলেন, বাংলাকে প্রদেশের সরকারী ভাষা করা হবে এবং দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য সরকার সুপারিশ করবেন কেন্দ্রের নিকট।

লিয়াকত আলীর পর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে ফজলুর রহমান ভিন্ন পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলেনঃ বাংলা ভাষা লেখা হবে আরবী হরফে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা তো দূরের কথা, বাংলাকে আর বাংলাই রাখা হবে না। মাথা কেটে মাথা ব্যথা দূর করে দাও- ফজলুর রহমানের সহজ বুদ্ধি (?) অতি সহজেই ছাত্র-জনতার নিকট বোধগম্য হলো। আবার প্রতিরোধ। আবার তাদের পশ্চাদপসরণ।

আরবী হরফে বাংলার প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে অসন্তোষ তখনও স্তিমিত হয়নি। ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের অধিবেশন। ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫২। সভাপতির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ আর ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী মাঝখানে কয়েকটি বিশ্বাসঘাতক বছর আর খাজা নাজিমুদ্দিন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের সংগ্রামের কথা স্মরণ করলো। আর স্মরণ করলো ১৫ই মার্চের চুক্তিপত্র ও লংঘন। স্মরণ করল লিয়াকত-রিপোর্ট, ফজলুর রহমান ভাষা সংস্কার প্রচেষ্টা।

পাঁচটি বছর যেন বৃথা চলে গেছে। এতো প্রতিবাদ, এমন দাবি, কোনও ফল নেই? প্রত্যয় দৃঢ়তর হয় ছাত্র সমাজের আবার আন্দোলন। অধিকার হরণকারীর বিরুদ্ধে মরণপণ প্রতিরোধ।

মাত্র চারদিনের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক প্রতিবাদ ধর্মঘটের আয়োজন করে, পুরাতন সংগ্রাম পরিষদকে সক্রিয় করে তোলে এবং ব্যাপক ভিত্তিতে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠনের জন্য সর্বদলীয় সম্মেলন আহবান করে।

৩০শে জানুয়ারী ছাত্ররা ক্লাসে যোগদানে বিরত থাকে। বিকালে ডিষ্টিক্ট বার লাইব্রেরী হলে জনাব আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলন পরিচালনার জন্য সভায় একটি কমিটি গঠিত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ, যুবলীগ, খেলাফতে রব্বানী, ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি এ কমিটিতে নেয়া হয়। কাজী গোলাম মাহবুব কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। তাছাড়া এ কমিটিতে ছিলেনঃ জনাব আবুল হাশিম, আতাউর রহমান খান, কমরুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবদুল মতিন ও খালেক নেওয়াজ খান প্রমুখ। শেখ মুজিবুর রহমান তখন জেলে ছিলেন। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাস থেকে তিনি জেল খাটছিলেন। এই কমিটি প্রথম সভাতেই স্থির করে, সভা-শোভাযাত্রা ও হরতালের মাধ্যমে সারা প্রদেশে ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে।

এ দিবসের কর্মসূচী সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মঘট পালন, শোভাযাত্রা ও ছাত্র-জনতার মিলিত সভা

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। অর্থ সংগ্রহের জন্য ছাত্ররা ১১ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী পতাকা দিবস ঘোষণা করে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচী বিপুল সাফল্যের সাথে পালন করা হলো। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ঢাকার রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শনে নেমে পড়ে। পুলিশ ঐ দিন কোন বাধা দেয়নি। সবকিছু শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা ভাসানী ছাত্র-জনতার মিলিত সভায় বক্তৃতা দেন। পতাকা দিবসও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হলো।

১৩ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান অবজার্ভারের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। অজুহাতটি ছিল ধর্মীয়। কিন্তু বুঝতে কারো অসুবিধা হয়নি সরকারের উদ্দেশ্যেঃ ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের শক্তিশালী একমাত্র প্রচার যন্ত্রকে ধ্বংস করতে হবে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করার সংগে সংগে সম্পাদক আবদুস সালামকেও গ্রেফতার করা হয়। (এ সময়ে 'সাপ্তাহিক' ইত্তেফাক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে)।

২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬ টায় ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হলো। ১৪৪ ধারা ঘোষণার সাথে সাথে সারা শহর উত্তেজনায় থম্ থম্ করতে লাগলো। ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হলগুলিতে জরুরী সভা হলো। বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে মিলিত হলো।

ইতিমধ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনা করার জন্য জনাব আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদও এক বৈঠকে মিলিত হলো। সভায় আলোচনা চলতে লাগলো। অধিকাংশ সদস্যই পরের দিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে মত দিলেন। একমাত্র যুবলীগ নেতা অলি আহাদ যে কোন পরিস্থিতিতে পূর্ব কর্মসূচী বহাল রাখার পক্ষে, অর্থাৎ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে মত দিলেন। ছাত্র প্রতিনিধিগণ তখন ছাত্রীবাসের সভাগুলিতে ব্যস্ত। অন্যরা বললেন "আমরা যদি ১৪৪ ধারা ভংগ করি তাহলে দেশে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে সরকার জরুরী অবস্থার অজুহাতে সাধারণ নির্বাচন বন্ধ করে দিতে পারে। আমরা সরকারকে সে সুযোগ দিতে চাই না।'

কমিটির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নির্বাচন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় বড়ো করে দেখেছেন। কিন্তু সভা শেষ হওয়ার আগেই 'বিক্ষুব্ধ তরুণ সমাজের' মনোভাব জানাতে এলো ছাত্র প্রতিনিধিবৃন্দ। ছাত্রগণ আগামীকাল ১৪৪ ধারা ভংগ করবে, এটা ছাত্রদের সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত। এ সম্পর্কে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১২টা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

ছাত্ররা এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় সর্বদলীয় পরিষদের রাজনৈতিক দলভুক্ত সদস্যগণ বিক্ষুব্ধ হন। কমিটি সিদ্ধান্ত করলেন কমিটির পক্ষ থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভংগ না করার যৌক্তিকতা বুঝাতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু যদি ছাত্ররা তা মেনে না নেয়, তবে এ সর্বদলীয় কমিটি তখন থেকেই বিলুপ্ত হবে।

২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্ররা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে 'বেলতলায়' মিলিত হন। তখন ইদানীং কালের সর্বজনবিশ্রুত 'আমতলার' খ্যাতি ছিল না। এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ছাত্র-জনতা অতঃপর আমতলায় সমবেত হলো। গাজিউল হক সে মহতী সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ছাত্ররা শামসুল হকের বক্তব্য শুনলো, কিন্তু তারা সর্বদলীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মানতে রাজি হল না। তারা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শোভাযাত্রা বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

www.pathagar.com

করল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটের সামনে কড়া পুলিশ পাহারা।

এ সময়ে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের আবদুস সামাদ একটি আপোষ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, ছাত্ররা দশজন দশজন করে বের হবে। এটা এক ধরনের সত্যাগ্রহ। প্রস্তাবটির অর্থ হলো এই যে, এতে একদিকে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করা হবে, অপর দিকে ব্যাপক আকারের গোলযোগ এড়ানো সম্ভবপর হবে।

ছাত্ররা এ প্রস্তাব মেনে নিল শেষ পর্যন্ত। দশজন করে ছাত্র বের হতে লাগলো আর পুলিশ তাদের গ্রেফতার করতে লাগল। এইরূপ পরিস্থিতিতেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। কাঁদুনে গ্যাসের এক একটি শেল ছাত্রদের উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দিল। এরপর পুলিশ বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ পর নিরস্ত্র ছাত্র আর সশস্ত্র পুলিশের এ খণ্ড যুদ্ধের স্থান বদলে গেল। মেডিকেল কলেজ গেট, মেডিকেল কলেজ হোস্টেল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোষ্টেল ও তার চারদিকের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল সংঘর্ষ। এসব স্থানে বেপরোয়া লাঠি চার্জের ফলে বহু ছাত্র আহত হলো।

বেলা তিনটা থেকে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন। বাইরে সদস্যদের নিকট ছাত্ররা পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদ জানানোর এই সময়। আনুমানিক বেলা ৩টার সময় পুলিশ মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে গুলী চালায়। গুলীতে জব্বার আর রফিক উদ্দিন প্রাণ দেয়। এদের মধ্যে একজন ছিল নিকটবর্তী একটি হোস্টেলের 'বয়'।

এরপর ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক মোড় দেয়। এম.এ [রাষ্ট্র বিজ্ঞান] ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র আবুল বরকত মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলের এক নম্বর শেডের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল প্রথম গুলীর আওয়াজ শুনে। বুলেট তার উরুদেশ বিদ্ধ করে। প্রচুর রক্তপাতের পর রাত আটটায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর প্রাণ বিয়োগ হয়।

বরকত আর অন্যান্য শহীদদের মৃত্যুর খবর দাবাগ্নির মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে পরিষদ ভবনেও বাইরের ঢেউ লাগে। উত্তেজিত পরিষদে খয়রাত হোসেনের মুলতবী প্রস্তাব সমর্থন করেন সরকার পক্ষীয় সদস্য মওলানা তর্কবাগীশ ও আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন সাহেব।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন নির্লজ্জভাবে পুলিশের গুলী চালনা সমর্থন করেন। ফলে মওলানা তর্কবাগীশ ও আবুল কালাম শামসুদ্দিন তৎক্ষণাৎ মুসলিম লীগ পার্টি থেকে পদত্যাগ করে খয়রাত হোসেনসহ পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। শামসুদ্দিন সাহেব পরদিন পরিষদ সদস্যপদেও ইস্তফা দেন।

ওদিকে বিক্ষুব্ধ ঢাকা নগরী ভেংগে পড়ে শোকে। হাজার হাজার মানুষ চলে ঢাকা মেডিকেল কলেজের দিকে। সারা বিকাল, সারারাত জনস্রোতের আর বিরাম নেই। শোকাভিভূত জনতা শ্রদ্ধা জানায় শহীদদের প্রতি। মেডিকেল কলেজ নয়, যেনো তীর্থস্থান।

২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র সভার পর সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ আর মিলিত হতে পারেনি। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাই তখন আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকে। তারা হোস্টেলে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করে এবং সম্ভাব্য পুলিশী হামলার বিরুদ্ধে কড়া পাহারা দিতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলিতেও কন্ট্রোল রুম স্থাপিত হয় এবং বিভিন্ন ছাত্রাবাসের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়।

www.pathagar.com

২২ ফেব্রুয়ারি সকাল বেলায় শহীদদের গায়েবী জানাজায় শরিক হয় কয়েক লাখ লোক। এত বড় বিরাট জন সমাবেশ ঢাকায় আর কেউ কখনো দেখেনি। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেল প্রাংগণ থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত তিল ধারণের স্থান ছিল না। নাগরিক জীবন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। জানাজার পর উপস্থিত আবাল বৃদ্ধ-বণিতা এক বিরাট শোভাযাত্রায় সামিল হয়। পুলিশ শোভা-যাত্রায় বাধা দেয় এবং হাইকোর্টের সামনে আবারও গুলী চালায়। ফলে শফিকুর রহমান নামে জনৈক সরকারী কর্মচারী ও আইন ক্লাসের ছাত্র নিহত হয়।

এদিকে সদরঘাট এলাকায় দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। সেদিনকার মর্নিং নিউজে এমর্মে এক খবর ছাপা হয় যে, ভারতীয় দালাল আর হিন্দুরা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্যে এ আন্দোলন চালাচ্ছে। শোভাযাত্রা সহকারে সদরঘাট এলাকা থেকে আগত জনতা এ খবরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তারা মর্নিং নিউজে আগুন লাগিয়ে দেয়। তৎকালীন মুসলিম লীগ পত্রিকা সংবাদ আন্দোলন বিরোধী ভূমিকা ছিল। উক্ত শোভাযাত্রা নবাবপুরে পৌছলে পুলিশ গুলীবর্ষণ করে। তাতে একজন রিকশাওয়ালা নিহত হয়।

ঐদিন রেলওয়ে কর্মচারীরা ও রেল ওয়ার্কশপের শ্রমিকেরা কাজে যোগ দেয়নি। ঢাকা রেল স্টেশনে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীরাও অফিস থেকে বেরিয়ে এসে শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে।

বিকাল ৩টায় পরিষদের অধিবেশন বসে। কিন্তু সরকারী দল সম্পূর্ণ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। অতঃপর বাংলাকে পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার সুপারিশ করে এক প্রস্তাব পাস করা হয়।

এসব সত্ত্বেও মেডিকেলের ছাত্ররা বরকত যেখানে খুন হয়েছিল সেখানে রাতারাতি (একুশে ফেব্রুয়ারির রাতে) একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করে। ২২ ফেব্রুয়ারি ভোরে শহীদ শফীকুর রহমানের পিতা সে শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন। যারা মাতৃভাষাকে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি মূল্যবান বলে মনে করেছিল তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে হাজার হাজার লোক শহীদ মিনারে সমবেত হতে লাগল।

একই দিন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ আবার মিলিত হলো এবং ২৫ ফেব্রুয়ারী প্রতিবাদ দিবস হিসাবে ঘোষণা করল। শহরে সাধারণ ধর্মঘট প্রধান কর্মসূচী বলে ঘোষণায় নির্দেশ দেয়া হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ও শহরের মহিলা সমাজ এক বাক্যে পুলিশের গুলী চালনার তীব্র নিন্দা করলেন।

ইতিমধ্যে পুলিশ নিরাপত্তা আইনে আবুল হাশিম, খয়রাত হোসন, মাওলানা তর্কবাগীশ, অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত গুহ, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক পুলিন দে ও গোবিন্দলাল ব্যানার্জি প্রমুখ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

মওলানা ভাসানী ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে যান। তাঁকে সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে ২২ ফেব্রুয়ারীই ছিল আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়। ২৩ ফেব্রুয়ারি শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয়। ইতিমধ্যে শহরের অবস্থা শান্ত হয়ে আসে। মাঝে পুলিশ মাত্র একবার নাজিরাবাজারে লাঠিচার্জ করেছিল। সাধারণতঃ আন্দোলনে ভাঁটা পড়লে গবর্ণমেন্ট তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে থাকে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ২৩ তারিখ থেকে

www.pathagar.com

সরকারী আক্রমণ নবোদ্যমে আরম্ভ হলো। প্রত্যেক হল থেকে মাইক কেড়ে নেয়া হলো ধর-পাকড়ও ব্যাপক।

২৪ ফেব্রুয়ারি পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের মূলতবী ঘোষণা করা হয়। পুলিশ ছাত্রাবাসগুলিতে হামলা চালায়। বহু সংখ্যক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয় এবং মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলের সামনের শহীদ মিনার ভেঙ্গে ফেলা হয়।

সরকারের এরূপ কার্যকলাপের ফলে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের এক বৈঠকে ৭ মার্চ প্রদেশব্যাপী শহীদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আতাউর রহমান খান পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।

২৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ছাত্রদের জোর পূর্বক হল থেকে বের করে দেয়া হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি যুব লীগের মোহামদ তোয়াহা ও অলি আহাদসহ বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। একই রাতে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন বেতারে ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় এজেন্ট ও নাশকতা কাজে লিপ্ত রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের তিনি সাফল্যের সাথে দমন করেছেন। শহরে ৫ মার্চের ধর্মঘট আংশিক মাত্র সাফল্য লাভ করে। শহরে ভাটা পড়লেও, জেলা শহরগুলিতে আন্দোলনের অভূতপূর্ব ঢেউ ওঠে। প্রদেশের দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে এ ঢেউয়ের কাঁপন লাগে।

এ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে দেখা যায়, প্রদেশে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সংগ্রাম পরিষদের জনৈক তরুণ সদস্যদের কাছে নূরুল আমীন পরাজয় বরণ করেন।

প্রকৃত বিচারে দেখতে গেলে, এ আন্দোলনের সাফল্যজনক ফলশ্রুত হলো ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র। কারণ এ শাসনতন্ত্রেই বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ প্রবীণদের এক অংশ এবং নব শক্তির বিরাট অগ্রগতির ফলে এ মহৎ কর্ম সম্পাদন সম্ভবপর হয়েছিল। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতির চাকা পিছিয়েও গেছে। কিন্তু কিভাবে এটা ঘটলো ? পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ সমাজকে এ প্রশ্নের যথাযথ সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসে নতুন করে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। জনাব অলি আহাদকে নতুন সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক নির্বাচিত করা হয়। এই পরিষদই পরবর্তী কয়েক দিবসের আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করে।

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে জনাব অলি আহাদের অভিভাষণ ॥

[২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৫০ সালে শিক্ষা সম্মেলনে অলি আহাদ সাহেব সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাঙ্গনের সংকটময় যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার গুরুত্ব এবং উপযোগিতা এখনও ফুরিয়ে যায়নি। সমস্যার নানা শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি পেয়ে আজ তা সংকটের মহীরুহে পরিণত হয়েছে।]

শিক্ষা ও জাতীয় স্বার্থরক্ষার্থে এই বাংলার ছাত্র ও তরুণেরা সাম্রাজ্যবাদী আমলের শুরু থেকেই অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। একদিকে অনেক মহাত্মার আত্মত্যাগ ও অক্লান্ত প্রচেষ্টা, অপরদিকে বহু তরুণ ও স্বদেশ প্রেমিকের আত্মবলি ও রক্তের ওপর গড়ে উঠেছে আমাদের জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ। জাতীয় শিক্ষার জন্য সেই সুপ্রাচীন সংগ্রাম আজও শেষ হয়নি, সেই লড়াইয়ের জের টেনে চলতে হচ্ছে। তাই প্রাদেশিক শিক্ষা সম্মেলনের প্রারম্ভেই আমি গণতান্ত্রিক শিক্ষার জন্য সেই গৌরবময় আন্দোলনের ঐতিহ্যকে স্মরণ করে পূর্বগামীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কি চেয়েছিল

সাম্রাজ্যবাদ এদেশের সহযোগীতা সমাজ-ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছে তার ঔপনিবেশিক শোষণের ঘাঁটি। তাই এদেশে শিক্ষার প্রসার সে কোনদিন চায় নি। তার প্রয়োজন ছিল এক সংকীর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থার মারফৎ কতিপয় শিক্ষিত আমলার সৃষ্টি করা-যারা এদেশে বৃটিশ শাসনের ভিত্তি দৃঢ়তর করবে। জনসাধারণকে অজ্ঞ রাখাই ছিল সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা-ব্যবস্থার গূঢ় উদ্দেশ্য-তাই সে এক অতি ব্যয়সাধ্য আমলাতান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করে জনগণকে শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার সব রকম ব্যবস্থাই করে রেখেছিল। যুদ্ধোত্তর "সারজেন্ট স্কীমে'র ধোঁকাবাজীও আজ কারো কাছে অস্পষ্ট নয়।

সাম্রাজ্যবাদ যা পারেনি

কিন্তু স্বদেশ প্রেমিক মহাত্মাদের বহু ত্যাগ ও অনেক চেষ্টার ফলে ইংরেজের চালু করা 'মেকলীয়' শিক্ষা পদ্ধতির মোড় ফিরতে লাগল।গ্রামে, শহরে, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষালয়ে জাতীয়তার বীজমন্ত্র ঢুকতে শুরু করল। সাম্রাজ্যবাদ অনেক চেষ্টা করল এই জাতীয়তার ভাব-ধারার বন্যা রুখতে। কিন্তু প্রবল স্বাধীনতা আন্দোলনের সামনে তাদের সব অপচেষ্টাই ভেস্তে গেল। সজাগ ছাত্র সমাজ ও জনসাধারণ বুকের রক্ত ঢেলে একটি একটি করে তাদের শিক্ষার দাবী আদায় করে নিতে লাগল; দিনে দিনে এও তারা বুঝলো যে, সত্যিকারের স্বাধীনতা না পেলে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না- সাম্রাজ্যবাদ কোন দিনই তা দেবে না। তাই দূর্বার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছাত্রসমাজ স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। '৪৬-এর ভিয়েৎনাম দিবস, রশীদ আলী দিবস তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য।

www.pathagar.com

'৪৭ -এর পরে

তারপর ঘোষিত হল আজাদী-ক্ষমতা হস্তান্তর হল '৪৭-এর ১৪ই আগষ্ট। জনসাধারণ ভাবল, ইপ্সিত পরিবর্তন এবার হবে। তাই সংগ্রামে ঢিলে দিয়ে তারা নির্ভর করে রইল নয়া সরকারের উপর।

ছাত্র ও জনসাধারণের এই অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে একটির পর একটি করে সাধারণের শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সাম্রাজ্যবাদ আড়ালে থেকে কেড়ে নিতে লাগল। এই ছুতো ঐ ছুতোর নামে জাতীয় শিক্ষার গোড়ায় সুপরিকল্পিত হামলার অধ্যায় শুরু হল।

শুরু হল নয়া রাষ্ট্রের পত্তনের নামে শিক্ষার খরচ কমানো। শুরু হল সরকারী অফিস ও উর্দ্ধতন অফিসারদের জন্য স্কুল কলেজ বিল্ডিং রিক্যুইজিশন। শুরু হল এক এক করে কায়েমী বা 'সাময়িকভাবে স্কুল কলেজের দ্বার বন্ধ করা।

অল্প বেতনের দায়ে অনন্যোপায় হয়ে অনেক শিক্ষাগত প্রাণ 'ভাল-মানুষ' শিক্ষকও শিক্ষকতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। একজন বোট অফিসার বা বর্ডার অফিসারের মাহিনাও তাদের থেকে দেড়গুণ দুগুণ বেশী। এ অবস্থায় শিক্ষকতা শুধু বিড়ম্বনা নয়, অসম্মানজনক হয়ে দাঁড়ায় না কি ? জাতির শিক্ষা স্পৃহার প্রতি একি বর্বর পরিহাস!

সরকারী স্কুল কলেজগুলির সংস্কারের প্রশ্ন তুলতেই সরকার তা ধামাচাপা দিতে একটি বড় ওজর তুলেছে-'শিক্ষক পাওয়া যায় না।' কিন্তু সঠিক খবর নিলে জানা যাবে যে, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল কলেজগুলি থেকে এ্যালাউন্স কেটে নেওয়া, নিয়ম মোতাবেক বর্ধিত বেতন মঞ্জুর না করা ইত্যাদি পরোক্ষ শিক্ষক ছাটাই নীতির চাপে, এমন কি সরাসরি চাকুরীতে জবাব পেয়ে বেকারত্ব বরণ করেছেন এমন শিক্ষকের সংখ্যা নগণ্য নয়। সরকারী স্কুল কলেজগুলিতে অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষককেও যতদিন খুশী অস্থায়ী পদবাচ্য করে রাখা হয়েছে ও হচ্ছে। অনেক সময় তিন চার মাস ধরে গরীব শিক্ষকদের মাইনে বাকী ফেলে রাখা হয়েছে। এই অবহেলার দরুণ সর্বত্র সরকারী বেসরকারী স্কুল কলেজগুলি ভেঙ্গে পড়তে লাগল। হিন্দু শিক্ষকগণ অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে চলে গেলেন। আর, শিক্ষিত মুসলিম যুবকেরা টাকাওয়ালা সিভিল সাপ্লাই বা অন্যান্য বিভাগ ছেড়ে শিক্ষার ঘানি ঘাড়ে পেতে নিয়ে অনাহার ডেকে আনতে চাইবে কেন?

এই ব্যাপক শিক্ষা বিরোধী অভিযান যে কারো মনে প্রশ্ন জাগায়নি, তা নয়। ১৯৪৮ সালের ২রা নভেম্বর দৈনিক ইত্তেহাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয় "পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই আজ চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। শিক্ষার মত একটি জরুরী বিষয় লইয়া পূর্ববঙ্গে যে হেলা খেলা চলিতেছে, তাহা শুধু আপত্তিকর নয়- অত্যন্ত মারাত্মক।"

একই প্রবন্ধে অন্যত্র লেখা হয় "শিক্ষা বিভাগের যাঁহারা কর্ণধার, তাঁহারা আজ পর্যন্ত শিক্ষা বিস্তারের একটা প্ল্যান তৈরী তো করলেনই না, উপরন্তু সাম্রাজ্যবাদী আমলের সেই ভাঙ্গাচোরা শিক্ষা ব্যবস্থাটাও ভাঙ্গিতে বসিয়াছেন।"

সংগ্রামের ভিতর দিয়ে আদায় করা সমস্ত অধিকারই আবার এক এক করে ছিনিয়ে নেওয়া হল। শুধু তাই নয়, এই সুযোগে এদেশের গণশিক্ষা ও জাতীয় স্বার্থের আন্দোলনের মহীরূহ সমূলে উৎপাটনের অভিসন্ধি নিয়ে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে মুছে ফেলবার চক্রান্ত আঁটা হল। তারই প্রথম ধাপ হিসাবে আক্রমণ এল বাংলা ভাষার উপর। চক্রান্ত করা

www.pathagar.com

হল ভবিষ্যতের বাঙগালীকে মুক করে দেবার-যাতে সে মুখ ফুটে শোষণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে না পারে, যাতে সে ভুলে যায় তার জাতীয় ও সামাজিক অস্তিত্বের মর্যাদা, ভুলে যায় তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার।

অনেক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐতিহ্যর উত্তরাধিকারী পূর্ব বাংলার বলিষ্ঠ ছাত্র সমাজ এ আক্রমণ চোখ বুজে বরদাস্ত করল না। যে ভাষা এদেশের লোকের আশা আকাংখা, ভাব ও ভাবনার ঐতিহাসিক পরিণতি ও ঐতিহ্যকে বহন করছে; যে ভাষায় বাংলার প্রতিটি শিশুর প্রথম বুলি ও প্রথম পাঠ শিক্ষার মাধ্যমে হিসাবে, সরকারী পরিভাষা হিসাবে "আজাদ বাংলা" কেন তাকে পাবে না? চারদিকে আওয়াজ উঠল- "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।" মিছিলের মুখে তথাকথিত গদিনশীন নেতাদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার জবাবদিহি তলব করা হল। সমগ্র প্রদেশ জুড়ে পূর্ব বাংলার বৃহত্তম ছাত্র ও গণ-আন্দোলন গড়ে উঠল। কালাকানুন এখানে প্রাদেশিক সরকারের একটি গোপনীয় সার্কুলারের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চাই।

স্পষ্টতঃই এই কালা নির্দেশের ভিত্তিতে ছাত্রদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা সরকার ও শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ যথেচ্ছ চালিয়ে যেতে কসুর করেন নি। শিক্ষকদের স্বাধীন গতিবিধির তো প্রশ্নই উঠে না। কেউ তার ন্যায়সঙ্গত দাবী দাওয়া পেশ করলেই তাকে রাষ্ট্রের শত্রু, ইসলামের শত্রু আখ্যা দিয়ে দমননীতির প্রকোপে ফেলে দেওয়া হয়। এই কালা কানুনের প্রকাশ্য ও গোপন প্রকোপে জরিমানা, বহিষ্কার ও গ্রেফতারের ঝড় বয়ে গেছে ছাত্র সামাজের বুকের ওপর দিয়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বগুড়ার অধ্যাপক গোলাম রসুল সাহেব, গাইবান্ধা ও নড়াইলের কয়েকজন শিক্ষকের বহিষ্কার, মেডিকেল কলেজের জনৈক ছাত্রের বহিষ্কার, বিশিষ্ট ছাত্রকর্মীদের কারাবাসের ইতিহাস কারও অজানা নয়। এ ছাড়া কথায় কথায় স্কুল কলেজে পুলিশ পিকেট বসিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কয়েদখানায় পরিণত করা হয়েছে। তবু ছাত্র আন্দোলন দমেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবেতনভূক্ত কর্মচারীদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল ঐতিহাসিক বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন-দমননীতি ও ছাত্র বহিস্কারের বিরুদ্ধে। তার পরে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে নয়া চক্রান্ত পাকানো হল- আরবী হরফে বাংলা লেখার চক্রান্ত। ঢাকা ও মফঃস্বলের ছাত্রদের ধ্বনি চক্রান্তকারীদের হকচকিয়ে দিয়েছিল। তারপর এল সর্বশেষ ব্যাপক আক্রমণ স্কুল-কলেজে বেতন বৃদ্ধি। এর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নেতৃত্বে সক্রিয় প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই আজ আমরা এই শিক্ষা সম্মেলনের দ্বারে এসে পৌছেছি।

(ক) স্কুল কলেজ বিল্ডিং রিকুইজিশন

একমাত্র ঢাকাতেইঃ ইডেন কলেজ-এখন সেক্রেটারিয়েট, কলেজিয়েট স্কুল, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, জগন্নাথ হল- এসেমব্লি হাউস, ইডেন গার্লস স্কুল ও কামরুন্নেসা কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া নবকুমার হাইস্কুল, নারী শিক্ষা মন্দির, প্রিয়নাথ হাই স্কুল, সলিমুল্লাহ কলেজ, আর্মানীটোলা গার্লস স্কুল' ও জগন্নাথ কলেজ অনেক বার রিকুইজিশন করে মাসাধিককাল বন্ধ রাখা হয়।

সিলেটঃ সরকারী মহিলা কলেজ, সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা, মুরারীচাঁদ কলেজ হোষ্টেল এবং আরো কয়েকটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হুকুম দখল করা হয়।

www.pathagar.com

১৯৮৪ সালে জননেতা অলি আহাদের সংবর্ধণা সভায় প্রতিবেদন সম্পাদক মশিউর রহমান, ফারুক আহ্‌মেদ ভুইয়া, এডভোকেট সিদ্দিকুর রহমান, মাওলানা আশরাফ আলী (ধর মন্ডলী), এডভোকেট এম এ করিম, আনোয়ার হোসেন, যুবনেতা শিশু মিয়া, শেখ মোঃ আবু তাহের, কাজী রফিক প্রমুখ।

২২শে নভেম্বর'৯৫ ঢাকা আটো রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের মাহাবুব আলী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় ভাষনরত জননেতা অলি আহাদ। বাদিক থেকে মঞ্চে বসে আছেন সংগঠনের কেশিয়ার নুরুদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ গোলাম ফারুক, ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আজিজুল হক মুক্ত, ইউনিয়নের আইন উপদেষ্টা এডভোকেট মাহবুবুল হক, সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফজলুর রহমান খাঁ, ইউনিয়নের উপদেষ্টা মুন্সি আবদুল মজিদ। পেছনের সারিতে; খোকন চন্দ্র দাস, আব্দুল হামিদ, মফিজুর রহমান, আবুল হাসেম, মজিবুর রহমান মাষ্টার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

www.pathagar.com

চট্টগ্রামঃ রাজশাহী ও অন্যান্য জেলাতেও নির্বিচারে অনুরূপ হুকুম দখলের মহড়া চলেছে। এই যথেচ্ছ হুকুমদখলের বিরুদ্ধে ছাত্র প্রতিরোধের নজীর হিসাবে অল্পদিন পূর্বে সিলেটের ছাত্র-ছাত্রীর সার্থক "হুকুম দখল প্রতিবাদ ও মেয়ে কলেজ' আন্দোলন, ঢাকায় কামরুননেসা স্কুলের ছাত্রীদের আন্দোলন, ও কুষ্টিয়ার হোষ্টেল আন্দোলনের উল্লেখ করা যেতে পারে।

সিলেটেঃ সরকারী মহিলা কলেজ, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল এবং ময়মনসিংহের ভটপুরা ও অন্যান্য কয়েকটি বিদ্যালয় আজও মিলিটারীর কবলে। এমনি করেই মিলিটারীর খাতিরে শিক্ষাকে বলি দেওয়া হচ্ছে।

কতকগুলো ভাঙ্গা চোরা বাড়ীতে ঢাকা কলেজের প্রাণপ্রদীপ মিট মিট করে জ্বলছে। গত '৪৮ সনের নবেম্বরে উক্ত কলেজের ছাত্রদের অনশন ধর্মঘট ও প্রবল অন্দোলনের চাপে সরকার অবিলম্বে উপযুক্ত স্থানে উক্ত কলেজ স্থানান্তরিত করার প্রতিশ্রুতি দেন। আর্টস স্কুলের ছাত্ররা স্কুল বিল্ডিং-এর সংস্কার বা স্থান পরিবর্তনের জন্য বহুদিন ধরে আবেদন নিবেদন করে আসছে। প্রত্যুত্তরে এসব প্রশ্নতো ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছেই উপরন্তু ইস্পাহানীর জন্য ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল বিল্ডিং হুকুম-দখলের নির্লজ্জ প্রস্তাব তোলা হচ্ছে।

(খ) প্রাইমারী স্কুল ও প্রাইমারী শিক্ষক

অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী মোয়াজ্জেম উদ্দিন সাহেব 'অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার' আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত কয়েকটি অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার একটি বিল রচনা করেন। দেশ বিভাগের পর সেই পরীক্ষামূলক বিলটিকেও ধামাচাপা দিয়ে নতুন স্কীমের নামে চালানো হল প্রাথমিক শিক্ষার বিরুদ্ধে এক নির্লজ্জ অভিযান।

১৯৪৮-এর ১৫ই অক্টোবর পাবনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক মওলবী আহমদ হোসেন বিটি সাহেবের বিবৃতি থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছিঃ নূতন স্কীম চিজটি কি তাহা খুলিয়া বলিলেই থলি হইতে বিড়াল বাহির হইয়া পড়িতঃ আসলে ডি পি আই-এর নির্দেশ ছিল যে, ১৯৪১ সালে 'আদম শুমারীর হিসাব মত প্রতি দুই হাজার লোকের জন্য একটি স্কুল রাখিয়া বাকী স্কুল উঠাইয়া দিতে হইবে। এই হিসাব মত সিরাজগঞ্জ মহকুমায় মোট স্কুলের সংখ্যা থাকিবে ৪৯৩। বর্তমানে স্কুল বোর্ড পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা ৬৪১। ইহার পর সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল' বালিকা স্কুল, এম, স্কুল এবং মাদ্রাসা সংলগ্ন প্রাইমারী বিভাগের সংখ্যা মোটামুটি ১৩৭। সুতরাং সরকারী নির্দেশ মত ২৭৫টি স্কুল তুলিয়া দিতে হইবে।

মোটামুটি উপরোক্ত স্কীমের দৌলতে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ প্রাথমিক স্কুল তুলে দেয়া হয়। একমাত্র নাটোর চট্টগ্রামেই অবলুপ্ত প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ৮৪৪। আর রাজশাহীতে একমাত্র নাটোর জেলায় ৪০০।

উপরোক্ত হিসাব থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কত হাজার প্রাইমারী শিক্ষক বেকার হয়ে পথে দাঁড়াল। অপরদিকে প্রাইমারী শিক্ষকের বেতনের হার তৃতীয় শিক্ষক-মাসিক ১৯১১ টাকা, দ্বিতীয় শিক্ষক মাসিক ২৭ টাকা, প্রথম শিক্ষক মাসিক ২৯ টাকা। প্রাইমারী শিক্ষকদের সরকারের এই চূড়ান্ত অবহেলার প্রত্যক্ষ ফল চট্টগ্রামের ঈদগাঁও স্কুলের শিক্ষক নাজিমুদ্দিনের অনাহারে হাসপাতালে মৃত্যু। মৃত্যু কালে তার ৩ মাসের মাহিনা বাকি ছিল। ঐ জিলাতেই আরো ৪ জন প্রাথমিক শিক্ষকের মৃত্যু ২ জনের আত্মহত্যা। গো মাধ্যমিক বোর্ড- ঢাকায় ৪ জন প্রাথমিক শিক্ষক রিক্সা চালকের কাজ করে।

সাধারণভাবে মাধ্যমিক শিক্ষকদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে কিছুদিন আগে 'ইনসাফ'

www.pathagar.com

পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক ব্যক্তির লিখিত চিঠির উদ্ধৃতি দেওয়া গেল।

'দেশ বিভাগের পরে যাহারা সরকারী স্কুলে নিযুক্ত হইলেন তাহাদের সকলেই এবং সমগ্র শিক্ষক সংখ্যায় নূন্যধিক এক চতুর্থাংশ শিক্ষক গত তিন বৎসর যাবৎ অস্থায়ীভাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন। ইহাদের কেহ কেহ আবার বিভাগ পূর্ব সময় হইতেই চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন। দেশ বিভাগের পর আজ তিন বৎসর সময়, তবু তাহারা বিভাগীয় তালিকাভুক্ত হয় নাই। ইহাদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। শতাধিকের কম হইবে না একথা এক রকম নিশ্চয় করিয়াই বলা চলে। এপর্যন্ত বিভাগীয় তালিকায় ইহাদের নাম উঠিল না- এ কেমন কথা। সরকারী নিয়ম মোতাবেক এর ভিতরে ইহাদের চাকুরী পাকা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু পাকা হওয়াতো দূরের কথা; ইহারা যে চাকুরী করিতেছেন এবং একটা সঙ্গীন মুহূর্তে সরকারের প্রয়োজনে ইহারা যে সাড়া দিয়াছেন তাহারও একটা নিশানা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ইহা নিশ্চয়ই বিস্ময়জনক অবস্থা যাহার কথা ভাবিয়া অনেক শিক্ষকই হয়ত হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।"

গত তিন বছরের প্রবেশিকা ও আই এ পরীক্ষায় পাশের হার ক্রম হ্রাসমান, স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা হ্রাস ইত্যাদি মাধ্যমিক শিক্ষার চরম দুর্গতির প্রত্যক্ষ নজীর।

এ অবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষাকেও নূতন সিলেবাস প্রবর্তনের নেশায় ইসলামী শিক্ষার ধূয়া তুলে যা চালু করছেন তা ভীতিপ্রদ, স্কুলে ছাত্রদের মাথায় চারটি ভাষা শেখার বোঝা চাপানো হয়েছে, উর্দুকে বাধ্যতামূলক করে; পাঠ্য পুস্তক প্রবর্তন নিয়ে শিক্ষাবোর্ডের কর্তৃপক্ষের সংশিষ্ট ব্যক্তিরা রীতিমত ব্যাখ্যা শুরু করে দিয়েছেন। সত্যিকারের শিক্ষণীয় অনেক বইই নয়া পাকিস্তানী শিক্ষার নামে অনেক সময় ব্যক্তিগত বা দলগত ব্যবসার খাতিরে বাতিল করে দিয়ে বাজে বই বাজারে চালু করা হচ্ছে।

সিলেবাসের বোঝা সম্পর্কে নীচের উদ্ধৃতিটি যথেষ্ট। "সিলেকসন বোর্ডের বিবেচনা শূন্য সিলেবাস মনোনয়নের ফলে আগামী ৫১ সনের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের পাশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেন না, উর্দূ সিলেবাসে নয়টি গদ্য তেরটি পদ্য, ষাটটি হেকায়েত ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এত বড় কোর্স মাত্র দুই বৎসরে শেষ করা অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষেই অসম্ভব।"

"দ্বিতীয়তঃ ইংরাজী ফার্স্ট পেপারের ম্যান-ইটার্স অব কুমাউন নামক যে পুস্তকটি রহিয়াছে, উহার ভাষা এবং বিষয়বস্তু বি এ ষ্টান্ডার্ড এর চাইতেও কঠিন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যথেষ্ট অত্যাচার করা সত্ত্বেও ছাত্রবৃন্দ যে উহা হজম করিয়া খাতার পাতায় দু'কলম চালাইয়া পাশের হার বাড়াইবে, তেমনি আশা স্বর্গের সিঁড়ির মতই অসম্ভব বলা চলে। অথচ পাশের হার কমিতে থাকিলে ছাত্র ও অভিভাবক মহলে যে নৈরাশ্য জাগিবে সম্প্রতি উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, এই কারণে দিন দিন বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যাইতেছে।"

(২০শে আগষ্টের 'ইনসাফে' প্রকাশিত জনৈক ছাত্রের চিঠির একাংশ)

সকল ব্যাপারেই মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের অব্যবস্থা চরমে উঠেছে। পরীক্ষক নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষার ফল প্রকাশে অবহেলা ও দীর্ঘ সূত্রতার অভিযোগ প্রতিদিনকার সংবাদপত্রের "চিঠিপত্রের স্তম্ভ" খুঁজলেই মেলে। গত তিন বছর ধরে ম্যাট্রিক ও ইন্টার-মিডিয়েট পরীক্ষার ফলাফল বের হতে প্রতিবারই সেপ্টেম্বর পেরিয়ে যাচ্ছে-অর্থাৎ প্রায় পুরো একটা শিক্ষা বৎসর ক্ষতি-হচ্ছে। তাছাড়া বোর্ডের কর্মকর্তাদের দুর্নীতির অনেক তথ্যই আজকাল প্রকাশ হয়ে

www.pathagar.com

পড়েছে। সরকারী শিক্ষাপদ্ধতির অব্যবস্থা ও ঔদাসীন্যের ফলে গত কয়েক বছরে পাশের হারের অধোগতি নিম্নরূপ দাঁড়িয়েছে।

১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিক পাশের শতকরা হার ৭৩। ১৯৪৮ সালে ৫৯। ১৯৪৯ সালে ৩৫। এবার শোনা যাচ্ছে শতকরা ২০ থেকে নেমে ২৫ নাকি পাশ করতে পারে। এই অগণিত হতভাগ্য যুবকদের সামনে এক মাত্র ভবিষ্যৎ হিসেবে খোলা রাখা হয়েছে আনসার-বাহিনী, পিএনজিএ, আর পি ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধের বাহিনীতে যোগদানের পথ তাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সঙ্কুল। এমনি করে পূর্ববঙ্গের তরুণদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধে এদের কামানের খোরাক হিসেবে ব্যবহার করার এ এক সুস্পষ্ট পরিকল্পনা

কারিগরী শিক্ষা

বিভিন্ন স্কুল কলেজের লেবরেটরীর অবস্থা সঙ্গীন। বার্ণারের গ্যাস, এসিড ও অন্যান্য মাল মসলার অভাবে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের হাতেকলমে কিছু দেখা যা শেখার কাজ প্রায় কিছুই হচ্ছে না বললে অত্যুক্তি হবে না।

গত বছর কয়লার অভাবে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগারের কাজ মাসাধিককাল বন্ধ থাকে। মেডিক্যাল শিক্ষার ক্রমবর্ধমান তাগিদকে সরকার চোখ বুজে উপেক্ষা করে যাচ্ছে। গত সেশনে মিটফোর্ডে মেডিক্যাল শিক্ষাপ্রার্থী ১২০০ দরখাস্তের ভেতর মাত্র পৌনে দুশকে অনুমোদন করা হয়। আর মেডিক্যাল কলেজে ৭৫০ খানা দরখাস্তের ভেতর ১২৫ জন ছাত্রকে ভর্তি করা হয়।

এদের ভিতরও আবার কারিকুলাম সিষ্টেম, অটোমেশন সিষ্টেম ইত্যাদির দৌলতে কাটছাট হয়ে বাৎসরিক ৪/৫ জনের বেশী ছাত্র ডাক্তারী ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু এ ডিগ্রিকেও সরকারী স্বীকৃতি না দেওয়ার ফলে বিদেশে উচ্চতর মেডিক্যাল শিক্ষা বা সরকারী চাকুরীর সম্ভাবনা এদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ঢাকাতে মেডিক্যাল শিক্ষার তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুটিই মেডিক্যাল কলেজ ও ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল- অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান। সরকারী মিটফোর্ড স্কুলের এল এম এফ ডিগ্রি অনুমোদিত কিন্তু সংক্ষিপ্ত এম বি কোর্সের প্রবর্তন না করার ফলে ঐ স্কুলের ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার পথে বিরাট বাধা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে।

কুমিল্লাতে সরকারী মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য বহুদিন ধরে আবেদন নিবেদন চলছে। সম্প্রতি তথাকার দুইটি বেসরকারী মেডিক্যাল স্কুল একত্র করে একটা করা হয়েছে- কিন্তু তার জন্যও কোন সরকারী সাহায্য বা সহানুভূতি পাওয়া যাচ্ছে না।

ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ একদিন সারা ভারতের প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম ছিল। আজ তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশৃঙ্খলা ও স্বৈরাচারে জর্জরিত। শিবপুর হতে প্রত্যাগত ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্রদের এখানে পড়া ও পরীক্ষার সুবন্দোবস্তের অভাব পীড়াদায়ক। ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলে অপর দিকে সংক্ষিপ্ত বি ই কোর্স পড়ার কোন ব্যবস্থা নাই।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্দশা অকথ্য। বেয়ারা, শিক্ষক, লাইব্রেরীয়ান, কেরাণী ইত্যাদির অভাব লেগেই আছে। পলিটিক্যাল সায়েন্সের অধিকাংশ শিক্ষক এবার পি এ এস এ চলে যাচ্ছেন। বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর দুর্যোগ এক স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেকেন্ড ইয়ারের অনার্স প্র্যাকটিক্যাল ফিজিক্সের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। সায়েন্স বিল্ডিং-এ যথেষ্ট সংখ্যক রুম না থাকার ফলে অনেক সময়েই ক্লাস করতে গিয়ে বিরত হতে হয়।

www.pathagar.com

লাইব্রেরীতে আধুনিক প্রকাশিত মূল্যবান পুস্তকের একান্ত অভাব। দু এক কপি 'শো' পুস্তক কদাচিত ছাত্ররা পড়বার সুযোগ পায়। লাইব্রেরী সংক্রান্ত অভিযোগ কমিয়ে বললেও স্থান সংকুলান হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় বাজেটে ১৯৪৭ সাল থেকে প্রতি বছর মঞ্জুরীকৃত সরকারী বরাদ্দের হার নিম্নে দেওয়া হইলঃ

সেশন	১৯৪৭-৪৮	৮৮৭০০০/-
	১৯৪৮-৪৯	৭৩৬৪০০/-
	১৯৪৯-৫০	৭০৭০০০/-

উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী ১৯৫০-৫১ সেশনের যে প্রাপ্য বরাদ্দ ছিল তা থেকেও এক লাখ টাকা কেটে রাখা হয়েছে।

কেন্দ্রের "বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য তহবিল' থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্য সাড়ে দশ লাখ টাকা 'শর্তাধীন সাহায্যের'ধূয়া তুলে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ও-দিকে বিনা শর্তে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে সাড়ে দশ লাখ টাকার ভেতর হতে সাত লাখ টাকা সাহায্য (বাকী অংশ সম্ভবতঃ শর্তাধনি রাখা হয়েছে।)

পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার উপর এই বিশেষ রাজ-রোষ কেন ? কারণ কাঁচামাল উৎপাদনের উপনিবেশিক শোষণের ঘাটি হিসাবে পূর্ববঙ্গকে সাম্রাজ্যবাদ এখনও ব্যবহার করছে, আর সেই লুটের বখরাদারী করছে ইস্পাহনী প্রমুখ পাঞ্জাবী, সিন্ধী বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠি। তাই এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেবার প্রয়াস -যাতে এখানে জাতীয় শিল্প গড়ে তোলার চেতনা ও সংগ্রাম দানা বেধে না উঠতে পারে।

মোহাজের ছাত্র সমস্যা

মোহাজের ছাত্রদের অভাব অভিযোগের অনেক খবর দৈনিক সংবাদপত্রগুলির চিঠিপত্রের স্তম্ভে চোখ বুলালেই চোখে পড়ে। মোহাজের ফান্ডে টাকা তোলার এত আড়ম্বর দেখানো হচ্ছে অথচ মোহাজের ছাত্রদের থাকা ও পড়া ও উপযুক্ত বৃত্তির কোন সুবন্দোবস্তই করা হয়নি।

পরীক্ষার্থী মোহাজেরদের সার্টিফিকেট ইত্যাদির ধূয়া তুলে বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে অস্বীকার করে পরীক্ষা দেওয়া অসম্ভব করে তোলা হচ্ছে।

গত বছর পুরাপুরি পরীক্ষার ফী না দিলে কোন মোহাজের ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয় নি-পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ হঠাৎ বদান্য হয়ে উঠলেন এবং জমা দেয়া পরীক্ষার ফী রি-ফান্ড দেয়া হল। এতে যারা টাকার অভাবে পরীক্ষা দিতে পারছিল না তাদের সুবিধাটা কি হোল? এবারও পরীক্ষার ফী প্রাক্তন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট ছাড়া মোহাজের ছাত্রদের পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে না।

(ছ) নারী শিক্ষার অবরোধ

নারী শিক্ষার প্রসার তো দূরের কথা, প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি মেয়ে স্কুল, কলেজ তুলে দেওয়া হয়েছে। বরিশালের একমাত্র মেয়ে হোস্টেল উঠে যাওয়ায় গ্রামের মেয়েদের শহরে থেকে পড়াশুনা করার উপায় নেই। সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র দুটি মেয়ে কলেজ অবশিষ্ট। তার মধ্যে সিলেটের কলেজটিকে সম্প্রতি তুলে দিয়েছিল, কিন্তু প্রবল

www.pathagar.com

গণবিক্ষোভের চাপে শেষ পর্যন্ত সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করার ফলে কলেজটি অব্যাহত থাকে। ওদিকে মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষার পথ বন্ধ করতে জগন্নাথ কলেজে মেয়েদের বিজ্ঞান বিভাগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

(জ) ছাত্রাবাস সমস্যা

ছাত্রাবাস সমস্যা সার্বজনীন। পাইকারী ভাবে যে সমস্ত ব্যারাক তৈরী হয়েছে তারও সিট রেন্ট করা হয়েছে ৫" টাকা বা ততোধিক। এছাড়া নানা প্রকার আনুসঙ্গিক ফী-এর উপসর্গ তো আছেই। এক রুমে ৬/৭ জন করে থাকে। আর মেডিকেল কলেজের অনেক ছাত্রই মাথা গুজবার স্থানের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে মাথা খুড়ছে।

অপরদিকে ইস্পাহানী প্রমুখ পুজিপতিদের বাড়ী রিকুইজিশন করে দিয়ে তোষামোদ বা লেহন করতে সরকারের নিরলস উদ্যম সকলের চোখে পড়ে। ১২ লক্ষ টাকা খরচ হয় বড় বড় আমলাদের জন্য বালাখানা তৈরী করতে, সরকারী টাকায় কম পড়েনা, মন্ত্রীদের ভ্রমণবিলাস মেটাতে পাবলিকের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের হিসাব দেখে কে?

(ঝ) বেতন বৃদ্ধি

সর্বাধুনিক ব্যাপক আক্রমণ হচ্ছে ছাত্রবেতনের বৃদ্ধি। অধিকাংশ অভিভাবকের আয়ের একটা বিরাট অংশ আসে কৃষি পণ্যদ্রব্য থেকে; কিন্তু ইস্পাহানির জুট বোর্ডের কৃপায় আজ সারা বাংলার পাট চাষী ভীষণ আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন। অপর দিকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম বেড়ে যাচ্ছে- এদেশে বৈদেশিক পুঁজি বাজার ফেঁপে উঠছে। ফলে অভিভাবকদের অবস্থা সঙ্গীন। ছাত্রজীবনের আর্থিক সংকটের প্রত্যক্ষ নজীর খবর কাগজের অফিসগুলোতে ঘুরলেই পাওয়া যায়। অনেক ছাত্র আজ খবরের কাগজে নাইট ডিইটি দিয়ে পড়াশুনোর খরচ চালাচ্ছে। কমার্স ও আর্টসের বিরাট সংখ্যক ছাত্র চাকুরী বা প্রাইভেট টিউসানী করে পড়ে। অনেক ছাত্র কাগজ ফেরী করে, অনেকে রাত্রে রিকশা চালায়।

এই যখন আজকের ছাত্রদের আর্থিক দশা তখন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য স্কুল, কলেজে শতকরা ২৫ জনের পড়া খতম, তা সহজেই অনুমেয়।

ভগ্নাদশা বেসরকারী স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘাটতির বোঝা পুরাবার দায়িত্ব নিজের ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ছাত্র ও অভিভাবকদের ঘাড়ে চাপাবার এক অভিনব পদ্ধতি। এতে তার একদিকে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হ্রাস ও অন্যদিকে শিক্ষা বাজেটের ব্যয় কমিয়ে মিলিটারী ও পুলিশ খাতে টাকা বাড়ানোর উভয়বিধ উদ্দেশ্য সফল হয়। এই বেতন বৃদ্ধির যাতাকলে পড়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে এমন বহু ছাত্রের খবর চারদিক থেকে ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছে।

(ঞ) দমননীতির প্রকোপ

কালা কানুনের মারপ্যাঁচে বহিস্কৃত ছাত্রের সংখ্যা একমাত্র ঢাকাতেই, মিটফোর্ড-৬ জন ছাত্র। ১ জনের উপর পাকিস্তান থেকে বহিষ্কারাদেশ)

সম্প্রতি আরো ১ জন ছাত্রী বহিষ্কৃত।

মেডিকেল কলেজ-২ জন ছাত্রী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- ৬ জন (গত বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনে মোট ২৭ জনের উপর বিভিন্ন শাস্তি শাস্তিমুলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়)

ঢাকা কলেজ-৪ জন (মোট ১১ জনকে ফোর্স টি, সি, ইত্যাদি দ্বারা কলেজ থেকে চলে

www.pathagar.com

যেতে বাধ্য করা হয়, ৯৭ জনের স্কলার শিপ ষ্টাইপেন্ড বাতিল করার হুমকি দেওয়া হয়, ১ জনের উপর ঢাকা থেকে বহিষ্কারাদেশ জারী করা হয়)।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে-৫ জন

এছাড়া মোট জরিমানা, বাধ্যতামূলক টি, সি, বৃত্তি বাতিল ইত্যাদি দৈনন্দিন ব্যাপার। '৪৮ সালে রাজশাহী কলেজের বিখ্যাত ছাত্রদলন-বিভীষিকার ইতিহাস ভয়াবহ। সোজা কথায় ছাত্রের বিরুদ্ধে তোড়ন, বহিষ্কার, গ্রেপ্তারী ইত্যাদি নানা কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

পূর্ব বঙ্গের জেলে মোট ছাত্র-বন্দীর সংখ্যা প্রায় ১৫০ জন। এদের মধ্যে আছেন শেখ মুজিবর ও ১২/১৪ বছরের কয়েকজন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী।

জেলে নিহত ছাত্র নেতাদের নাম যথাক্রমেঃ ঢাকা জেলে- কুষ্টিয়ার শিবেন রায়।

রাজসাহী জেলে-খুলনার আনোয়ার হোসেন।

ছাত্র ও শিশুদের স্বাস্থ্যে প্রতি কোন দৃকপাতই করা হয় না। ঘৃণিত চাইলড লেবারের সংখ্যা বিস্ময়কর অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। তার নজীর সিলেটের চা বাগানে, সদরঘাটের হকারদের ভীড়ে, তার নজীর ষ্টীমার ও ষ্টেশনের কুলী বস্তীতে, কাঁচ ইত্যাদির কারখানায়। এই আমাদের দেশের শিশু।

১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাপক সমিতির এক প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমিনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে দেশব্যাপী শিক্ষা সংকটের কথা উলেখ করেন এবং এ ব্যাপারে সরকার আদৌ সচেতন কি না জিজ্ঞাসা করায় উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, শিক্ষা বিভাগের এক্সপার্টরা যে প্লান দিচ্ছন তা ব্যয়বহুল, কিন্তু সরকারের হাতে টাকা নাই। কাজেই কিছু করা যাচ্ছে না। তখন একজন অধ্যাপক প্রশ্ন করেন যে, সরকার কেন বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ না করে জমিদারকে কোটি কোটি টাকা নগদ জোগাচ্ছেন ? সরকার কেন অতিরিক্ত মুনাফাকর এবং ব্যবসাকর ইত্যাদি বসিয়ে ঐ সকল অর্থ জনস্বার্থে কল্যাণকর পথে, শিক্ষা সম্প্রসারণের পথে ব্যয় করছেন না? প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যান। যে কোন প্রকার ব্যাপক গঠনমূলক পরিকল্পনা কার্যকরী করতে হলেই আজ মুনাফা শিকারীদের অতিরিক্ত মুনাফায় টান পড়ে। তাই সরকার সব কম শিক্ষা সংস্কারের পরামর্শই ধামা-চাপা দিয়ে জমিদার ও মুনাফাখোরদের স্বার্থ সযত্নে রক্ষা করে চলেছে।

পূর্ব বাংলার শিক্ষাকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র

বাংলা ভাষা বিরোধী চক্রান্ত আজ চারদিক থেকে পাকিয়ে তোলা হয়েছে। ১ নম্বর-ঢাকা রেডিও ও "মাহে নও" এর মারফৎ মীজানুর রহমান পরিকল্পিত উর্দু মিশ্রিত এক বিকৃত বাংলার প্রচলন। এ এক অভিনব ফন্দী। বাঙ্গালীর কৃষ্টি, বাঙ্গালীর রুচিবোধকে পিষে মারতে ভাষার উপর ছুরি চালানোর এক জঘন্য অত্যাচারের অস্ত্র। ২ নম্বর- আরবী হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্র। বাংলা ভাষার অস্তিত্বের গোড়াটিতে আঘাত হানতে সরকার অবিচল ভাবে সুনিদিষ্ট পথে এ ঘৃণ্য পরিকল্পনা কার্যকরী করার দিকে এগিয়ে চলেছে। জনসাধারণের টাকা এভাবে অপব্যয় করে খরচ জোগান হচ্ছে আরবী হরফে লেখার ১৭টি পরীক্ষামূলক কেন্দ্রের। বিশেষজ্ঞ কমিটি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে অবিলম্বে চালু করার যে সুপারিশ দাখিল করেছিল তাও কেন্দ্র থেকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রাদেশিক সরকারের বাজেটের চেহারা দেখলে এই আক্রমণের অর্থ আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। বাজেটের শতকরা মাত্র ৫,২৬ ভাগ দেওয়া হয়েছে শিক্ষা-খাতে, আর মিলিটারী ও পুলিশ খাতে গিয়েছে ৭২ ভাগ।

এই বিভিন্নমুখী আক্রমণ ব্যর্থ করে শিক্ষা ও জাতীয় স্বার্থকে রক্ষা করতে হলে আমাদের গড়ে তুলতে হবে লৌহদৃঢ় ছাত্র ঐক্য এবং ছাত্র-শিক্ষক বুদ্ধিজীবী ও সকল দেশপ্রেমিক জনসাধারণের সম্মিলিত জাতীয় প্রতিরোধ দুর্গ।

www.pathagar.com

অলি আহাদ-এর ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু স্থিরচিত্র।

[১৯৪৭-২০০২]

www.pathagar.com

জননেতা অলি আহাদের সাথে (বাম থেকে) ভ্রাতুষ্পুত্র হাসান জামান, অনুজ আমিরুজ্জামান সি এস পি, অধ্যক্ষা রাশিদা বেগম, একমাত্র কন্যা রুমিন ফারহানা, মিসেস সুফিয়া খাতুন।

২০০০ সালে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রীর সরকারী বাসভবনে ইফতার মাহফিলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে বেগম রওশন এরশাদ ও জননেতা অলি আহাদ।

www.pathagar.com

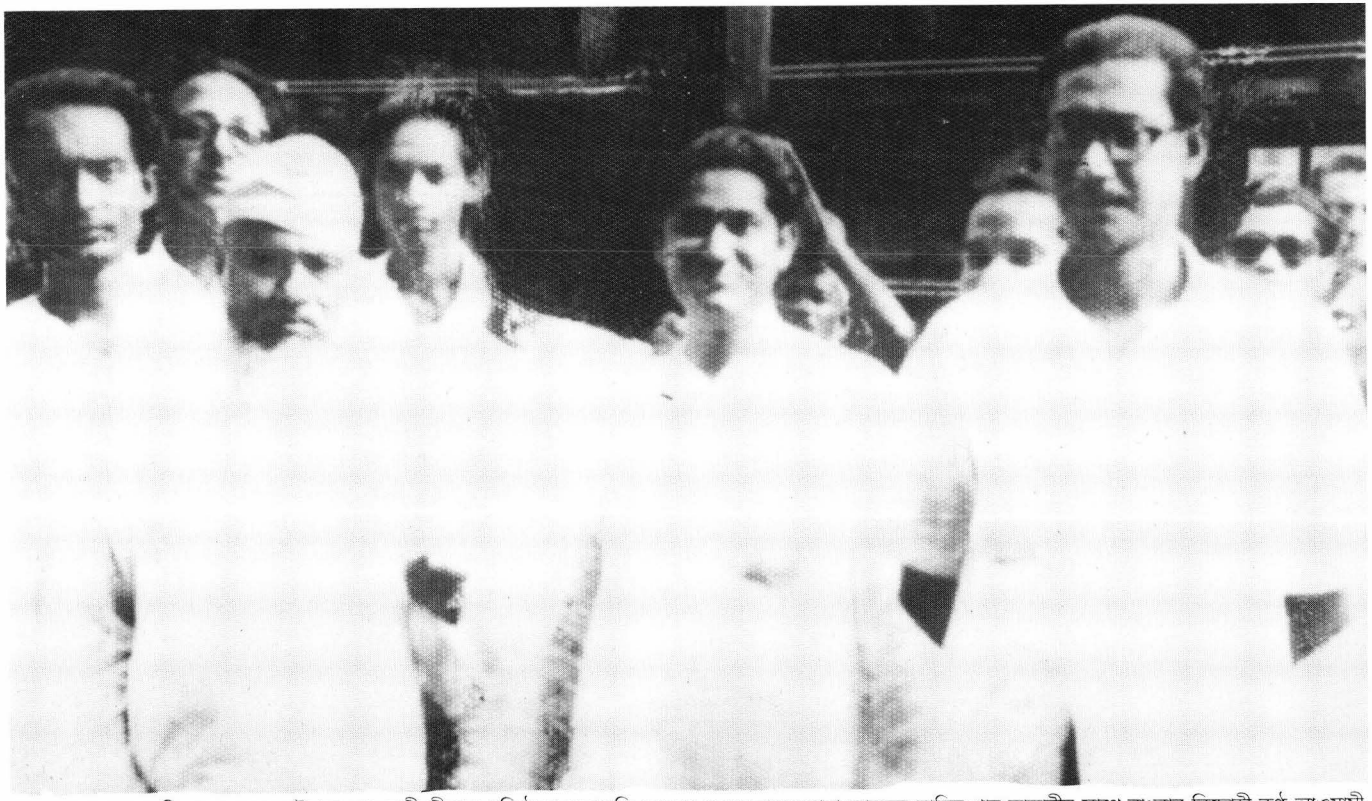

১৯৫৫ সালে ফুলবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে বাংলার বিদ্রোহী কণ্ঠ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদ ও বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ।

www.pathagar.com

১৯৫৬ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানের জনগণকে দূর্ভিক্ষাবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের ভূখা মিছিলে নেতৃত্ব দেন (বাম থেকে) তাজউদ্দিন আহমেদ, অলি আহাদ, ইয়ার মোহাম্মদ খান, জহির উদ্দিন আহমেদ, আতাউর রহমান খান, মহিউদ্দিন আহমদ ও মন্টু খান প্রমুখ।

www.pathagar.com

১৬ নভেম্বর ৯২ মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত অলি আহাদ। (বাম দিক থেকে) সাবেক ছাত্রনেতা সাইফুদ্দিন আহমেদ মনি, অভিনেতা ও চলচ্চিত্র নির্মাতা খান আতাউর রহমান, স্মরণ সভার সভাপতি কমরেড নূরুনবী, বিশিষ্ট সাংবাদিক বুদ্ধিজীবি জনাব বাহাউদ্দিন চৌধুরী, ন্যাপ ভাসানীর সাধারণ সম্পাদক আবদুল মতিন মাষ্টার, সাবেক ছাত্রনেতা মীরাজ আব্বাসী।

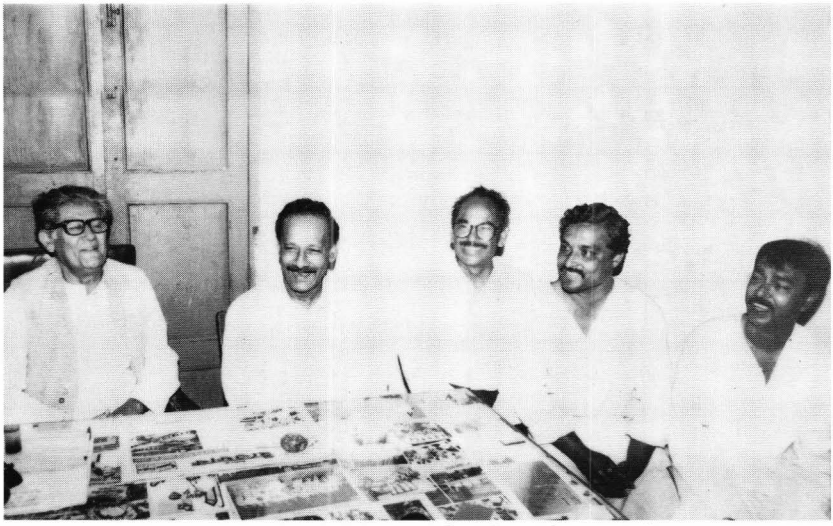

১৯৯৬ সালের ৪ নভেম্বর সকাল ১০টায় ডেমোক্রেটিক লীগ অফিসে মতবিনিময় সভায় জননেতা অলি আহাদ, বিএনপি'র মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূইয়া, এডভোকেট মিয়া সাদেকুর রহমান, সাইফুদ্দিন আহমেদ মনি, ডিএল-এর সাংগঠনিক সম্পাদক এবং অত্র বইয়ের সম্পাদক মুন্সি আবদুল মজিদ।

www.pathagar.com

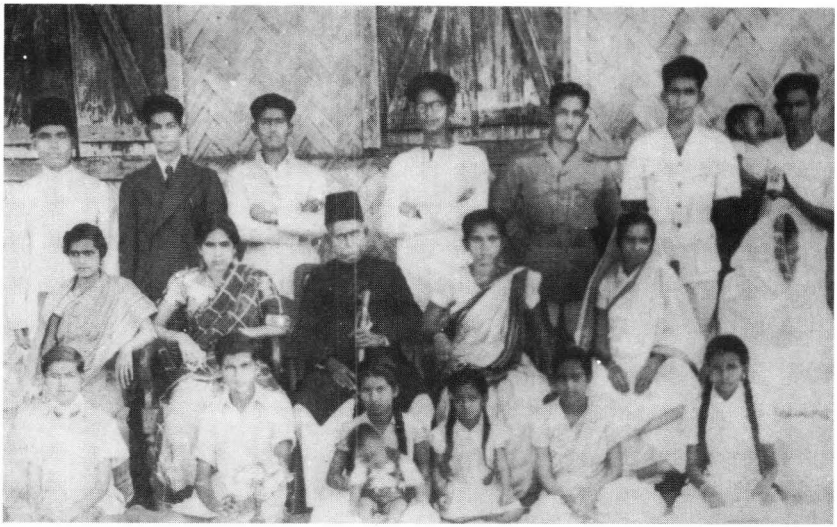

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে রত্নগর্ভা মা বাবা ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে অলি আহাদ। (দাঁড়ানো) বাম থেকে সিরাজুল ইসলাম, ভগ্নিপতি (সাবেক সাব-ডিভিশনাল অফিসার কো-অপারেটিভ)। আজিজুর রহমান, ৩য় ভাই (সাবেক অতিরিক্ত সচিব) জননেতা অলি আহাদ। ডঃ আবদুল করিম (সাবেক ডীন, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)। মতিউর রহমান, ভগ্নিপতি (সাবেক ডেপুটি কনজারভেটর অফ ফরেস্ট)। আবদুস সাত্তার, (সাবেক জয়েন্ট সেক্রেটারী, পাকিস্তান সরকার)। কালু পিয়ন। (চেয়ারে বসা) বাম থেকে মিসেস আমেনা খাতুন, বোন। সোফিয়া খাতুন, বোন। মৌলভী আবদুল ওয়াহাব, পিতা (সাবেক জেলা রেজিস্ট্রার)। মিসেস করিম, ভাবী। মিসেস রওশন আখতার, বোন। মিসেস কাজী মনিজা ওয়াহাব, মা। (মাটিতে বসা) বাম থেকে অনুজ আমিরুজ্জামান সি এস পি (সাবেক সেক্রেটারী, বাংলাদেশ সরকার)। অনুজ আক্রামুজ্জামান সিএসএস (পাকিস্তান), প্রফেসর ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। মিনা, ছায়া, হেনা ও পুতুল।

www.pathagar.com

১৯৯৮ সালে সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক আয়োজিত ইফতার পার্টিতে বা দিক থেকে শফিউল আলম প্রধান, জননেতা অলি আহাদ, বেগম খালেদা জিয়া, বিএনপির মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূইয়া, ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ।

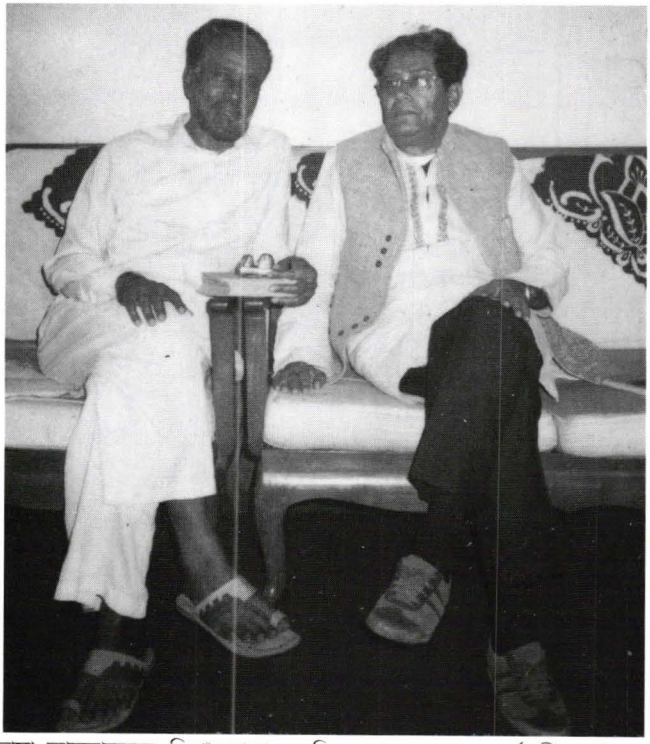

ভাষা আন্দোলনের সিপাহসালার অলি আহাদের সাথে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রথম আহ্বায়ক নূরুল হক ভূইয়া।

www.pathagar.com

জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে প্রবীন কথাশিল্পী অধ্যাপক শাহেদ আলীকে দেয়া সংবর্ধনা সভায় অধ্যাপক শাহেদ আলীকে শাল পরিয়ে দিচ্ছেন ভাষা আন্দোলনের সিপাহসালার জননেতা অলি আহাদ। পাশে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ও কবি আল মুজাহিদী।

১৯৮৬ সালে হোটেল পূর্বরাগে ডেমোক্রেটিক লীগের ইফতার মাহফিলে বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া, জননেতা অলি আহাদ, সাবেক স্পীকার মির্জা গোলাম হাফিজ।

www.pathagar.com

৫ই ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পন করছেন ডেমোক্রেটিক লীগের নেতৃবৃন্দ। বাম থেকে সালাউদ্দিন তরুন, মজিবর রহমান মাস্টার, সাইফুদ্দিন আহমেদ মনি, জননেতা অলি আহাদ, আজিজুল হক মুক্তা, মুন্সী আবদুল মজিদ, গোলাম ফারুক, এডভোকেট মাহ্‌বুবুল হক প্রমুখ।

১৯শে এপ্রিল ১৯৯৬ শুক্রবার ডেমোক্রেটিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় দলীয় সভাপতি জননেতা অলি আহাদ, চট্টগ্রামের এডভোকেট শফিকুল ইসলাম চৌধুরী, কুমিল্লার এডভোকেট বজলুর রহমান, বরিশালের এডভোকেট গোলাম নাছের, সাইফুদ্দিন আহম্মেদ মনি, লিয়াকত হোসেন চৌধুরী, আলী আহাম্মদ, শেখ মোঃ আবু তাহের, মুন্সি আবদুল মজিদ, এডভোকেট মাহবুবুল হক, এহসানুল হক সেলিম, প্রবীন শ্রমিক নেতা ফজলুর রহমান খাঁ প্রমুখ।

www.pathagar.com

দৈনিক ইনকিলাবের পক্ষ থেকে ভাষা আন্দোলনের সিপাহসালার প্রবীন জননেতা অলি আহাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে অত্র বইয়ের সম্পাদক মুন্সি আবদুল মজিদ, দৈনিক ইনকিলাবের ফিচার সম্পাদক ভাষা সৈনিক অধ্যাপক আবদুল গফুর, সহকারী সম্পাদক কবি আবদুল হাই শিকদার। (তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮)

জননেতা অলি আহাদের সাথে একান্তে আলোচনারত ভাষা সৈনিক অধ্যাপক আবদুল গফুর ও কবি আল মুজাহিদী।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সংবর্ধনা উপলক্ষে ১৯৮২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম সাংবাদিক ফোরাম-এর উদ্যোগে চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে (বাম থেকে) আওয়ামী লীগের তৎকালীন কেন্দ্রীয় নেতা আবদুল্লাহ আল হারুন চৌধুরী, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ভাষা আন্দোলনের সিপাহসালার অলি আহাদ, অনুষ্ঠানের সভাপতি মইনুদ্দিন কাদেরী শওকত, পিপলস ভিউ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক নূরুল ইসলাম ও ডেইলী লাইফ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক নূর সাঈদ চৌধুরী।

৮ আগষ্ট '৮০ সালে মতিঝিল থানায় আটকাবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর থানা গেটে জননেতা অলি আহাদ। উল্লেখ্য সামরিক শাসক জেঃ জিয়ার মন্ত্রী পরিষদের দূর্নীতির বিরুদ্ধে তৎকালীন সাপ্তাহিক ইত্তেহাদের কঠোর ভূমিকার কারণে ইত্তেহাদ সম্পাদক অলি আহাদকে গভীর রাতে পুলিশ বাসা থেকে গ্রেফতার করেন। বা দিক থেকে সাঈদ হাসান (মিহির), সদ্যমুক্ত ইত্তেহাদ সম্পাদক অলি আহাদ, এহসানুল হক সেলিম, মফিজুল হুদা দুলাল, এডঃ গোলাম মোরশেদ, তৎকালীন মতিঝিল থানার ওসি ও ফজলুল হক মানিক প্রমুখ।

www.pathagar.com

১৯৯৭ সালে ২১ ফেব্রুয়ারী 'বিদ্রোহী একুশ উৎযাপন কমিটির' পক্ষ হতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুস্পমাল্য অর্পন করছেন মুন্সি আবদুল মজিদ, সাইফুদ্দিন আহ্মেদ মনি, ভাষা আন্দোলনের সিপাহসালার অলি আহাদ, সাংবাদিক সৈয়দ জাফর, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি জসিম উদ্দিন, সাবেক ছাত্রনেতা মীর সালাউদ্দিন তরুন।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রানজিট বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে ১৯৯৭ সালের ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরালের ঢাকায় আগমনের দিন ট্রানজিট বিরোধী কালো পতাকা মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডেমোক্রেটিক লীগের সভাপতি জননেতা অলি আহাদ।

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ সম্পাদক সদ্য কারামুক্ত জননেতা অলি আহাদকে সাপ্তাহিক জনকথার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। সম্বর্ধনা সভায় সর্বজনাব কামরুজ্জামান, ফেরদৌস আহমদ কোরেশী, আমেনা বেগম, দৈনিক ইত্তেফাকের উপদেষ্টা সম্পাদক আখতার-উল-আলম ও জনকথা সম্পাদক ইবরাহিম রহমান। সম্বর্ধনার জবাবে বক্তৃতা দিচ্ছেন জনাব অলি আহাদ। [১৫ মার্চ ১৯৮৫ ইঃ]

www.pathagar.com

১৪ই জানুয়ারী ১৯৮৫ সালে স্বৈরাচারী সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের শাসনামলে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পর জেল গেটে দলীয় নেতা-কর্মীরা বিদ্রোহী জননেতা অলি আহাদকে পুষ্পমাল্য দিয়ে বরণ করেন।

www.pathagar.com

১৯৮৩ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী জনতা দিবসে বায়তুল মোকাররমের দক্ষিন গেটে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে (বা দিক থেকে) মিসেস আমেনা বেগম, সাবেক রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ, ভাষনদানরত জনাব অলি আহাদ, শফিউল আলম প্রধান ও অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ।

৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২, ফটো জার্নালিস্ট মিলনায়তনে ৭ দল আয়োজিত "তেল, গ্যাস রপ্তানী হবে আত্মঘাতী" শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তৃতারত অলি আহাদ। মঞ্চে (বা দিক থেকে) সাইফুদ্দিন আহমেদ মনি, মুন্সি আবদুল মজিদ, এডঃ মাহবুবুল হক, সাবেক মন্ত্রী জননেতা আনোয়ার জাহিদ, গণতান্ত্রিক সর্বহারা পার্টির চেয়ারম্যান আহসানুল হক বাচ্চু, হারুন-উর-রশিদ খান।

www.pathagar.com

গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করছেন জননেতা অলি আহাদ (কালো শেরওয়ানী পরিহিত)। বা দিক থেকে সামনের সারিতে মোখলেছুজ্জামান খান, মেজর (অবঃ) আব্দুল মান্নান, মিয়া আব্দুর রশিদ, শেখ মোঃ আবু তাহের, মোঃ শাজাহান, অধ্যাপক মোমেনুল হক, এডঃ আবদুল আহাদ মিয়া, এনামুল হক, কবির আনসারি প্রমুখ।

www.pathagar.com

সম্পাদকের পরিচিতি

মুন্সি আবদুল মজিদ। পিতা-আজিজুর রহমান মুন্সি। জন্মস্থান-সরিষাবাড়ী, জামালপুর। কিশোর বয়সেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। এ কারনেই হয়ত অবচেতন মনের তাড়নায় যৌবনের শুরুতেই ঢাকায় পাড়ি জমান। জড়িয়ে পড়েন 'সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ' পত্রিকার সঙ্গে। এরপর ঘটনাচক্রে ভাষা আন্দোলনের সিপাহসালার অলি আহাদের অতি ঘনিষ্টজন হয়ে রাজনৈতিক কার্যক্রমে সক্রিয় হন। প্রথমে ডি এল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পরে প্রচার সম্পাদক এবং বর্তমানে সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। রাজনীতি তাঁর জীবনের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, এখন তিনি আপাদমস্তক একজন রাজনীতিবিদ। দীর্ঘ ২৫ বছর অলি আহাদের সান্নিধ্যে থেকে এই মহান ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, আচার-আচারন, জীবনবোধ এবং সাহসী-নির্মোহ রাজনৈতিক ভূমিকা প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ হয়ে তিনি মনে মনে ভাবতে থাকেন এমন একজন মহান নেতার কর্মমুখর জীবনের মূল্যায়ন হওয়া দরকার। অন্তরের তাগিদ থেকেই তিনি এই গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে হাত দেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত ও তিন কন্যার জনক।

www.pathagar.com

'দিল্লীর গোলামীর জিঞ্জির ভাঙ্গবো
বাংলাকে আজাদ করবো। [১৯৭৩]

'কলিকাতার ধনাঢ্য ও ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্ত স্যার আশুতোষ মুখার্জীসহ অনেকেরই বিরোধিতার মুখে ভারতীয় কাউন্সিলের সদস্য, ধনবাড়ীর জমিদার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী স্বীয় জমিদারী বন্ধক রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই মহান ব্যক্তির নাম নিশানা কোথাও রাখা হয়নি। বিশেষ সমাবর্তন করে তাঁকে মরোনত্তর সম্মাননা দিতে হবে'।
[৭-১০-২০০২]

'১৯৪৭ সালে বৃটিশ ও ব্রাহ্মন্যবাদী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমরা প্রথম মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হয়েছি। ১৯৭১ সালে লাহোর-পিন্ডি এবং পাঞ্জাবী শাসন-শোষনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হয়েছি। কিন্তু দুর্নীতিবাজ ও চরিত্রহীন নেতৃত্বের কারনে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। দেশ এবং দেশের মানুষকে বাঁচাতে, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও চরিত্রহীনতার বিরুদ্ধে আমাদের এখন তৃতীয় মুক্তিযুদ্ধে শামিল হতে হবে'। [৩০-৩-২০০২]

অলি আহাদ

www.pathagar.com

জননেতা অলি আহাদের
কারাজীবন

অলি আহাদ। ডেমোক্রেটিক লীগের সভাপতি। চির বিদ্রোহী এই বয়োবৃদ্ধ জননেতা চল্লিশ দশকের পরাধীন আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে যত অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতিসহ বিভিন্ন রকম নির্যাতন নিষ্পেষনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে চলেছেন। যাকে শাসকগোষ্ঠী জেল-জুলুম, অযথা হয়রানী করেও দাবিয়ে রাখতে পারেনি। যিনি সব সময় শোষিত জনগোষ্ঠীর স্বপক্ষে সোচ্চার। ১৯২৮ সালে অলি আহাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ইসলামপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি ছাত্র জীবন থেকেই ছিলেন একজন বলিষ্ঠ কর্মী। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙ্গালী জাতির মুখের ভাষার উপর আঘাত হানলে তিনি গর্জে উঠেন। '৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা দিবসে তিনি প্রথম গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৮ সাল থেকে '৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সময় কারারুদ্ধ হন। শুধুমাত্র এরশাদের শাসন আমলেই ছ'বার গ্রেপ্তার হয়ে সর্বমোট ৩৫৭ দিন জেলে ছিলেন।'৪৮ সালে তাকে ২ বার আটক করা হয়।'৪৯ সালের ২০ এপ্রিল আবার গ্রেপ্তার হন। এবারে তিনি ৫৭ দিন জেলে ছিলেন। '৫২ সালের ৭ মার্চ আবার জেলে যান, এবার তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন ২১০ দিন। '৫০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ২৩ দিন, '৫৯ সাল থেকে '৬২ পর্যন্ত প্রায় ৪ বছর জেলে ছিলেন। '৬৪ সালের ১৭ নভেম্বর আবার তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ২৫৩ দিন কারারুদ্ধ থাকেন। '৬৯ সালের ৩১ জানুয়ারী তাকে গ্রেপ্তার করে ১৮ দিন আটক রাখা হয়। '৭৪ সালের ৩০ জুন তিনি আবারও গ্রেপ্তার হন এবং ৪২৭ দিন কারাজীবন ভোগের পর ২৪ আগষ্ট '৭৫ মুক্তিলাভ করেন। ৭ ই আগষ্ট ১৯৮০ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে গ্রেফতার হন। তাঁকে আবারো গ্রেপ্তার করা হয় ২২ নভেম্বর '৮৩ সালে। ২৪ দিন পর তিনি ছাড়া পান। ৫ মে '৮৪ তিনি আটক হন এবং ৫৪ দিন জেঁলে থাকেন। অলি আহাদ '৮৪ সালের ৩০ জুলাই গ্রেপ্তার হন এবং ১৬৮ দিন পর মুক্তি পান। তারপর ১লা মার্চ '৮৫ সাল থেকে ৯৪ দিন, ৩ এপ্রিল '৮৬ থেকে ১১ দিন, ১২ অক্টোবর '৮৬ সালে আবারো গ্রেপ্তার হন এবং ৬ দিন আটক থাকার পর ছাড়া পান। তিনি জীবনে ১৭ বার জেলে গেছেন, আত্মগোপন করেছেন দু'বার। সামরিক শাসক আইয়ুব খানের শাসনকালে অলি আহাদ ৬/৭ বছর রাজনৈতিক কারনে আত্মগোপন থেকেছেন।

অলি আহাদ ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে যুবলীগ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি প্রথম সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। আওয়ামী লীগের তিনি প্রথমে প্রচার ও পরে সাংগঠনিক সম্পাদক হন। কাগমারী সম্মেলনের মধ্যদিয়ে ১৯৫৭ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে তিনিও আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে গিয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ গঠন করেন। অলি আহাদ ন্যাপের প্রথম যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে জাতীয় লীগ গঠিত হলে তিনি এ দলে সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে স্বৈরাচার বিরোধী জনমত গঠন করেন। তিনি "জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। শেখ মুজিব নিহত হবার পর ১৯৭৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর খন্দকার মোশ্‌তাক আহমদ ডেমোক্রেটিক লীগ গঠন করলে তাঁকে সহ সভাপতি করা হয়। বর্তমানে অলি আহাদ ডেমোক্রেটিক লীগের এবং ৭ দলীয় জোটের প্রধান। এক সংগ্রামী ও প্রতিবাদী চরিত্রের প্রতীক অলি আহাদ। আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে বয়োজ্যেষ্ঠ দু'চারজন নেতার মধ্যে তিনি অন্যতম।

www.pathagar.com